# বিপ্লব দেশে দেশে

শেখর সেনগুপ্ত

শ্রীকানাইলাল দাসকে

সাগ্রহে—

## ✻ স্ব-কথন ✻

পথ-প্রেমে বেপথু আমি মানুষের অন্তরঙ্গতায় আপ্লুত। স্থান থেকে স্থানান্তরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যুগের সচেতনতাকে উপলব্ধি করবার প্রয়াস আমার অনেকদিনের। সেই প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি 'বিপ্লব দেশে দেশে'।

পরিশীলিত চিন্তা ও কল্পনার অধিকারী 'জ্ঞানতীর্থে'র কর্ণধার শ্রীকানাইলাল দাস আমাকে অনেকটা যেন সাহিত্যের পাদ-প্রদীপে টেনে আনছেন। বস্তুত ওঁর ব্যক্তিগত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সংস্পর্শে না এলে, আমার রোজনামচার অভিজ্ঞতা-গুলি এমন গ্রন্থবদ্ধ হতে পারতো না কোন দিন।

নিজেকে ঐতিহাসিক বলে জাহির করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবু এই বই কতখানি সাহিত্য-সুন্দর হলো, তা নিয়ে আমার আশঙ্কার অন্ত নেই। পাঠক-পাঠিকাদের মুখ চেয়ে আছি। ওঁদের মনে সাড়া জাগলেই আমার ঋণশোধের পালা শুরু হবে।

এই বই রচনায় নানাভাবে অকুণ্ঠ সাহায্যে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন বন্ধুবর নিগ্রোগায়ক যোশেফ ভ্যালেনটাইন, অজিত কুমার বসুমল্লিক, দুই ঘনিষ্ঠ কবি বন্ধু সুনীতি মুখোপাধ্যায় ও কামাখ্যা মুখোপাধ্যায়, দুই সহকর্মী ও সহমর্মী মৃণাল রায় ও মৃণাল সেন।

এছাড়া এই বইএর প্রতিটি ছত্র রচনায় বার বার এক ফরাসী তনয়ার উপস্থিতি যেন উপলব্ধি করেছি। তার নাম-ধাম, পরিচয় জ্ঞাপনে বাধা আছে।

সর্বপরি সাহিত্যের অক্লান্তপাঠিকা আমার পরম আরাধ্যা মা আমার রচনার অনেক সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেছেন।

এঁদের কাউকেই মামুলী কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিজের বিবেকের কাছে ছোট হতে পারছি না।

বিনীত

ভিয়েতনামে প্রচণ্ড বিপর্যয়ের পর প্রেসিডেণ্ট জনসন ও তার উপদেষ্টা মণ্ডলী

মহান ভিয়েতনামের মহানায়ক হো-চি-মিন

স্যার হেনরী কটন

ফরাসী দেশে নিপীড়িত চাষীদের ওপর ধর্ষণ করে খাজনা আদায় করছেন জমিদারেরা

বিপ্লবী কবি রবীন্দ্রনাথ
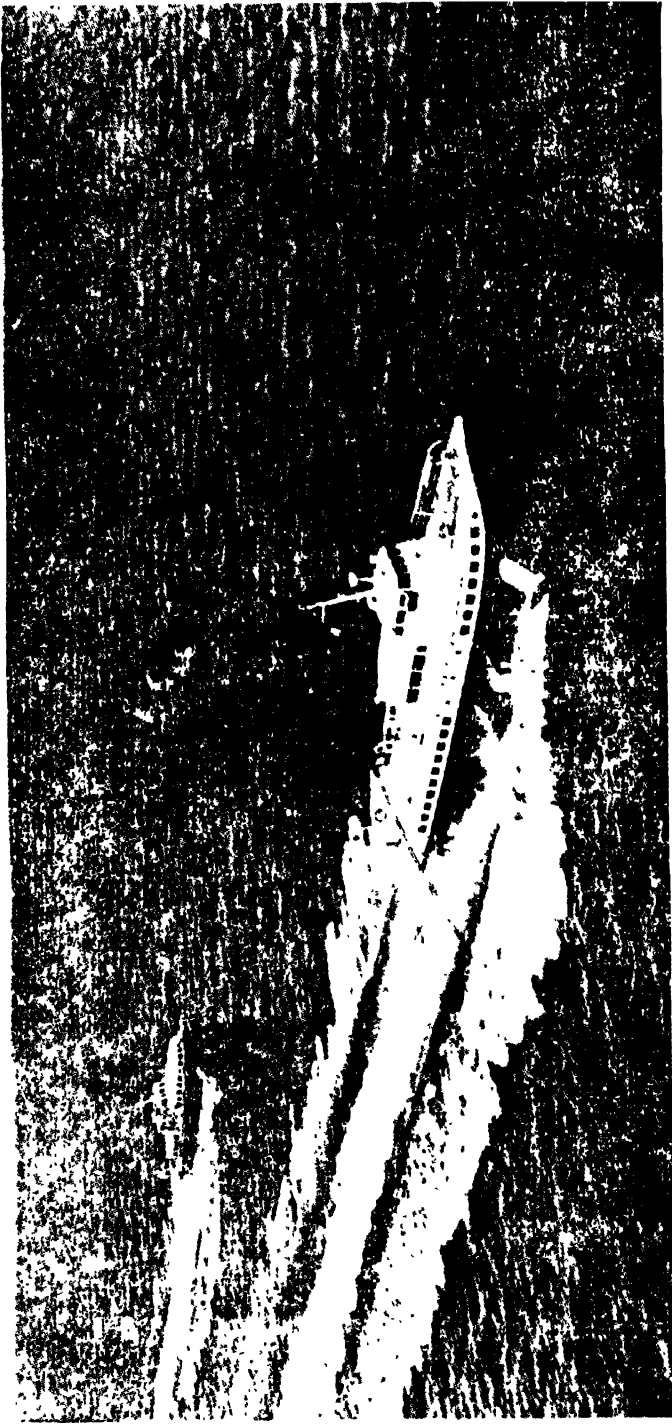
এশিয়ায় নয়া সাম্রাজ্যবাদের খবরদারি—মার্কিন সপ্তম নৌবহর

ফরাসীদের সাথে মুখোমুখী লড়ায়ে নিহত ভিয়েত নামী যুবক

বী আঁত্তোনেৎ
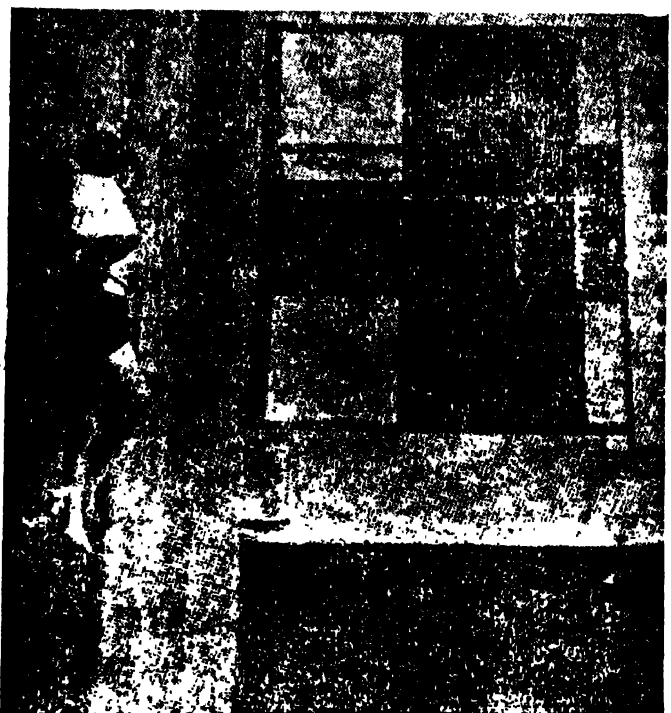
জাপানের কৃষি বিপ্লব

ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিকামী দল

প্রেসিডেণ্ট সোয়াকর্ণর গণ সংবর্ধনা গ্রহণ

হায়াতোরে

নানা সাহেব

میجر ریچرڈسن صاحب بہادر کمان افسر کا لکھا ہوا تاریخ ۲۲ ماہ اپریل ۱۸۵۹ عیسوی کو پہونچا حال معلوم ہوا

ہماری طرف سے اشتہار جو لکھا گیا اوس میں بہت سی باتیں نہیں لکھی گئیں اپنی ایک بات میں

جواب دیا سو ہمکو منظور نہیں لیکن اسطرح ہم نہیں اسلئے میں جو ملکہ شاہ کوئن پادشاہزادی کی

طرف سے مہر دستخطی و خط فرانسیس کے کمان افسر پاس کمان افسر کے ہمراہ ہماری پاس اوی

تو ہم اوسکی او پر خاطرداری رکھکر مینک بہ باتکو منظور کرینگی ہم ملکہ کیا کرین جب کہ اپنی اجتک

ہندوستان میں دغابازی کی سو ہم خوب جانتی ہیں سو جو ایکی دل میں فساد ملک سے نکال نام تو پادشاہ

زادی کا خود لکھا ہوا مہر دستخطی خط ہمراہ فرانسیس کمان افسر کی ہاتھ اوی تو ہم منظور کرینگے ہماری

پاس کوئین پادشاہزادی کا لکھا ہوا مہر دستخطی تمہ ایلچی ولایت لندن کو بھیجا تھا او سوقت اوسکی ہاتھ

নানা সাহেবের পত্র

## ॥ এক ॥

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়বার মতো সুযোগ আমার কপালে জোটেনি। কারণ, আমার বয়স ও কলম, দুটোই তখন নেহাৎ অপরিপক্ক। আজ আমার দৃষ্টি হয়তো কিছুটা স্বচ্ছ হতে শুরু করেছে, হয়তো কলমটাও চেপে ধরতে শিখেছি, শিখেছি হাঁটতে আর দেখতে, দেখতে আর হাঁটতে।

লণ্ডন, প্যারি, বন, বার্লিন, ওয়ারশ', বুদাপেষ্ট—সমস্ত ঝলমল করছে। ঝলমল করছে রোম, ভেনিস, মাদ্রিদ এবং ধনকুবের আমেরিকার ওয়াশিংটন, ন্যুইয়র্ক, চিকাগো, লসএঞ্জেল ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় পাঁচ-সাততলা কোথায় কোন এক আরাম-বিলাসে-বৈভবে গা এলিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করে, এদেশের রাজারা এখনো বোধ হয় বেঁচে আছে। আর যদি তাই থাকে,তবে এখানকার জনগণ বাস করছে এক বিধ্বস্ত যুগে। বল্লম, সড়কি, অ্যাটম বা গণতন্ত্রেও রাজারা রাজার মতো বেঁচে থাকতে পারে শুধু মাত্র হুজুগের দোহাই দিয়ে। রাজতন্ত্র খতম হয়েছে বহুদিন, কিন্তু রাজার মাথার হীরের মুকুটটি ভাগাভাগি করে পরে আছেন মুষ্টিমেয় গুটি কতক মানুষ, রাজার মতোই চর্ব-চষ্য লেহ্য পেয়তে হাবুডুবু খেয়ে শান্তির দৈববাণী বিলিয়ে চলেছেন। ওদের ধারণা ছিল, শঙ্কাহীন নীরবতায় পাঁচতলা পঞ্চাশতলা হবে! ডলার, মার্ক, পাউণ্ড এবং ফ্রাঙ্ক তাদের রাজত্ব চালিয়ে যাবে অনন্ত কাল।··কিন্তু বাইরে মিছিল হাঁক দিল একদিন, শঙ্কাহীন-নীরবতা ভেঙ্গে আকাশ কাঁপতে লাগলো, ন্যাপাম-পোড়া চামড়া নিয়েও মানুষগুলো ছুটে আসছে, হাঁক দিচ্ছে, ডলার, মার্ক, পাউণ্ড এবং ফ্রাঙ্কের কাঁপুনি লেগেছে খুব।

'মরে গেছেন' 'বেঁচে থাকো' 'মুকুটটা আমার'—এ সমস্ত শব্দনিচয়ের বিরুদ্ধে চিৎকার উঠছে পূব আকাশ পশ্চিম আকাশ জুড়ে।...

প্যারির সাঁজারমা দে গ্রে অঞ্চলের একটি চমৎকার কাফেটি বসে নিজের লেখা পথ-পরিক্রমা পড়ছিলাম এবং ভাবছিলাম, দেশে ফিরে গেলে এটি 'জ্ঞানতীর্থের' কর্ণধার কানাইবাবুর হাতেই তুলে দেবো।

সাঁজারমা দে গ্রের কাফেটি বিখ্যাত। বিখ্যাত ও আকর্ষণীয় একটি লোকের প্রত্যহিক উপস্থিতির জন্য। তিনি হলেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বহু আলোচিত ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব জাঁপল সার্তে। দার্শনিককে আমি দেখেছি, এখানে তাঁর বিদগ্ধ বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে অনর্গল আলোচনা চালিয়ে যেতে। রকমারি এপিগ্রাম তাঁর আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আসে।

'The difference between man and beast is that man can put an end to his life and the beast can not...'

মেয়েদের সম্পর্কে তাঁকে বলতে শোনা গেছে, 'The door which shuts, a nose which tightens an axe which falls—that's woman'.

এইগুলির ব্যাখ্যা ও ভাষ্য নিয়ে বলা বাহুল্য আলোচনার অন্ত নেই। ফ্রান্সের স্থানে স্থানে যুবকদের আড্ডায়, দর্শনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তর্কের জোয়ার বয়ে গেছে সার্তের নিত্য-নূতন এপিগ্রাম নিয়ে। সার্তে সত্যই তরুণ-সমাজে অতি উচ্চারিত, বহু প্রচারিত একটি নাম।

ফ্রান্স দর্শনের দেশ, সাহিত্যের লীলাভূমি, বুদ্ধি জীবিদের স্বর্গ। এবং সেই সাথে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য, ফ্রান্স বিপ্লবেরও দেশ।

বিপ্লব!—আকাশে বাতাসে বারুদের গন্ধ। বিপ্লবের লেলিহান শিখা সমগ্র বিশ্বের আকাশকে জুড়ে আছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, এতকালের অত্যাচারের ও অনাচারের জঞ্জালকে জ্বালিয়ে

খাক করে দেবে। কিন্তু বিপ্লব তো কখনো ধ্বংসাত্মক নয়, বিপ্লব সৃষ্টিরই জয়গানে মুখর। পুরাতন মরচে ধরা কাঠামোটাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন কালের ইস্পাত-কাঠামো গড়ে তোলে বিপ্লব। তাই বিপ্লবকে আজ স্বাগত জানাচ্ছে বিশ্বের সর্বহারা সম্প্রদায়! অবশ্য বিপ্লব মানেই দাঙ্গাবাজী নয়, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস নয়, বুদ্ধিজীবি মাত্রকেই ঠেঙ্গানো নয়। এ যুগের অনেক বিপ্লব অনেক সময় নীরবেই সাধিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবে জনগণ সচেতনতা লাভ করেছে এবং আস্তে আস্তে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও সমাজতান্ত্রিক পরিমণ্ডলকে স্বীকৃতি দিয়ে বিপ্লব সম্পন্ন করেছে। কিউবা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমন ঘটনা আরো ঘটছে এবং ঘটবে।

ফরাসী তারুণ্য আজকাল এ সব নিয়ে খুব ভাবছে। এই তো সেদিন এই কাঁফেতে বসেই প্যারিস আর্ট একাডেমির ছাত্রী লাস্যময়ী তুঁলো রোকাতাঁ হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল প্রকৃত বিপ্লবের ব্যাখ্যা দিতে দিতে। তুঁলো রোকাতাঁর বাবা আঁতোয়ান রোকাতাঁ ইতিহাসের অধ্যাপক। কিন্তু যুগের দাবী নিয়ে বাপ-মেয়েতে মতের একদম মিল হয় না। তুঁলো মাঝে মধ্যেই আমার কাছে ছুটে এসে ওর ধ্যান-ধারণা অকপটে জ্ঞাপন করে যায়। ছবিতে, গানে, তর্কে ওর মতামত ক্রমশই একটা স্পষ্ট রূপ নিচ্ছে। আমি সবিস্ময়ে তা পরখ করি।...

রবিবার দিন তুঁলো আমায় এক রকম জোর করে নিয়ে গেলো ওদের সিনেক্লাবে সিনেমা দেখাতে। আমি কলকাতার একটি কাগজের জন্য লেখা প্রস্তুত করছিলাম। কিন্তু তুঁলোর জিদে কলম থামাতে হলো। তুঁলোর গোলাপী গালে উচ্ছ্বসিত আবেগের আনাগোনা, নীলচোখে গভীর প্রত্যয়ের ইঙ্গিত।...আমি আর লিখতে পারলুম না। উঠে দাঁড়াই। 'পারিত মঁসিয়ে সেন, আপনি নিশ্চয় হতাশ হবেন না। আমরা মঁঃ লুই মালের ছবি দেখতে যাচ্ছি। ছবিটি আপনাদের একটি বড় সিটিকে নিয়ে,—'কলকাতা!'

'কলকাতা !'

তুঁলোর কথা শুনে চমকে উঠি। বুকের রক্ত যেন উত্তাল হয়ে ওঠে। কলকাতা! আমার, আমাদের কলকতা নিয়ে ছবি তুলেছেন বিশ্ব বিখ্যাত ফরাসী চিত্র পরিচালক মঁঃ লুই মাল। ভাবতেও গভীর আনন্দ। কিন্তু সাথে সাথে কেমন যেন এক ধরণের গভীর বেদনা! আমি তো জানি কলকাতা কত বীভৎস। ইংরাজ ধর্ষিতা ভারত মাতার জারজ সন্তান কলকাতা! বেদনায়, অন্তর্জ্বালায় একাকীত্বে মুমূর্ষু কলকাতা আজ 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা' হতে পারলো না। প্যারি, লণ্ডন, বুদাপেষ্ট! তোমাদের চাইতে কলকাতার সম্ভাবনা কম ছিল না। কিন্তু কিছুই হয়নি। যেন একটি প্রতিভার নীরব অপমৃত্যু ঘটেছে।

তুঁলোর পাশে বসে মঁঃ লুই মালের 'কলকাতা' দেখলাম। অবাক বিস্ময়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছিল। পরিচালক মঁঃ লুই মাল ১৯১১ সালে ভারতে এসে ছবি তুলে নিয়ে গেছেন। আবার এসেছিলেন ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে। তারই অনুপম ফলশ্রুতি এই পূর্ণ দৈর্ঘের ডকুমেণ্টারি ছবি 'কলকাতা।' কলকাতার দৈনন্দিন জীবনের জীবন্ত ও বাস্তব প্রতিচ্ছবি দেখলাম আমরা প্যারির বুকে বসে। ভয়াবহ রূপ! গঙ্গায় স্তরে স্তরে পলি জমছে এবং সেই সাথে নাভিশ্বাস উঠছে কলকাতার। বড় বড় জাহাজগুলো আর চড়া ঠেলে এগিয়ে আসতে পারে না, ফুটপাতে শুয়ে আছে হাজার হাজার হাজার অর্ধনগ্ন নর-নারী, সার সার ভিখারীর মিছিল, কুষ্ঠ রোগীদের যত্র তত্র অবাধে আনাগোনা, স্থানে স্থানে মারমুখী জনতা ও পুলিশে সংঘর্ষ, বাস পুড়ছে, ট্রাম পুড়ছে, বোমা ফাটছে, আবার কালী মন্দিরের চত্বরে হাজার হাজার ধর্মভীরু নর-নারীর আনাগোনা লেগেই আছে।

'স্টুডিও দ্য এতোয়ালের' প্রতিটি দর্শক এই দুর্বিষহ ছবি দেখে শিউরে উঠলেন। ছবি শেষ হতেই হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে উঠলো, 'বন্ধুগণ এর প্রতিকার কোথায় আছে বলতে পারেন?'

সমস্ত হল জুড়ে গমগমিয়ে উঠলো সেই উত্তর, বিপ্লব। বিপ্লবই এর প্রতিকার!'...

সেদিন ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমতে পারি নি। মগজের কোষে কোষে চিন্তার দাবানল। সেই একই শব্দের অনুরণ, 'বিপ্লব-বিপ্লব-বিপ্লব!'...

মানুষের ইতিহাস বিপ্লবেরই ইতিহাস। প্রতিটি মহৎ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বিপ্লবের মধ্য দিয়েই। দার্শনিক চার্নিশেভস্কি যথার্থই বলেছিলেন, 'ইতিহাস চলে মন্থর ভাবে; তবু তার সমস্ত চলাটাই ঘটে একটার পর একটা লাফ দিয়ে।' প্রতিটি বিপ্লবই হলো এমন ঐতিহাসিক উচ্চ লম্ফন। সর্বকালের সর্ব মানুষের সংগ্রামী মানসিকতার মূর্ত অভিপ্রকাশ বিপ্লব। বিপ্লব সাধিত হয় অস্ত্রে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, বীক্ষণাগারে। মানুষের মন যদি বৈপ্লবিক হয়ে ওঠে, বিপ্লব সেখানে হবেই; তবে তা সরব ও সশস্ত্র হতে পারে, আবার নীরব ও নিরস্ত্রও হতে পারে!

Bloodless Revolution বিশ্ব ইতিহাসের অঙ্গনে বহুবার ঘটে গেছে, আবার রক্ত গঙ্গার পথ বেয়েও Revolution এসেছে। তাদের প্রত্যেকের চরিত্র আলাদা, প্রকাশ ভঙ্গী আলাদা। কিন্তু এক অর্থে তারা অভিন্ন, তা হচ্ছে এই যে তারা ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেই অগ্রগতীর পথ নিঃসন্দেহে প্রগতির। এক সীমা থেকে অপর সীমায় উত্তোরণে ইতিহাসকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছে তারা।

একদিন ইতালীতে Humanism বা মানবিকতার জন্য বিপ্লব হয়েছিল। মধ্য যুগের অন্তিম লগ্নে তার জন্ম। কিন্তু বিংশ শতকের পৃথিবী অনেক দূরে এগিয়ে এসেছে এবং এ যুগের সংঘর্ষে দু'ধরণের মানাবকতা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত হানছে। এদের একটা হল বুর্জোয়া মানাবকতা আর অপরটা হলো সর্বহারার মানবিকতা। এ যুগের সমাজ তান্ত্রিক বিপ্লব ঘোষণা করেছে "প্রকৃত মানবতাবাদ

হচ্ছে সর্বহারার মানবতাবাদ, যা রাশিয়াতে সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক জীবনের মূল ভিত্তিটাকেই পরিবর্তিত করবার মতো মহৎ আদর্শকে রূপ দেওয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে।

অবশ্য এমন বিপ্লব অনেক পরের কথা। মাও সেতুং, লিউ সাউ চি-র নেতৃত্বে চৈনিক বিপ্লব আরো পরের কথা। বিপ্লব ইতিহাসে এসেছে অনেক-অনেক আগে। হাজার হাজার বছর আগে। সম্ভবত, যেদিন মানুষ চকমকির ঘর্ষণে আগুন জ্বালাতে শিখেছিল, সেইদিনই হয়েছিল প্রথম বিপ্লব। সেই জয়যাত্রা আজও চলেছে। নিত্য নূতন উচ্চ লম্ফনের মধ্য দিয়ে মানুষের ইতিহাস এগিয়ে চলেছে।...

---

* ম্যাকসিম গোর্কির উক্তি।

## ॥ দুই ॥

জীবনোত্তাপে ভরপুর ইটালীতে গিয়েছিলাম জুনের মাঝামাঝি, ১৯৬০। উদ্দেশ্য, ইটালীর বুকে কান পাতা,—তার অতীত ও বর্তমানকে জানবার আকুতি! বিজ্ঞানের ছাত্র আমি, কিন্তু ইতিহাস আমায় 'পাগল খুঁজে ফেরে পরশমণির খোঁজে' বানিয়ে ছেড়েছে।

প্যারির বিমান বন্দরে তুঁলো এসেছিল বিদায় জানাতে। তার মন তেমন ভারাক্রান্ত হয়নি নিশ্চয়। কারণ, ও জানতো মাত্র দু' সপ্তাহ বাদেই আবার আমি ফ্রান্সের মাটিতে পা দেবো।...

রেনেসাঁসের দেশ ইটালী: আধুনিক সভ্যতার জন্মভূমি। বিপ্লবের সংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটিয়েছে এই দেশ। এদেশের মাটি তাই আমার কাছে স্বর্গ, এর ঐতিহাসিক মূল্যবোধ আমাদের সভ্যতার মর্মকথা।

আধুনিক সভ্যতার এই জন্মভূমিতে দাঁড়িয়ে স্মরণ করতে পারি, ত্রয়োদশ থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অন্ধকার ইউরোপের বীভৎস ইতিহাসকে! সেই তিন শতাব্দী জুড়ে ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক কবন্ধ যুগ নেমে এসেছিল। অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে সবাই। অন্যায় ও অবিচারের বেদীতে মাথা ঠুকছে সাধারণ মানুষ।

তবু একথা সত্য ঐ সময়েই মধ্যযুগ ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছিলো এবং রচিত হচ্ছিলো আধুনিক যুগের সূচনা। মঙ্গোলরা ইউরোপীয় রণক্ষেত্রে প্রথম বারুদ আমদানি করেছিল, দেখিয়েছিল আগ্নেয় অস্ত্রের

উৎকর্ষতা। এখন ইউরোপের রাজন্যবর্গ সেই অধিত বিদ্যা প্রয়োগ করলো দুর্দান্ত সামন্তদের বিরুদ্ধে। মধ্যযুগীয় অরাজকতায় সামন্তরা অতিমাত্রায় ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠেছিল, শক্তির অহমিকায় তারা রাষ্ট্রশক্তিকে অস্বীকার করে বসলো। ফলে শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। এটাকে আমরা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রের অভিযান বলে অভিহিত করতে পারি। 'বিপ্লব' কথাটা সে সময় খুব চালু থাকলে, হয়তো রাজপক্ষীয় লোকেরা বড়াই করে বলতেন, 'আমরা বিপ্লব করতে চলেছি!' ইউরোপের নব উত্থিত বণিক সম্প্রদায় এই সময় রাজাকেই সমর্থন জানিয়েছিলেন। তখন কি রাজারা জানতেন, একদিন এই বণিকদের হাতেই তাঁদের রাজদণ্ড তুলে দিতে হবে?

যাই হোক, দীর্ঘ ও রক্তক্ষরণকারী যুদ্ধে ক্রাউনেরই জয় জয়কার হলো। সামন্তদের যেটুকু বা অবশিষ্ট ছিল, তা মুছে দিয়ে গেল ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। মধ্যযুগকে নবযুগের পর্যায়ে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে এসেছিল ক্রুসেড। একটির পর একটি ধর্মযুদ্ধ ইউ-রোপীয় গণচিত্তে সৃষ্টি করেছিল বিপুল আলোড়ন, পূর্বের সাথে পশ্চিমের হাত মিলিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলো এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে যা কিছু কাজ হয়েছে, তার মূলে তো ধর্মের প্রেরণাই ছিল বেশী। ধর্মের সঙ্গে জীবন ছিল ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। গির্জায় হতো জ্ঞানের চর্চা এবং ধর্মের মাহাত্ম্য ছাড়া সাহিত্য বা বিজ্ঞান সাধনা সে যুগে ছিল অচল। সেই ধর্মবোধে প্রথম ঘা দিল মধ্যএশিয়ার সাহসী অটোমান তুর্কীরা। বিচ্ছিন্ন ইউরোপীয়দের ধর্মীয় স্বার্থেই প্রথম ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করলো তারা।

মুক্ত কৃপাণ হাতে বীর তুর্কীরা ঝাঁপিয়ে পড়লো জেরুসালেমে। মহাত্মা যীশুর জীবনের বহু পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত এই স্থান। তুর্কীরা

সেখানে প্রবেশ করে খৃষ্টানদের উপর অত্যাচার শুরু করে দেয়, ফলে তীর্থযাত্রা কষ্টকর ও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

শুধু কি তাই? তুর্কীরা গ্রাস করে নিয়েছে সমগ্র এশিয়া মাইনর। ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সমস্ত বাণিজ্য পথ তারা বন্ধ করে দিয়েছে। অর্থকষ্টে ও ধর্মহানীতে ক্ষোভে, বেদনায় ইউরোপ যেন সবেগে নড়ে উঠলো। একতার আহ্বানে সাড়া দিল সমস্ত বিবদমান শক্তিগুলি।

বাইজ্যানটাইন সম্রাট পোপের কাছে আবেদন জানালেন, খৃষ্টান জগতকে ধর্মযুদ্ধে আহ্বান করতে। উত্তেজিত ইউরোপ। উত্তেজিত খৃষ্টসমাজ। এর প্রতিবাদ করতে হবে, এর জবাব দিতে চাই, এর বদলা চাই! চাই রক্তের বদলে রক্ত। খুনের বদলে খুন। শুরু হলো এক প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড অভিযান। শুরু হলো ক্রুসেড। ধর্মের বাঁধনে ঐক্যবদ্ধ এতবড় সম্মিলিত অভিযান ইউরোপ তথা বিশ্বের ইতিহাসে এর আগে বা পরে কখনো ঘটেনি। অনেক রাজা, অভিজাত বংশের বহু লোক, ইউরোপের প্রায় সমস্ত প্রধান সামন্তরা, মঠের সন্ন্যাসীরা, কাতারে কাতারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সাধারণ মানুষ—এক হাতে বাইবেল, অপর হাতে মুক্ত কৃপাণ 'মাম মার' শব্দে ধেয়ে চলেছে পবিত্র জেরুসালেমকে মুক্ত করতে।...

সবসুদ্ধ এমন আটটি ক্রুসেড হয়েছিল। তার মধ্যে দু' একটির কথা ইতিহাস বিশেষভাবে স্মরণ করে।

প্রথম ক্রুসেডে এক আবেগপ্রবণ ফরাসী সন্ন্যাসীর অবদান ছিল সর্বাধিক। নাম তাঁর পিটার। তিনি জেরুসালেমে তীর্থ করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ করে এলেন, খৃষ্টানদের উপর মুসলমানদের অকথ্য অত্যাচার। খৃষ্টানদের সেই লাঞ্ছনায় কাঁদতে লাগলেন পিটার। তাঁর সেই কান্নার ভিতর দিয়ে রূপ নিলো এক কঠিন প্রতিজ্ঞা। পিটারের মনে হলো, মাতা মেরী যেন তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন, এ পবিত্র স্থানকে মুক্ত করতে হবে।

স্বদেশে ফিরে এসে পিটার মানুষকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। এক গির্জা থেকে অন্য গির্জায় ছুটে যান এবং খৃষ্টসমাজকে জানান এই মুহূর্তে তাঁদের কর্তব্য হলো জেরুসালেমকে মুক্ত করা, স্বয়ং মাতা মেরী এবং ঈশ্বর পুত্র যীশু তাঁকে এই নির্দেশ দিয়েছেন।···চারদিকে সাড়া পড়ে গেলো। সন্ন্যাসী পিটার হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে নিয়ে জেরুসালেম উদ্ধারে চললেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন 'পেনিলেস' অর্থাৎ কপর্দ্দকশূন্য ওয়ালটার নামক একজন নাইট। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ছিল যুদ্ধ বিদ্যায় একেবারে অপটু তাদের অশক্ত হাত কোনদিন কৃপাণ স্পর্শ করে নি; শুধু ধর্মীয় আবেগে বন্যার জলের মতো ছুটে আসছে।

পিটারের স্বপ্ন সফল হয়নি। পারেননি তিনি জেরুসালেমকে উদ্ধার করতে।

দু'হাজার মাইল হেঁটে আসতেই পিটারের সঙ্গীরা তাদের শক্তি ও উদ্যমকে হারিয়ে ফেলেছিল। জেরুসালেমের দ্বারে যখন তারা পৌছল, তখন আত্মরক্ষার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। ভীমদর্শন তুর্কীদের শাণিত তরবারি লক লকিয়ে উঠলো,—অসহায় খৃষ্টানদের রক্তাক্ত দেহগুলি লুটিয়ে পড়লো জেরুসালেমের মাটিতে।

অবশ্য পিটারের দলের পিছন পিছন আসছিলেন আর একটি বিরাট দল, ইউরোপের সামন্তরা ধেয়ে আসছিলেন তাঁদের সুশিক্ষিত বাহিনী নিয়ে। এই বাহিনীই কিছুকালের জন্য জেরুসালেমকে মুসলমানদের কবল থেকে মুক্ত করে নেয়। কিন্তু সেই মুক্তি সাময়িক।

তুর্কীরা তরবারি ঘুরিয়ে আবার দখল করে নেয় জেরুসালেম।

প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রুসেডের চাইতে অনেক বিস্তৃত ও গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় ক্রুসেড। প্রথম ক্রুসেডে বিধ্বস্ত হয়েছিলেন ইউরোপের বহু ডাকসাইটে সামন্তরা। তৃতীয় ক্রুসেডে এবার এগিয়ে এলেন

রাজন্যবর্গ। কাঁধে কাঁধ, হাতে হাত মিলিয়ে তারা জেরুসালেম উদ্ধারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সাধারণ আবেগপ্রবণ মানুষরা এবং সামন্তরা যা পারেন নি, রাজারা যূথবদ্ধ হয়ে তাই সম্পন্ন করবার স্বপ্ন দেখলেন। ইংলণ্ডের সিংহ বিক্রম রিচার্ড, ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ এবং লাল দাড়ি সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা ছিলেন এই দলে।

রাজা রিচার্ড এবং ফিলিপ একসঙ্গে যাত্রা করলেন। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন সম্রাট ফ্রেডারিক। তাঁর বিরাট দলবল নিয়ে কক্ষচ্যুত উল্কার মতো ছুটে চলেছেন প্যালেস্টাইনের দিকে। বয়সের বিবর্তন চূড়ান্ত ছাপ রেখে গেছে তাঁর সমস্ত দেহে। কিন্তু মনে তিনি নবীন, যুবকের মানসিকতায় বলীয়ান। প্যালেস্টাইন তাঁকে উদ্ধার করতেই হবে!

কিন্তু নিয়তির আশ্চর্য বিধান!

প্যালেস্টাইনে পৌঁছবার আগেই নদীর জলে ডুবে মরলেন সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা। তাঁর বিশাল নেতৃত্বহীন সেনাবাহিনী একান্তই বিব্রত হয়ে পড়ে। পিছনে ফিরে যাবার মতো রসদ তাদের নেই, এগিয়ে যাবার মতো মানসিকতাও তারা হারিয়ে ফেলেছে। মাথার উপর শকুনরা ডানা মেলে মৃত্যু কামনা করছে, আদিগন্ত আরণ্যক পরিবেশ এবং জলাভূমি ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত দিচ্ছে,···ঐ দূরে দেখা যায় হাজার হাজার খাপখোলা দামাস্কাসী তলোয়ার, আরবী ঘোড়ার দ্রুত আগমন, সোলেমান আর সালাদিনের নামে মাটি ও আকাশ কাঁপানো গর্জন,·· আর রক্ষা নেই।···

সারাসেনের ভয়াবহ যুদ্ধে নেতৃত্বহীন, উদভ্রান্ত ফ্রেডারিকের সেনারা তুর্কীদের হাতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। ফ্রেডারিকের অতৃপ্ত আত্মা গুমরে গুমরে ওঠে।···

রিচার্ড আর ফিলিপও বেশীক্ষণ একসাথে চলতে পারলেন না। ফিলিপ রিচার্ডের শ্রেষ্ঠত্বকে ঈর্ষা করেন; আর রিচার্ড ফিলিপের অহমিকাকে বরদাস্ত করতে রাজি নন।

ফিলিপ ফিরে এলেন তাঁর দল নিয়ে কিন্তু সিংহ বিক্রম রিচার্ড একাই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর সাহস ও বীরত্বের কথা প্রবাদের মতো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।...রিচার্ড জেরুসালেম জয় করতে পারেন নি। কিন্তু মুসলীম সম্রাট সালাদিন তাঁর বীরত্বে ও মহত্বে মুগ্ধ হন। সালাদিনের সাথে সন্ধি করে স্বদেশে ফিরে এলেন রিচার্ড।

পঞ্চম ক্রুসেডের কাহিনী বড় করুণ। ইতিহাসে অতবড় ট্রাজেডি খুব কমই ঘটেছে। এই ক্রুসেডকে বলা হয় কিশোরদের ক্রুসেড। এক অনভিজ্ঞ তরুণের নেতৃত্বে হাজার হাজার কিশোর, যুবক, যুবতী বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, জেরুসালেম উদ্ধারে বের হয়। তারা প্রত্যেকেই অনভিজ্ঞ। যুদ্ধ তারা কোনদিন করেনি, পথঘাটও তাদের সম্পূর্ণ অচেনা।

কয়েকজন অসাধু দাস ব্যবসায়ী এই দলে জুটে গেল। তারা ভুলিয়ে হাজার হাজার বালককে জাহাজে চাপিয়ে উত্তর আফ্রিকায় নিয়ে যায় এবং সেখানে ক্রীতদাসদের বাজারে বিক্রী করে দেয়। এই ক্রুসডের খুব কম লোকই ফিরে আসতে পেরেছিল, পথ ভুলে অনেক হারিয়ে যায়। পথকষ্টে মারা যায় বহুলোক, বাকি যারা ছিল, তুর্কীরা তাদের পিঁপড়ের মতো টিপে মেরেছে।

অর্থাৎ ক্রুসেড সফল হয় নি।

খৃষ্টসমাজের আন্তরিকতা ও আবেগ সত্ত্বেও ইউরোপের প্রয়াস ব্যর্থ হলো। সমুদ্রের ঢেউ যেমন গ্রাণাইট প্রস্তরে বার বার আছড়ে পড়ে ও ফিরে আসতে বাধ্য হয়, ইউরোপীয়দের এই ধর্মযুদ্ধও তেমনি বারবার তুর্কীদের প্রত্যাঘাতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল।
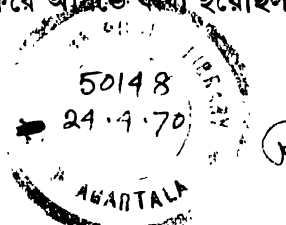
১৯২১ খৃষ্টাব্দে ক্রুসডের পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রুসেড ব্যর্থ হলেও, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব হয়েছিল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। ক্রুসেড এনেছিল এক বিরাট সাংস্কৃতিক বিপ্লব। ইউরোপের চিন্তার জগতে এর অনুরণ হয়েছিল খুব তীব্র। ক্রুসেড ইউরোপীয় মনীষাকে সমৃদ্ধ করেছে, ক্ষতি কিছুই করেনি। যোদ্ধারা যে পথ ধরে যেতেন, সেখানে চাহিদা মেটাবার জন্য বসতো বড় বড় মেলা ও বাজার। ঐ সব বাজার থেকেই ক্রমে নূতন নগর সৃষ্টি হয়। ইটালীতে ভেনিস, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া ইত্যাদি নগর গুলির সমৃদ্ধির ইতিহাস এখানেই! পূর্বের সাথে বাণিজ্যিক তথা সাংস্কৃতিক যোগ সূত্র স্থাপনে ইতালী এভাবেই হাত পাকালো! তাই রেনেসাঁসের সাথে ক্রুসেডের একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র খুঁজে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না।

ইটালীতে আমাকে রোমের চাইতে ফ্লোরেন্স বেশী আকর্ষণ করেছে। রোমের প্রাচীন অট্টালিকা, সেনেট, টুর্ণামেণ্টের স্থান ইত্যাদি সবই সেই বিশাল রোমসাম্রাজ্যের বিলাসের, বৈভবের ও অবক্ষয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এগুলো দেখলে মনে হয়, পতনের যুগে রোমান প্রধানদের ভিতর কি ভয়াবহ Sadism না স্থান পেয়েছিল! মানুষকে হিংস্র জন্তুর মুখে ঠেলে দিয়ে বন্য আনন্দে উল্লসিত বোধ করা, ক্রীতদাসের পিঠে অনবরত চাবুকের মারা, ভাড়াটে সৈন্যদের হাতে দেশ রক্ষার ভার তুলে দিয়ে নগ্ন নারীর দেহ ও সুরা আকণ্ঠ পান করা,—এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ শোষিত মানুষের অর্তনাদ ও দীর্ঘশ্বাস যেন শুনতে পাই। উন্মত্ত ক্যালিগুলো দাঁত বের করে হাসছে! মত্ত নীরো আগুন ধরিয়ে দিয়েছে সোনার রোমে, মানুষ পোড়া গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে; হাজার হাজার ক্রুদ্ধ নর-নারী, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী ছুটে আসছে রাজপ্রাসাদ চূর্ণ করে ফেলতে, হত্যা করতে মদমত্ত নীরোকে, একের পর এক গ্ল্যাডিয়েটর বাহু উঁচিয়ে ছুটে আসছে চূড়ান্ত আঘাত হানতে। ভাস্কর্যের

নিদর্শন, মর্মর প্রস্তরের আকর্ষণীয় বিবিধ মূর্তি, স্বর্ণপাত্র, হীরক খচিত রকমারি গহনা—সমস্ত গুঁড়িয়ে দিতে চাইছিল তারা, নিপীড়িত গণমানুষের সে এক রুদ্র রোষ! এর দাবাগ্নিতে পুড়ে যেতে পারে যে কোন শোষণতান্ত্রিক শক্তি! রোমের ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ তাই এক একটি অসম্পূর্ণ বিপ্লব। এদের পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণে আরো কয়েক শতব্দী কেটে গেছে।

সর্বহারাদের এই অসন্তোষ আজকের নয়। এই বারুদ সঞ্চিত হয়ে আছে অনেক শতাব্দীর ওপার হতেই। সময় সময় স্থানে স্থানে ওতে বিস্ফোরণ ঘটেছে। কিন্তু পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক বিস্ফোরণ এখনো ঘটেনি। তবে ঘটবে! ঘটবেই,—ইতিহাসের অমোঘ গতি!

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, রোমের চাইতে ফ্লোরেন্সই আমায় বেশী করে টানে। ফ্লোরেন্সের উপকূলে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, উচ্ছল ভূমধ্য-সাগরের ফেনায়িত আছাড়ি পিছাড়ি। হু হু বাতাসের ঝাপটা,—কপালের উপর এলো মেলো চুল নর্তন করতে থাকে। একটা চুরুট ধরিয়ে তুঁলোকে চিঠি লিখতে বসলাম। কিন্তু দু'কলমের বেশী লিখতে পরলাম না। বাতাসের ছেলেমানুষীতে প্যাডের পাতা পত্ পত্ করে উড়তে থাকে। লেখার পাট গুটিয়ে বেলাভূমিতে নেমে এলাম। স্নানরতা এক যুবতীর অনুপম সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলাম! ইতালীর কোন যুবতীকে দেখলেই কেন যেন মোরাভিয়ার নায়িকাদের কথা মনে পড়ে যায়। 'টু উইমেন' এর সেই মা ও মেয়ের ক্লেদাক্ত সংগ্রাম 'রোমের রূপসী'র করুণ পরিণতি,—এই সমস্ত ছবিগুলি মনের কোণে দোল খেতে থাকে।

ফ্লোরেন্সে আমার বন্ধু-বান্ধবী কম। বলতে গেলে একেবারে নিঃসঙ্গ। প্রায় সর্বক্ষণই গ্রন্থ-জগতে ডুবে আছি। প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে পারি আধুনিক সভ্যতার প্রথম সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটেছিল এই নগরীতে। এখান থেকেই তা প্রচারিত হয়েছিল বিশ্বের সর্বত্র,—পূবে,-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে!

রেনেসাঁস!

নবজাগরণ!

শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল সেই যুগ সন্ধিক্ষণে। আজকের দিনে যে বিজ্ঞান ভিত্তিক ও যুক্তিবাদী সভ্যতা নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করি, তা রেনেসাঁসেরই অবদান। অথচ, মজা হলো, এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিষয়বস্তু কিন্তু অতীত বিশ্বের অজানা ছিল না। এশিয়ায় যেমন ভারতবর্ষ, চীন ও ব্যাবিলন হাজার হাজার বৎসর পূর্বেও জ্ঞানের বর্তিকা জ্বালিয়ে রেখেছিল, ইউরোপে তেমনি সভ্যতার দীপ তার রশ্মি বিকিরণ করছিল গ্রীসে। গ্রীক সভ্যতার গভীরতা বিস্ময়কর! রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য,—সর্বত্র গ্রীক মনীষা তার সৃজনশীলতার পেলবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সক্রেটিস, এ্যারিষ্টটল, থুসিডাইসিস, পিথাগোরাস, হোমার,—ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রগুলিতে এত সব মহমানবের আবির্ভাব ঘটেছিল। এ ভাবে রোম সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভের বহু পূর্বেই গ্রীস ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে চমকপ্রদ সভ্যতার বিস্তার ঘটে। গ্রীসদেশের স্বাধীন নগর রাষ্ট্র সমূহ ইউরোপে সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক শাসনের আদর্শ স্থাপন করেছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে গ্রীসদেশের রাজনৈতিক অবনতির সূত্রপাত হয় এবং খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রবল প্রতাপান্বিত রোমানরা গ্রীসের স্বাধীনতাকে গ্রাস করে নেয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, রাষ্ট্রশক্তিরও হস্তান্তর ঘটে। কিন্তু মানব সভ্যতার মূল ধারা কখনো বিনষ্ট হয় না! এক সভ্যতার সূত্র অপর এক সভ্যতাকে আশ্রয় করে নবপ্রাণ রসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। গ্রীক সভ্যতার প্রভাবও তাই রোমান অক্রমণে লোপ পায়নি। বরং বিজেতা রোমানরা গ্রীক সভ্যতাকে নিজেদের সম্রাজ্য মারফৎ ইউরোপের অন্যত্র ছড়িয়ে দিল।

যতদিন রোমান সূর্য অস্তমিত হয়নি, ততোদিন এই গ্রীক রোমের সভ্যতা সগৌরবেই বিরাজিত ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বর্বর

জার্মান ও হূন জাতির অক্রমণে পশ্চিমে রোম সম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেলো। 'বিধাতার কশা' হূন নেতা এ্যাটিলা দাবানলের মতো জ্বালিয়ে দিল দুর্বল রোমকে। বিলাসী রোমকে। দুর্দ্ধর্ষ জার্মান উপজাতিরা বন্যার জলের মতো ছেয়ে ফেললো রোম সাম্রাজ্যকে। বিলাসী রোমক শাসকরা নিজেদের অপকর্মের মাশুল দিলেন ভাল-ভাবেই। আবার পশ্চিমী ইউরোপ অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে দিল। উন্নত সভ্যতার পরিবর্তে দেখা দিল বহুবিধ কুসংস্কার। পশ্চিম ইউরোপের সাথে বহির্জগতের যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এলো। জন সাধারণ খামখেয়ালি রাষ্ট্রশক্তি এবং স্বার্থপর যাজক সম্প্রদায়ের হাতে নিগৃহিত হতে থাকে। ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন অস্তিত্ব সে যুগে ছিল না। অসহায়ের আর্তনাদ, সবলের হুঙ্কার, যাজকদের অত্যাচার, রাজ পুরুষদের ব্যাভিচার,—এ সমস্তই ছিল সেই অন্ধময়-যুগের বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিম ইউরোপ যখন এমন অন্ধকার সমুদ্রে ক্রমশই তলিয়ে যাচ্ছিলো, পূর্ব ইউরোপ কিন্তু তখনো গ্রীক-রোমক জীবন-মুখী সভ্যতাকে বজায় রেখেছিল। বাইজ্যানটাইন সম্রাজ্য জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিল্পে, সাহিত্যে চতুর্দিক আলোকিত করে রেখেছে। রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলের সৌন্দর্যের কোন তুলনা ছিল না। এই নগরীর ঐশ্বর্য আজ রূপকথার মতো শোনায়। রূপকথার রাজপুরীর মতোই সোনার গাছে মাণিমাণিক্যের ফল ঝুলতো, ডালের উপর বসে সোনার পাখী গান গাইতো। রাজপুরুষদের বৈভব ও সম্পদ দেখলে বাগদাদের হারুণ-অল-রসিদকেও নিষ্প্রভ বলে মনে হবে। কত বিভিন্ন দেশ-বিদেশ থেকে প্রাচ্য দেশের শ্যামবর্ণ মানুষ, মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলীয় পীতবর্ণের মানুষ এবং ইউরোপের শ্বেতকায় মানুষরা পাশাপাশি ঘুরে বেড়াতো, পারস্পারিক ভাবের আদান-প্রদান চলতো। ওখানকার জমজমাট পরিবেশ যেন চিরায়ত। কনস্ট্যান্টিনোপলই ছিল যেন. বিশ্ব সভ্যতার ধারক, বাহক ও প্রচারক! কত ভিন্‌দেশী সার্কাস খেলোয়াড় ও বাজীকরের দল এখানে ভিড় জমাতো। প্রকাণ্ড বন্দরে

উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের বুকে শোভো পেতো শত শত পাল তোলা জাহাজ। দাঁড় টেনে টেনে আসছে, যাচ্ছে,—হাজার হাজার পেশল হাত উঠছে-নামছে। সিংহল শ্যাম, ভারত, ইথিওপিয়া থেকে লোহিত সমুদ্রের বুক চিরে সেই সমস্ত বাণিজ্যপোত রকমারি পণ্যদ্রব্য বয়ে আনতো এখানে! চীনের সঙ্গেও বাণিজ্যিক যোগাযোগ বর্তমান ছিল। শোনা যায়, চীন থেকে রেশমের গুটি পোকা লুকিয়ে এনে এ রাজ্য প্রথম রেশম শিল্পের প্রবর্তন করা হয়।

কিন্তু এমন জমজমাট সভ্যতারও একদিন পতন ঘটলো।

সম্রাজ্যে শান্তি ছিল না, বহির্আক্রমণ লেগেই ছিল। আরব-দের সাথে লড়াই চলছিল বহুবৎসর যাবৎ। আবার উত্তর দিক থেকে আভার ও স্লাভ হানাদার দলও ধেয়ে আসতে থাকে। অবশেষে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা কনস্ট্যান্টিনোপেল অধিকার করে নেয়। জলপথ ও স্থলপথ,—উভয়দিক থেকে তুর্কীদের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রতিরোধ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে।

তুর্কীরা কন্‌স্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে নেবার ফলে এখানকার বিদগ্ধ মহল তাঁদের পুঁথিপত্র নিয়ে পালিয়ে আসেন পশ্চিম ইউরোপে। পালিয়ে আসেন ইটালীতে। আশ্রয় নেন ফ্লোরেন্স ও ভেনিসের বুকে।

ফ্লোরেন্স ও ভেনিস যেন সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল তাঁদের জন্য।

আবেগের সাথে গ্রহণ করা হলো এই সমস্ত পণ্ডিতদের। সর্বত্রই এই শাসকগণ এবং শিক্ষিত জনসাধারণ তাঁদের সাদরে বরণ করে নিলেন। এ সমস্ত মনীষীদের সাথে ছিল বহু মূল্যবান ও প্রাচীন পুঁথি। এতদিন পর্যন্ত কনষ্ট্যান্টিনোপলে জ্ঞানের যে আলো জ্বলছিল, এইবার তা সারা পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লো। গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির সাথে শুভদৃষ্টি বিনিময় হলো পশ্চিম ইউরোপের।

এটাই হলো রেনেসাঁসের আদি কথা। এক হিসাবে একে প্রাচীন ইওরোপীয় সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কার বলা যেতে পারে।

'Out of the turmoil and travail that were sprea-ding all over Europe rose the fine flower of Renaiss-ance. It grew in the soil of Italy first, but it looked across the Centuries to old Greece for inspiration and nourishment.'[2]

ভেনিস আর ফ্লোরেন্স হয়ে আধুনিক সভ্যতা ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করে তুললো। আবিষ্কৃত হলো মুদ্রণ যন্ত্র। অপসারিত হলো জ্ঞান বিস্তারের প্রধান বাধা। অল্প ব্যয়ে বহু সংখ্যক গ্রন্থ প্রস্তুত হতে লাগল, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো তারা। লোকের জ্ঞান চক্ষুর উন্মেষ ঘটলো— এই নব জাগরণের এক মস্ত হাতিয়ার হয়ে উঠলো মুদ্রণ যন্ত্র।

রেনেসাঁস তার সুবিস্তৃত বৈশিষ্ট্যের ডালা খুলে দেয়। শেষ হয়ে আসে ধর্মযাজকদের ভণ্ডামি ও নষ্টামি। এতদিন যাবতীয় শিল্প ও সাহিত্য চর্চা ছিল সম্পূর্ণ ধর্মভিত্তিক। মানব জীবনের সুখ দুঃখের ও মানুষের ইহলৌকিক আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন স্থান তাতে ছিল না। কিন্তু রেনেসাঁস তাদের এই ধ্যান ধারণার হাত থেকে মুক্তি দিল। মধ্য যুগীয় ধর্মীয় কুসংস্কার প্রচণ্ড মার খেলো নতুন যুগের বাস্তবমুখী ও যুক্তিবাদী দৃষ্টি ভঙ্গীর কাছে। সাহিত্যে ও শিল্পে মানব-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পাথিব চিত্র মূর্ত হয়ে ওঠে।

আবির্ভূত হলেন মহাকবি দান্তে। 'ডিভাইন কমেডি'র সুললিত পরিক্রমা ভাষা ও সাহিত্যে বিপ্লব আনে। এতকাল সাহিত্য রচিত হতো শুধুমাত্র ল্যাটিন ভাষায়। 'ডিভাইন কমেডি'ই সর্বপ্রথম সাধারণের বোধগম্য ইতালীয় ভাষায় রচিত মহাকাব্য।

দান্তের উত্তরসূরী পেত্রার্ক [ Petrarch ]। ইটালীর সাহিত্য ক্ষেত্রে মানবতাবাদের চারণকবি তিনি। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক

2 Glimpses of World History : Jawhar Lall Nehru.

সাহিত্যের আধুনিক পরিবেশনে তাঁর অবদান যুগ ও কালকে অতিক্রম ক'রে গেছে।

পেত্রার্ককে অনুসরণ করে একদল নূতন লেখকের আবির্ভাব হয়। এদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন বোক্কাচিও [Boccaccio ]।

পরিবর্তনের জোয়ার বয়ে চলেছে শিল্পের ক্ষেত্রেও। এ যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এক হাতে ধরেছেন কলম অন্য হাতে ছিল তুলি। চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি [ Leonardo da Vinci ], র‍্যাফেল [ Raphael ] এবং মাইকেল এঞ্জেলো [ Michael Angelo ]।···

এই রূপসী নগরী ফ্লোরেন্সে অনেক রাতে আমি পায়ে পায়ে নির্জনতা খুঁজে বেড়িয়েছি। পার্কে গিয়ে বসে থেকেছি বহুক্ষণ। পাইন আর ওর্ক গাছের দীর্ঘ ছায়া আলম্বিত রয়েছে আমার দেহের উপর। বাতাসের নিঃস্বনে মধুর আমেজ। চোখ বুজে আসে। ইটালীর বুক থেকে ফ্যাসিজম মুছে গেছে। ডিউসের [ মুসলিনী ] নামে আর তাঁরা পাগল নয়; বরং ইটালীয় কমিউনিস্টপার্টি আজ বিশ্ব সমাজ তান্ত্রিক অন্দোলনে নতুন দিগন্ত উন্মেষের প্রয়াস পাচ্ছে। তোগলিয়তের চিন্তাধারা সাড়া জাগতে সক্ষম হয়েছে কমিউনিস্ট শিবিরে শিবিরে।

ফরাসীদের মতো ইটালীয়দেরও উপর আমার আস্থা ও শ্রদ্ধা গভীর।

বিশ্ব রাজনীতির নিত্য নূতন পথ নির্দেশে এই দেশের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। সাংস্কৃতিক বিপ্লবে এর অবদান সর্বাধিক। বিশেষত এই ফ্লোরেন্স শহরটিকে আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান বলা চলে। রেনেসাঁসের যুগে এখানে জন্মে ছিলেন রাষ্ট্র বিজ্ঞানী মেকিয়াভেলী [ Machiavelli 1469 ]। জাতীয়তাবাদী, উচ্চ শিক্ষিত বিদ্রোহী যুবক। সে সময় ইটালীর বেশীর ভাগ রাজ্যে দেশ রক্ষার জন্য বেতনভোগী সৈন্যরা মোতায়ন থাকতো। এদের সংগ্রহ করা হতো ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে। মেকিয়াভেলী

এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। জানালেন, এমন ব্যবস্থার ফলেই একদিন রোমের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল।···মেকিয়াভেলি স্বয়ং ফ্লোরেন্স রক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। ফ্লোরেন্স শহরের যুবকদের নিয়ে একটি সেনাবাহিনীও গঠন করলেন।

কিন্তু তাঁর এই প্রয়াস ব্যর্থ হলো।

অল্প দিনের মধ্যেই শত্রুর আক্রমণে ফ্লোরেন্সের পতন হলো। যুদ্ধ বিদ্যায় অপটু মেকিয়াভেলির বাহিনী তচনছ হয়ে গেলো। প্রাণ ভয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে পালাতে লাগলেন মেকিয়াভেলি। শেষে আত্মগোপন করলেন এক দূর গ্রামে—ফ্লোরেন্সের প্রতিটি নাগরিক তার শত্রু হয়ে উঠেছে। অসীম নিঃসঙ্গতায় হারিয়ে গেলেন মেকিয়াভেলি। নিদারুণ দারিদ্র্যে ও অবহেলায় তাঁর বাকী জীবন কেটেছে। নিজের কুঁড়েতে ঢুকে গভীর রাত পর্যন্ত মেকিয়াভেলি লিখে চললেন তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি 'দি প্রিন্স' [The Prince] বই। এমন চমকপ্রদ রাজনীতির বই এর আগে রচিত হয় নি। শত্রুর সাথে কি রকম ব্যবহার করা উচিত, কি ভাবে শত্রুকে বশ করা যায়, আত্মরক্ষার উপায় কি,—এত সমস্ত নির্দেশ আছে এই বই খানিতে। মেকিয়াভেলি ফ্লোরেন্সের একটি ইতিহাসও লিখে গেছেন!

মেকিয়াভেলি ফ্লোরেন্সের সন্তান।

আবার মহামানব, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা লেওনার্দো দা ভিঞ্চিও এই ফ্লোরেন্সের কৃতী সন্তান।

দা-ভিঞ্চির প্রতিভার সম্যক ব্যাখ্যা করবার মতো শক্তি ও অবকাশ আমি এখনো অর্জন করতে পারিনি। তিনি কি ছিলেন না? পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রের যেমন ষোলকলা পূর্ণ হয়, দা-ভিঞ্চির ভিতরও প্রতিভার অনুরূপ পরিপূর্ণ অবয়ব দর্শনে আমরা চমৎকৃত হই। গত শতাব্দীর, এই শতাব্দীর এবং আগামী শতাব্দীর শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত

হচ্ছে এবং হবে দা-ভিঞ্চির উদ্দেশ্যে। তিনি একধারে ভাস্কর, চিত্রশিল্পী, যন্ত্রবিদ্, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও দার্শনিক। এমন বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ বিশ্ব ইতিহাসে আর কোন ব্যক্তিত্বে আমরা সন্ধান পাই না।··· দা-ভিঞ্চি ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। চমৎকার কলের পুতুল গড়তে পারতেন তিনি। একবার মিলান শহরে খুব সাড়া পড়ে গেল,—ফ্রান্সের সম্রাট সেখানে বেড়াতে আসছেন। পৌর কর্তৃপক্ষ দা-ভিঞ্চিকে ভার দিলেন, নগরটিকে যথাসাধ্য সুসজ্জিত করে তুলতে।

দা-ভিঞ্চির পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি প্রকাণ্ড তোরণ নির্মিত হলো। সেই তোরণের উপর তিনি এনে স্থাপন করলেন বিশাল একটি কলের সিংহ। ফ্রান্সের সম্রাট সেই তোরণ দ্বারে উপস্থিত হলে কলের সিংহ গর্জন করে উঠলো; সম্রাট সবিস্ময়ে দেখলেন, সিংহটি সামনের দুই পা তুলে উঁচু হয়ে বসে পড়েছে।

বাণিজ্যের উন্নতি এবং মিলান শহরকে সুরক্ষিত করবার দয়িত্ব নিয়ে দা-ভিঞ্চি উত্তর ইটালীতে বহু খাল খনন করান। আজও তাঁর অক্ষয় কীর্তি অম্লান আছে।

আগামী বিশ্বের-বিবর্তনের নানা চিত্রিত পরিকল্পনা রচনা করতেন লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি। তাঁর সুবিস্তৃত পরিকল্পনা ও ধ্যান ধারণা মানব সমাজের অগ্রগতির মূল ধারাটিকে ধরতে পেরেছিল। একটি খাতায় তাঁর এই চিন্তার ফসল লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর সেই খাতায় এখনকার যুদ্ধের সাঁজোয়া বাহিনী ও ট্যাঙ্কের কথা লেখা ও আঁকা আছে। তাঁর অনুমান ছিল, মানুষ একদিন যুদ্ধে এই সমস্ত উন্নত অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করতে শিখবে।

দা-ভিঞ্চি একস্থানে লিখেছেন···যুদ্ধের বিবর্তনে মানুষ অনেক পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এখনকার হাতী আর যুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না। মানুষের বা জন্তুর দৈহিক শক্তির চাইতে যন্ত্রই হবে চূড়ান্ত শক্তির অধিকারী। যন্ত্রই সমস্ত কাজ চালাবে!

এই কম্পিউটার ও অটোমেশানের যুগে আমরা সবিস্ময়ে ভাবি, দা-ভিঞ্চির অনুমান কত অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

দা-ভিঞ্চি আকাশে উড়বার এরোপ্লেন, ডুবোজাহাজ ও যুদ্ধে বিষাক্ত বাষ্পের ব্যবহার সম্পর্কেও সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে যান। এ সমস্তই আজ সত্যে পরিণত হয়েছে!

দা-ভিঞ্চি সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। কত বিস্ময়কর জীবন্ত চিত্রই না তিনি তাঁর তুলির টানে এঁকে গেছেন। তাঁর দু'খানা ছবির নাম আজ পাঁচ বছরের একটি শিশুও বলতে পারে,—(১) অন্তিম ভোজ [ Last Supper ] ও (২) মোনালিসা [ Monalisa ]।

মহামানব যীশু মৃত্যুর সাহাহ্নে তাঁর প্রিয় শিষ্যদের নিয়ে একটি ভোজ সভায় বসে আছেন। এটাই হলো লাষ্ট সাপার।

আর মোনলিসা একটি সুন্দরী মেয়ের অনুপম চাপা হাসি। কোন এক বণিক-পত্নী লিসার সেই রহস্যময় হাসি শিল্পীর অন্তকরণে ছাপ রেখে গিয়েছিল। সৃষ্টির গভীর প্রেরণায় হৃদয়ের সেই উষ্ণতাকে দা-ভিঞ্চি অমর করে রেখেছেন 'মোনালিসা'র ভিতর দিয়ে মোনালিসা আজ বহুল-প্রচারিত, উচ্চারিত একটি নাম; যেন একটি প্রবাদ।···

ফ্লোরেন্সের একটি ছোট্ট পাঠাগার 'সিপান'। সিপানে আমি বেশ কয়েকদিন গিয়েছি। ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন ইউরোপীয় ভাষা আমার জানা নেই। তাই সকলের সাথে সহজে মেলামেশা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। শুধু সামান্য অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ লাভ করেছিলাম—বৃদ্ধ অধ্যাপক ডঃ দিত্রিশ মোনাসার সাথে। সিপান পাঠাগারে নিয়মিত আসতেন তিনি। আমাকে ভারতীয় বলে সানক্ত করতে তাঁর মোটেই অসুবিধে হয় নি। আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ীতে। স্ত্রী এবং দুই পুত্র নিয়ে ছোট খাটো সংসার। প্রফেসার কানে কম শোনেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমার শব্দে তাঁর শ্রবণশক্তি একদম নষ্ট হয়ে যায়। ওঁর স্ত্রীর মুখে শুনলাম, বিশ্বযুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনগুলির

কথা! অর্ধাহারে, অনাহারে, দিন কেটেছে। দু'পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে গেলেও দুটো ডিম কেনা সম্ভব হ'তো না যুদ্ধের বাজারে। দিন রাত বোমা ফাটছে, পরাজিত সৈনিকের জ্বালা, কামনা মেয়েদের শালীনতাকে বিপন্ন করে তুলেছে বার বার, যুবশক্তি লোপ পেতে চলেছে। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকরা নেই, কারখানায় আগুন জ্বলছে দাউ দাউ,.........সে এক ভয়াবহ চিত্র।

'...আমাদের কিছুই ছিল না। তবে আজকাল আমরা আবার সামলে উঠেছি।...'—মিসেস্ মোনাসা বললেন। সত্যই ইতালী আবার সামলে উঠেছে। ইউরোপীয় দেশগুলির প্রাণপ্রাচুর্য অপরিমেয়!

প্রফেসার আমাকে বললেন, 'ইটালীয় আর্টের যদি পরিচয় চান, তবে ভ্যাটিক্যান প্যালেসে যান। সিসটাইন চ্যাপেলে দেখে আসুন মাইকেল এঞ্জোলোর কাজ!...'

মাইকেল এঞ্জোলো।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবে ফ্লোরেন্সের আর এক অমর যোদ্ধা।

দা ভিঞ্চির চাইতে বয়সে পঁচিশ বছরের ছোট ছিলেন এঞ্জোলো দা ভিঞ্চির অনুরক্ত ছিলেন তিনি। তাঁদের দু'জনের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিলও ছিল খুব। তিনিও একাধারে ছিলেন চিত্রকর, স্থপতি ও ভাস্কর। চমৎকার কবিতাও লিখতে পারতেন তিনি।... ধর্মগুরু পোপ তাঁকে ভ্যাটিক্যান প্যালেসে ডেকে আনেন। দায়িত্ব দেন, তার প্রসাদের গির্জায় বাইবেল ও যীশুর জীবনী অবলম্বিত চিত্রাঙ্কন করতে, এঞ্জোলো নিজের জীবন, সাধনা, আদর্শ সবই উৎসর্গ করলেন সেই অমর চিত্রসজ্জায়। এইগুলি তাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ চিত্র। চারটি বৎসরের প্রতিটি ক্ষণ প্রতিটি মুহূর্তে তিনি কখনো এখানে ছবি এঁকেছেন, কখনো সেই ছবির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য চিন্তার অতলান্তে ডুব দিয়েছেন। কখনো তিনি চিৎ হয়ে গির্জায় ছাদে এঁকেছেন, কখনো উবুড় হ'য়ে গির্জ্জায় কোন এক সংকীর্ণ কোণকে চমৎকার সজ্জায় সজ্জিত করে তুলেছেন। দীর্ঘ

চার বৎসর ক্ষীণ আলোকে এমনি কাজ করেছেন মাইকেল এঞ্জেলো। এই দীর্ঘ সময় তিনি সূর্যের মুখ দেখবার সুযোগ পান নাই। তারপর কাজ শেষে যেদিন বেরিয়ে এলেন, তখন চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, অনবরত জল গড়াচ্ছে। সূর্যের আলো চোখে এসে পড়তেই শিল্পী আর্তনাদ করে উঠলেন। সূর্যের আলো আর তাঁর সহ্য হচ্ছে না।

ভ্যাটিক্যানে যাবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। হাতে সময় ছিল না একদম। কিন্তু প্রফেসার মোনাসার ব্যক্তিগত পাঠাগারে এঞ্জোলোর একাধিক প্রিণ্ট আমি দেখেছি আর দেখেছি র‍্যাফেলের [ Raphael ] আঁকা অদ্ভুত স্নিগ্ধ ছবি 'মা'—'ম্যাডোনা'!

রেনেসাঁসের অন্যতম পুরহিত শিল্পী র‍্যাফেল। মাইকেল এঞ্জোলোর চাইতে আট বছরের ছোট, ইটালীর উবনিবো শহরে তাঁর জন্ম। যৌবনে চলে এলেন ফ্লোরেন্সে; সেখান থেকে গেলেন রোমে, ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা তিনি। স্থাপত্যের কাজেও তাঁর হাত ছিল। পোপের প্রাসাদের একাধিক ছবি তাঁর আঁকা। যীশুর মাতা মেরীকে নিয়ে তাঁর ছবিগুলিই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। অনেক বিখ্যাত চিত্রকর মেরীর ছবি এঁকেছেন, কিন্তু 'ম্যাডোনা' বলতে সাধারণত র‍্যাফেলের আঁকা ছবির কথাই মনে হয়।...

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উষ্ণতাকে স্পর্শ করবার উদ্দেশ্য মাত্র একদিনের জন্য ফ্লোরেন্স ত্যাগ করে মিলান নগরীতে গিয়েছিলাম। রেনেসাঁস যুগের কীর্তি খুঁজতে খুঁজতে হাজির হলাম মিলান শহরের গির্জায় কাছে। এটি সেই যুগের আর এক অক্ষয় সম্পদ। গথিক রীতির উৎকর্ষতা যে কোন সমুন্নত পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, মিলান শহরের গির্জাটিকে না দেখলে তা কল্পনাও করা যায় না, শ্বেত পাথরে প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম যেন। কত সূক্ষ্ম কারুকার্য বিস্ময়কে তাঁর অন্তিম পর্যায়ে টেনে নিয়ে যায়। এই গির্জা নির্মানের পিছনে একটি কাহিনী আছে। পরে ফাদার জনের কাছে শুনেছিলাম।

চতুর্দশ শতকে এই মিলান শহরে নাকি একবার শিশুদের মহামারী দেখা দেয়। হাজার হাজার ফুলের মতো সুন্দর ও নিষ্পাপ শিশু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে থাকে। এই মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মাতা মেরীর নামে এই গির্জা প্রতিষ্ঠা করা হলো। সাথে সাথে থেমে গেলো মহা-মারী। মেরীর প্রসন্ন হাসিতে আগের দিন গুলিকে ফিরে পাওয়া গেলো। এমন একটি গির্জা এক আধ বৎসরে সম্পন্ন হয়নি। প্রায় চার শতাব্দী ধরে কাজ চলেছে এটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে গড়ে তুলতে। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তিলতিল সাধনায় গড়ে উঠেছে, গথিক রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মিলানের গির্জা!

রেনেসাঁস নবযুগ এনেছে শিল্পে, সাহিত্যে, ভাস্কর্যে এবং বিজ্ঞানে।···বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রবর্তন, যুক্তিবাদী মানবিকতা,—কুসংস্কার কেটে গিয়ে জ্ঞানের আলোয় দশদিক আলোকিত হয়ে ওঠে,—সমস্তই সে যুগের অবদান। সবটাই বৈপ্লবিক।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসছে কোপারনিকাসের [ Copernicus ] নাম। বাড়ি অবশ্য তাঁর পোলাণ্ডে। কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র ইটালী। এখানে থেকে তিনি আইন ও বিজ্ঞান চর্চা করতেন। এ যাবৎকাল পণ্ডিতদের বিশ্বাস ছিল সৌরজগতের কেন্দ্র হচ্ছে পৃথিবী। পৃথিবী স্থির হয়ে আছে এবং তাকে ঘিরে সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহরা সমানে ঘুরপাক খাচ্ছে। দেব-মাহাত্ম্য প্রচারে পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজন ছিল পুরহিতদের। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব, প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, কোপার-নিকাস তাই ঘোষণা করলেন, এতকালের প্রতিষ্ঠিত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল সূর্য। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ তাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। কোপারনিকাসের বিরুদ্ধে চিৎকার উঠলো, চার্চে চার্চে, স্বার্থপর সম্প্রদায় তাঁকে নানাভাবে ভয় দেখাতে লাগলো।

কিন্তু কোপারনিকাসের বক্তব্যকে চেপে রাখা গেলো না। এই সত্যই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত করলেন অপর এক বিজ্ঞানী গ্যালিলিও [ Galileo ]। গ্যালিলিও পিসা ও পাদুয়া শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বললেন, কোপারনিকাস যা বলে গেছেন, তা সবই সত্য। এর চেয়ে বড় সত্য আর কি হতে পারে! নিজের বক্তব্যকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করবার জন্য গ্যালিলিও দূরবীণ নির্মান করলেন। ওর ভিতর দিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন সৌর-জগতের গতিবিধি—হাজার মাইল দূরত্বের গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র। তাদের বিচিত্র চরিত্র এতদিনে সত্যদ্রষ্টা বিজ্ঞানীর কাছে ধরা দিতে বাধ্য হলো।

গ্যালিলিও তাঁর বক্তব্য স্থাপন করতে গিয়েই দারুণ বাধা পেলেন। উগ্র মূর্তি ধারণ করলো চার্চ, পোপ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা মারমুখী হয়ে উঠলেন। চার্চ ঘোষণা করলো, গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক মতামত ধর্মবিরোধী ও ভুল। পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, এটা কখনো সত্য হ'তে পারে না।

গ্যালিলিওকে টেনে আনা হলো ধর্মজাজকদের বিচার সভায়। তাঁকে দোষী বলে সাব্যস্ত করা হলো। বাকী জীবন তাঁকে নজর বন্দী করে রাখা হলো। গোপনে গ্যালিলিও তাঁর গবেষণালব্ধ কাগজ পত্র কৃতী ছাত্রদের হাতে তুলে দিলেন। তারপর বসে রইলেন সেই অন্ধকার যুগে। প্রতীক্ষা করতে লাগলেন চরম লগ্নের। তাঁর দায়িত্ব ফুরিয়েছে। এবার আগামী যুগ বিচার করুন। শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গেলেন গ্যালিলিও। সেই অন্ধত্ব নিয়েও তিনি আলো দেখছেন,.. আগামী যুগ তাঁকে নিশ্চয় চিনতে পারবে।

ফ্লোরেন্স ছেড়ে যেদিন আবার প্যারির দিকে পাড়ি জমালুম সেদিন বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠলো। আর হয়তো কোনদিন আমি এই রূপকথার দেশে ফিরে আসতে পারবো না। ফরাসী সরকারের বৃত্তি নিয়ে ফ্রান্সে এসেছিলাম। সেই সুযোগে দেখে

গেলাম রেনেসাঁসের জন্মভূমিকে, রূপকথার দেশকে। ম্যাক্সিম গোর্কী এদেশের মানুষকে নিয়ে লিখেছিলেন 'ইটালীর রূপকথা'। আমি তো কারুর সাথেই মিশতে পারলুম না। নিজের এই দীনতা বুকের ভিতর একটা কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করছে।

ফিরে চলেছি। রাস্তার দু'পাশে সমভূমির বিস্তার বহুদূর, তার মধ্যে পাকা শস্যের মোটা মোটা হলদে ফিতা। উজ্জ্বল রোদের ঝিকি মিকি খেলা এবং মুখে ও পিঠে মিষ্টি ঝাঁজ। সমুদ্রের পানে ছুটেছে কলহাস্যে নর নারীর দল। সূর্যস্নান করবে তারা। মোটা সোটা লাল মুখো এক কিষাণীও হঠাৎ মাঠ ছেড়ে উঠে এসে সমুদ্রের পানে চলতে শুরু করলো। শুধু আমি একাই ফিরে চলেছি উল্টোমুখে।...

সংস্কৃতির পীঠস্থান থেকে বিদায় নিলেও সেই বিপ্লবের চিন্তা মনকে জুড়ে আছে! ইতালী থেকে নবজাগরণের ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়লো ইউরোপের অন্যান্য উপকূলেও। ফ্লোরেন্স, মিলান ও ভেনিসের সামুদ্রিক ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে এসে পড়লো টেমস্ নদীতে, রাইন্ নদীতে, ইন নদীর কিনার কিনারেও।

রাইন বিধৌত জার্মানীতে গ্রীকভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হলো। তবে জার্মানরা শিল্পে বা সাহিত্যে বিপ্লব আনার চাইতে ধর্মীয় বিপ্লবেই বেশী সাড়া দিলো। জার্মানীর রিউচ্‌লিন [Reuchlin] এবং ইরাস্‌মাস্ [ Erasmas ] বাইবেল চর্চা ও খ্রীষ্টধর্মের মূলনীতির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁদের তীব্র সমালোচনায় ধর্মীয় কুসংস্কার সবেগে নাড়া খায়; পরবর্তীকালে মার্টিন লুথার এদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চার্চের মুখোশ এক টানে খুলে ফেলেন। সাধারণ লোক চার্চের সেই শয়তানী প্রতিরূপ দেখে নিজেদের ভুল ও অজ্ঞতা বুঝতে পারে। ধর্ম বিপ্লবের এ আলোচনায় পরে আসছি।

হ্যাঁ, সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয়ে গেলো ফ্রান্সে, ইংল্যাণ্ডে, হল্যাণ্ডে। সাহিত্যে ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নবযুগের জোয়ার এসে পড়লো। হল্যাণ্ডে আবির্ভূত হলেন রুবেনস্ [ Rubens ] ও রেমব্রাণ্টের

[Rembrandt] মতো পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পীরা। ইংরাজী সাহিত্যে যৌবন এলো। অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটিতে শুরু হলো গ্রীক ভাষার চর্চা। জন্মালেন মার্লো, শেক্সপীয়র ইত্যাদি অমর প্রতিভা। জুলিয়াস সীজার, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, মার্চেন্ট অব ভেনিস, ওথেলো ইত্যাদি নাটক বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে মুক্তো বিছিয়ে দিলো। আবির্ভূত হলেন জ্ঞানতপস্বী ফ্রান্সিস বেকন [ Francis Bacon ]। বিজ্ঞান ও সাহিত্যে,—দুটোতেই তাঁর সমান দখল। বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস রচনার পথপ্রদর্শক তিনি। তাঁর একটি উপন্যাসে তিনি কল্পনা করেছেন, দূর সমুদ্রের এক নিঃসঙ্গ দ্বীপে একজন বৈজ্ঞানিক তাঁর গবেষণাগার স্থাপন করেছেন। সেই গবেষণা মানবজাতির কল্যাণে উৎসর্গিত।

বেকনের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসর পরে ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা 'রয়াল সোসাইটির [ Royal Society ] প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এবং বেকনের প্রতি উপযুক্ত সম্মান।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব ইউরোপের চিন্তার জগতে বিপুল পরিবর্তন আনলো। জড়ত্বের অবসানে সজীব প্রাণচঞ্চলতা মানুষের মনকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। শুরু হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুগ। রাষ্ট্র ও চার্চের খেয়াল খুশীতে মানুষ আর নির্বিবাদে সায় দিতে রাজি নয়। প্রতিকাজের যৌক্তিকতা খোঁজা মানুষের স্বভাব হ'য়ে দাঁড়ায়। নিত্য-নূতন আবিষ্কারের প্রতি মানুষের আকর্ষণ তীব্রতর হ'য়ে ওঠে।··· যুক্তিবাদী সচেতনতা নিয়ে মানুষ আক্রমণ করলো এতকালের পুঞ্জীভূত ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনাচারকে। যাজক শ্রেণীর বিলাসিতা ও আড়ম্বর পূর্ণ জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে বহু সংস্কারকের প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো। যীশুখ্রীষ্টের নির্দেশিত পথ থেকে বহুদূরে সরে আছেন যাজকরা,—সাধারণ মানুষ এটা উপলব্ধি করতে পারছিল। পোপের আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'য়ে উঠলেন

ইংল্যাণ্ডের উইক্লিক্ [ Wyclike ] এবং জার্মানীর জনহাস্ [ John Huss ]। অর্থসংগ্রহের জন্য পোপ ক্ষমাপত্র [ In dulgences ] বিক্রী করতেন। অর্থাৎ বিত্তশালী লোক কোন অন্যায় করতে পারে না!

জার্মানীতে মার্টিন্ লুথার এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন। সেই আন্দোলনের ফলে সমগ্র খৃষ্টান সমাজে ফাটল ধরলো। ইউরোপের একাধিক দেশ পোপের ধর্মীয় কৃতিত্ব অস্বীকার করলো। সেখানে প্রবর্তিত হলো লুথার প্রদর্শিত ধর্মীয় প্রতিবাদ বা Protestantism,

এই ধর্মসংস্কার আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো ইউ-রোপের সর্বত্র। বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তারা বিভক্ত। সুইজার-ল্যাণ্ডে জুইঙলি [ Zwingli ] এবং ক্যালভিন [ Calvin ] পৃথক চার্চের প্রতিষ্ঠা করেন।...এই ধর্মসংস্কার অন্দোলনের ফলে ইউরোপে জাতীয়তাবাদ পুষ্টিলাভ করে। মার্টিন লুথারের ধর্মীয় আন্দোলন শেষ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিচিত্র অভিপ্রকাশের আর একটি ফলশ্রুতি বিশ্বব্যাপী ভৌগলিক আবিষ্কারের। প্রাচ্যের সম্পদ ও মসলার ভাণ্ডার ইউরোপীয় বণিকদের যেন হাতছানি দিতে থাকে। এতদিন পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরের মারফৎ বাণিজ্য চলতো বলে ইটালীয় বণিকরা লাভের অঙ্কে ক্রমশঃই স্ফীত হয়ে উঠছিল। এখন স্পেন ও পর্তুগাল নতুন জলপথ আবিষ্কারে অগ্রণী হলো।

প্রথম অগ্রণী হলেন পর্তুগালের যুবরাজ হেনরী [ Henry the Navigator ]। আফ্রিকায় যীশুখ্রীষ্টের বাণীকে প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ঐ মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে একাধিক নৌ অভিযান প্রেরণ করেন। এই সমস্ত অভিযানের ফলে কেপভার্ডে, আজোর্স, মেডিরা ইত্যাদি দ্বীপ সভ্যজগতের গোচরে এলো, হেনরী ঠিকই

বুঝতে পেরেছিলেন, আফ্রিকার ঐ পশ্চিম উপকূল প্রদক্ষিণ করে জলপথে ভারতবর্ষে পৌঁছানো সম্ভবপর। অবশ্য তাঁর জীবদশায় তিনি তাঁর সেই স্বপ্নের বাস্তবরূপ দেখে যেতে পারেন নি।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দুঃসাহসিক পর্তুগীজ নাবিক বার্থোলোমিউ দিয়াস [ Bartho lomew Diaz ] আফ্রিকার দক্ষিণতম অন্তরীপে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু দারুণ সামুদ্রিক ঝড়ের তাণ্ডব চলছে সেখানে। অনেক কষ্টে টলমলায়মান জাহাজ নিয়ে ফিরে এলেন দিয়াস। নতুন আবিষ্কার হলেও স্থানটির প্রতি তাঁর খুব বিতৃষ্ণা,—সর্বগ্রাসী সামুদ্রিক ঝড় সব সময়েই ওখানে যেন দাপাদাপি করে চলেছে। মনের তিক্ততা নিয়ে দিয়াস সেই অন্তরীপের নাম দিলেন 'ঝড়ের অন্তরীপ' [ Cape of storms ]। কিন্তু পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন ঐ ঝড়ের পথেই যেন আশার আলো দেখতে পেলেন। তাঁর প্রত্যয় দৃঢ় হলো, ঐ অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেই ভারতবর্ষে পৌঁছবার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। তাই তাঁর নির্দেশে ঐ অন্তরীপের নতুন নামকরণ হলো 'উত্তমাশা অন্তরীপ' বা Cape of Good Hope.

এই পথ ধরেই পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা [ Vas-co-da gama ] ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে জাঞ্জিবারের মালিন্দি নগরে উপস্থিত হন। তারপর সেখান থেকে ভারত মহাসাগরে পাড়ি জমিয়ে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলের কালিকট বন্দরে অবতরণ করলেন। ভারত ও ইউরোপের জল-সূত্র আবিষ্কৃত হলো। সাথে সাথে কপাল পুড়লো ইটালীর ভেনিস, মিলান ও ফ্লোরেন্স নগরীর। আর যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো মূর ব্যবসায়ী ও তীর্থযাত্রীরা,—পর্তুগীজ জলদস্যুরা ক্রমশই তাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিচ্ছে। কালিকটের রাজা জামরিনও বোধ হয় অনুভব করলেন, তাঁর মতো সমস্ত ভারতীয় শাসকদেরই হীরক সজ্জিত বিলাসিতা ও সমৃদ্ধি অস্তিমলগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছে।

নিত্য নতুন সামুদ্রিক পথ-পরিক্রমায় স্পেন পর্তুগালের উপযুক্ত শরিক। স্পেনিশ নাবিকরা চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দূরন্ত আটলান্টিক মহাসমুদ্রকে পরখ করে। তাঁদের বিশ্বাস, এই আটলান্টিক মহাসমুদ্র অতিক্রম করে চীন দেশে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব।

জেনোয়া নিবাসী নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাসের চোখে তাই ঘুম নেই। মার্কো পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ে এই সমুদ্র অতিক্রম করে নতুন মহাদেশ আবিষ্কারে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। স্পেনের রাণী ইসাবেলা সাহায্য করলেন কলম্বাসকে। তিনখানা জাহাজ নিয়ে কলম্বাস এগিয়ে চললেন পশ্চিমদিকে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এগিয়ে চলেছেন তিনি,—কিন্তু কোথায় স্থলভূমি? শুধুই জল আর জল, নোনা জলের চাকচিক্য; এক ঘেয়ে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সমুদ্র যাত্রা। তিক্ত নাবিকেরা সময় সময় কলম্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

তবু অবিচল কলম্বাস। সফল তিনি হবেনই। অবশেষে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস বর্তমান বাহামা দ্বীপপুঞ্জে এসে অবতরণ করলেন। কলম্বাসের ধারণা হলো, তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে এসে পৌঁছে গেছেন। তিনি তাই এই দ্বীপগুলির নাম দিলেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা West Indies কলম্বাস আরো তিনবার সামুদ্রিক অভিযান পরিচালনা করে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে স্পেনের পতাকা উড়িয়ে দিয়ে আসেন। ওখানকার লাল অধিবাসীদের দেখে তিনি তাঁদের নাম দিলেন, লাল ভারতীয় বা Red Indians.

মৃত্যু পর্য্যন্ত কলম্বাস বুঝতে পারেননি, তিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেন নি; আবিষ্কার করছেন আর একটি নতুন মহাদেশ। কয়েক বৎসর যাবৎ ইউরোপীয় বণিক মহলে এই ধাঁধা রয়ে গেলো। অবশেষে আমেরিগো ভেসপুচ্চি [ Amerigo vespucci ] নামে জনৈক ইটালীয় নাবিক ব্রাজিল হতে ফিরে এসে সর্বপ্রথম ঘোষণা

করলেন, কলম্বাস আবিষ্কৃত বিশাল ভূখণ্ড ভারতবর্ষ নয়; এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন মহাদেশ, আমেরিগোর নামানুসারেই এর নামানুকরণ হলো আমেরিকা।

এই তো হলো ভৌগলিক আবিষ্কারের ইতিকথা। নতুন যুগের নতুন উৎসাহ ইউরোপীয় সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেলো নিত্য নতুন সাফল্যের পর্যায়ে। কিন্তু সাথে সাথে শুরু হলো প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, সন্দেহ ও ভয়। ইউরোপের রাজনীতি-দর্শনে এটাই হলো চূড়ান্ত পরিণতি। প্রথম পর্যায়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হলো স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে। নবআবিষ্কৃত দেশ সমূহের অধিকার নিয়ে এই বিবাদ। তখন পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই বিবাদের একটা মীমাংসা করে দেন। পশ্চিম আফ্রিকার কেপ ভার্ডের কয়েক শত মাইল পশ্চিমে আটলান্টিক সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে একটি কাল্পনিক রেখা টানলেন পোপ। বললেন, এই রেখার পশ্চিম দিকের অংশ সমস্তটাই স্পেনের এবং পূর্বদিকের দেশগুলির অধিকার পাবে পর্তুগাল।

কিন্তু এই মীমাংসা একান্তই অস্থায়ী। ক্রমে ক্রমে ভৌগলিক বিস্তারে আগুয়ান হলো আরো বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তিগুলি,—ইংরাজ, ফরাসী, ডাচ, ওলান্দাজ ইত্যাদি। শুরু হলো বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ, লুণ্ঠন, হত্যা, প্রতারণা ইত্যাদি। পূর্ব ও পশ্চিমের শান্তিপ্রিয় মানুষদের নিয়ে নিজেদের মধ্যে হানা হানি শুরু করলো ইউরোপীয় বণিকরা। তাই ইটালীর সাংস্কৃতিক বিপ্লব বৃহৎ অর্থে শুভ, কিন্তু কিছুটা সংকীর্ণ অর্থে অশুভও বটে।

## ॥ তিন ॥

বন্দরের নামে মেয়ে। তুঁলোকে এই নিয়ে কয়েকদিন ঠাট্টাও করেছি।

তুঁলোও সপ্রতিভ জবাব দিয়েছে, '…ঠাট্টা করবেন না, জানেন তো, ঐ বন্দরে মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট একদিন ইংরাজ নৌবহরকে বিধ্বস্ত করেছিলেন!'

ইতিহাস টেনে এমন সুন্দর জবাব আর কি হতে পারে? সত্যই ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ সেনাপতি বোনাপার্ট ঐ তুঁলো বন্দরেই বিশ্বখ্যাত ইংরাজ নৌবহরকে চূর্ণ করেছিলেন। তাঁর সেই আশ্চর্য সাফল্যে রক্ষা পেলো ফ্রান্স তথা ফরাসী বিপ্লব!

ফরাসীরা ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন বোনাপার্ট—দু'জনকে নিয়েই খুব গর্ব অনুভব করে। নবীনের অনিবার্যতা ঘোষণা করতে এই জাতি বিশ্বসভায় চিরদিন সমাদর পেয়ে আসবে। বিপ্লবের মূল কথাই হলো, নবীনের অনিবার্যতা। পুরাতন যন্ত্র যদি অচল হয় তা শুধু দেহগত অর্থেই অকেজো হবে না, প্রধানত 'নৈতিক' অর্থেই তা অকেজো হয়ে যাবে। সেই সময় প্রয়োজন উন্নত ধরণের ও অধিক উৎপাদনক্ষম যন্ত্রের। ইতিহাসের সৃষ্টিমূলক প্রগতির জন্যই যখন এমন পূর্বতন অচল ব্যবস্থাকে বাতিল করা হয়, তখনই চারদিক থেকে স্থায়ী স্বার্থপরদের [ Vested interest ] 'গেল-গেল' রব সোচ্চার হয়ে ওঠে। যেমন, মার্কসবাদের শত্রুরা কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে প্রায়ই বলে থাকে, তারা শুধু ধ্বংসই করে, সৃষ্টি করে না!

কথটা সম্পূর্ণ ভুল। মার্কসবাদী বিপ্লব সর্বজন ঘৃণিত শোষণ ব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, আবার অন্যদিকে গড়ে তুলেছে এক নতুন সামাজিক ব্যবস্থা—সাম্যবাদ।

বিপ্লবীরা সর্বদা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিনাশ করে। এ যাবৎ যা কিছু সামগ্রিক অর্থে অকল্যাণকর, অচল, বিপ্লবীরা তারই ধ্বংস করেছে। আবার যা কিছু মূল্যবান, তারা তাই রক্ষা করেছে।

ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, চৈনিক বিপ্লব—সমস্ত কিছুরই আসল চরিত্র এটাই !···

আজকের যুগে শ্রেণী সংগ্রামের মুখে বুর্জোয়ারা স্বভাবতই ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। এই বুর্জোয়াদের অবদান নিয়ে তুঁলোর সাথে প্রায়ই তার অধ্যাপক পিতার তর্ক বেঁধে যায়। সেদিন এমন এক তর্ক বেঁধেছিল গাড়ীর মধ্যে। গাড়ীটা দাঁড়িয়ে ছিল সামুদ্রিক বেলাভূমির ধার ঘেঁষে। আমি সঙ্গী হয়েছিলাম ওদের। আকাশের ভাব দেখলে মনে হয়, ঝড় উঠবে। তাড়াতাড়ি সালফার বোঝাই হচ্ছিলো একটি ছোট জাহাজে। আজ মাত্র ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়েছে। সমগ্র ফ্রান্স জুড়ে ছাত্র—শ্রমিক বিক্ষোভের জবাব দিয়েছেন বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্ট দ্যগল। বিপুল ভোটে কপালে তাঁর জয়টিকা জ্বল জ্বল করছে। এই গণ-রায় কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না তুঁলো। সে বার বার একটি কথাই বলছিল, ফরাসীদের মধ্যে বুর্জোয়াদের প্রভাব এখনো বদ্ধমূল।

আঁতোয়ান রেঁাকাতা কিন্তু হাসছিলেন! বুর্জোয়াদের স্বপক্ষে আজ তিনি লড়ছেন এখানে। তাঁর যুক্তি, মহান ফরাসী বিপ্লব তো বুর্জোয়াদেরই অবদান। গণতন্ত্রের অধিষ্ঠান তো তাঁদের হাতেই হয়েছে। "আধুনিক রাষ্ট্রের শাসন মণ্ডলী হল সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনার একটা কমিটি মাত্র।"

ইতিহাসের দিক থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি শোভন সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। যে সব বিচিত্র সামন্ততান্ত্রিক বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল তার 'স্বভাবসিদ্ধ উর্ধ্বতন'দের কাছে, তা এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মম ভাবে।···এক কথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভ্রমে যে শোষণ এতদিন ঢাকা ছিল, তার বদলে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ পাশবিক শোষণ।"

ফরাসী বিপ্লবের সবটুকু কৃতিত্ব বুর্জোয়াদের উপরে চাপিয়ে দিয়ে পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন আঁতোয়ান রেঁাকাতা। কিন্তু আমি তাঁর এই যুক্তির সাথে এক মত হতে পারছিলাম না। ফরাসী বিপ্লবও সর্বহারাদের বিপ্লব, প্রলেতোরিয়েতদের বিপ্লব। তবে যুগের পটভূমি অনুযায়ী সেই বিপ্লবের অভিপ্রকাশ ছিল অনেকটা ভিন্নমুখী। ফরাসী বিপ্লব ইতিহাসের একটা ধাপ পর্যন্ত মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ; তারপর সেখান থেকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পালন করেছে রুশ বিপ্লব এবং চীন বিপ্লব। যার যেটুকু করণীয়, সে ততোটুকু করবেই ! ফরাসী বিপ্লব রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে খতম করে গণতান্ত্রিক ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হাতিয়ার বানিয়ে বুর্জোয়ারা ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করলো 'নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ ও পাশবিক' শোষণতন্ত্র। তারপর এই শোষণতন্ত্রকে ভাঙ্গবার কাজ শুরু করেছে রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব এবং আগামী বিশ্বে ঐক্যবদ্ধ সর্বহারাদের বিরাট বিপ্লব। বুর্জোয়ারা এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। তাই তাদেরও প্রস্তুতির অভাব নেই—সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বুর্জোয়ারা জোট বাঁধছে, বিপ্লবকে রুখতে তাদের এই প্রান্তিক প্রস্তুতি ভয়াবহ ধংসাত্মক সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষ, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, ইতালী, ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং নাটের গুরু আমেরিকাতে বুর্জোয়াদের এই প্রস্তুতি চলছে। প্রতিক্রীয়াশীল দলগুলি এখানে সেখানে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, কখনো ধর্মের দোহাই দিয়ে কখনো বা ব্যক্তি স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে। যেখানে তাদের এ সব কলাকৌশলও ব্যর্থ সেখানে তাদের নগ্ন আত্মপ্রকাশ ঘটেছে নির্লজ্জ আক্রমণে। ক্ষুদ্র ভিয়েতনামের উপর পেন্টাগণদের অমানুষিক হামলাবাজি, এ্যাঙ্গোলায় পর্তুগীজদের বন্য দাপাদাপি, সি-আই-এর কার্যকলাপ, রোডেশিয়াকে ও দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে পরোক্ষ ভাবে মদত দান,—বুর্জোয়াদের আত্মরক্ষার এসব অন্তিম প্রয়াস। কিন্তু প্রয়াস ওদের দিনের পর দিন অশক্ত ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। কাঁপুনি লেগেছে ডলার, মার্ক

ও পাউণ্ডের! এত বড় কাঁপুনির পর আর অনুমানে ভুল হয় না,—বুর্জোয়াদের যুদ্ধ শিবিরে ক্রমশই রসদের অভাব ঘটছে। এবার একেবারে অন্তিম লগ্নে তরা আরো মরিয়া হয়ে উঠবে।...

হ্যাঁ, তুঁলোর সাথে আমিও একমত।

ফরাসী বিপ্লব কখনো শুধুমাত্র বুর্জোয়াদের কৃতিত্ব নয়।

এই বিপ্লব বিশ্বইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, যাজক শ্রেণীর অনাচার, এবং সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে এই প্রথম গণ-বিপ্লব। এর পরিণতি কেবলমাত্র ফ্রান্সেই নয়, ইউ-রোপের অন্যান্য দেশেও পুরাতন যুগের অবসান ঘটায়। এর পিছনে যেমন বহুবিধ কারণ সক্রিয় ছিল তেমনি দেশের সমস্ত শ্রেণীর লোকের এতে সমর্থন ছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও আদর্শগত কারণ সমূহের জন্য ফরাসী বিপ্লবের সুত্রপাত হয়েছিল।

ফরাসী বিপ্লব ঘটেছিল দুর্বলচিত্ত সম্রাট ষোড়শলুইয়ের রাজত্ব-কালে। রাজাকে চরম দণ্ড মাথা পেতে নিতে হয়েছিল। 'কিন্তু সে যুগের বিচারে যাঁকে চরম দণ্ড মাথা পেতে নিতে হয়েছিল, এ যুগের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে বিচার করলে তাঁরই প্রতি করুণা ও সহানু-ভূতির স্রোত বইতে থাকে। একজন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন, অথচ দুর্বল চিত্তের মানুষ যুগের দাবী মেটাতে অসমর্থ হতে পারে, কিন্তু তাঁকে চিরতরে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে ফেলা,—এ কথা ভাবতে ভাবতে টমাস পেনের মতো বিপ্লবী লেখকও ব্যথিত না হয়ে পারেন নি! কিন্তু ইতিহাসের গতিকে তো অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাস আঁকে জীবনকে। আবার জীবনই গতি। কাজেই ইতিহাসের আঁচড় তীব্র গতিশীল এবং নতুনত্বে ভরপুর। অতীতকে সেলাম জানিয়ে সে বর্তমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাইয়ে একেবারে ঠেলে পাঠায় ভবিষ্যতের দিকে। কাজেই যা বাস্তব, বা ঘটেছে—তাকে তো আর নিছক মনের আবেগ দিয়ে

অস্বীকার করা যায় না। তাই একাধারে দেখা যায়, ষোড়শ লুই মরলেন নিজের কর্মহীনতার জন্য, অন্যধারে সুলতানা রাজিয়া তাঁর অকাল মৃত্যু বরণ করলেন নিজের অতি কর্মতৎপরতার জন্যই। আসল কথা যুগের দাবী। যিনি চলমান যুগের চাহিদাকে সম্মান জানাতে শেখেন নি, শত অপরাধশূন্য ব্যক্তি হলেও অপমৃত্যু তাঁর অনিবার্য। অপরপক্ষে, যিনি স্বকীয় বিরল দক্ষতায় চলতি যুগকে পেরিয়ে আগামী যুগকে আঁকড়ে ধরতে পেরেছেন, তাঁর উপর দিয়েও ঝড়ের তাণ্ডব নর্তন কোন অংশে কম ঘটেনি। ষোড়শ লুই অষ্টাদশ শতকের চাহিদাকে চিনতে পারেন নি, তাই তাঁর সরলতাকে ইতিহাস ক্ষমা করেনি। রাজিয়া বেগম দাস যুগ পেরিয়ে সরাসরি নুরজাহান যুগে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন, তাই আজও তাঁর জন্য ইতিহাস গুমরে গুমরে কেঁদে চলেছে।

রুশ বিপ্লবের কথা বাদ দিলে ফরাসী বিপ্লব নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক। কোন বিপ্লবই একেবারে একটি বা দু'টি সমসাময়িক ঘটনার ভিতর দিয়ে নিজের স্বরূপ গ্রহণ করতে পারে না। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ অর্থ-নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় বিষাক্ত বাষ্প ক্রমশ মেঘের ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে জমা হতে থাকে। শেষে একদিন কালবৈশাখীর ঝড় শুরু হয়। দক্ষ-যজ্ঞে পশুপতির তাণ্ডব নর্তন। ইতিহাসের পাতা রক্ত রাঙা হয়ে উঠে। 'বিপ্লব রাক্ষুসী নিজের সন্তানদেরই ভক্ষণ করতে থাকে।'

কিন্তু শেষে এক সময় ঝড় থেমে যায় নূতন সৃষ্টির গানে মুখর হয়ে ওঠে প্রকৃতি। আদর্শ তার পথ খুঁজে পায়।...ফরাসী বিপ্লব এর ব্যতিক্রম নয়। শুধু অর্থনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় অনাচার, অসাম্য নয়, সেই সঙ্গে 'শত শত বৎসরের রক্ত লোভী অক্টোপাশের বাঁধন' Burbon Monarchy ও এই বিপ্লবের জন্য কোন অংশে কম দায়ী নয়। সম্রাট চতুর্দশ লুইকে আপাতত

একজন সফল যোদ্ধা বলেই মনে হবে। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর রণ-নৈপুণ্য, তাঁর দূর-দৃষ্টি (?' ইতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। সেইসঙ্গে—ইতিহাস এও স্মরণীয় করিয়ে দেয়,—চতুর্দশ লুই যুগের গতি নিরূপণ করতে পারেন নি। যে শাসক অন্তর্মহলকে অন্ধকার রেখে বহির্মহলকে আলোকিত করেন, তাঁর নীতি আর যাই হোক, ভাবীকালের জন্য শুভ-প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে পরে না। চতুর্দশ লুইয়ের দৃষ্টি ছিল বহির্মুখী। তাঁর কর্মতৎপরতা ছিল বহির্জগতকে নিয়ে। ইউরোপের প্রধানদের সম্মুখে নিজের গুরুত্ব ও ভূমিকা প্রচার করাই ছিল যেন তাঁর উদ্দেশ্য! যুদ্ধের পর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে তাই তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। কিন্তু যুদ্ধ কোন্ জাতিকে কি দিতে পেরেছে আজ পর্যন্ত? শত বৎসরের যুদ্ধের [ Hundred years' war ] জয়লাভে ইংল্যাণ্ড কি পেয়েছিল? কিছু বহির্মুখী সম্মান, আর অন্তর্মুখী ভয়ানক 'কালো মৃত্যু'র [ Black Death ] কালো ছায়া। রোম আর কার্থেজের দীর্ঘ স্থায়ী সংগ্রামের পুরস্কার হলো অপূর্ব 'ফিনিশিয়ান সভ্যতা'র বিলোপ এবং হ্যানিবলের মতো সেনাপতির আত্মহত্যা! দ্বিতীয় বিশ্বসমরে জয় সত্ত্বেও ইংরাজ ও ফরাসীদের সম্মান আজ কোথায়?

তাই এক্ষেত্রেও আপাত দৃষ্টিতে চতুর্দশ লুই এর যা নিয়ে গর্ব আর সাফল্য, প্রকৃতপক্ষে সেটাই অষ্টাদশ শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অভিশাপ মাত্র। যুদ্ধের পর যুদ্ধ পরিচালনা করতে হ'লে অর্থের প্রয়োজন। অর্থ দেবে কে? দেবে ঐ অজ্ঞ, দরিদ্র, তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা! ফলে, চতুর্দশ লুই যুগকে চিনতে পারলেন না। তিনি টেরও পাননি,—কখন যেন Old Regime এর নিকষ অন্ধকারে ঢাকা মূর্তিখানি ধীরে ধীরে পরিষ্কার হ'য়ে এসেছে, ঐ তৃতীয় শ্রেণীরই কখন যেন তৃতীয় নয়নের উদয় ঘটেছে।

সেই ভুল আরো ভয়ানক হ'য়ে উঠলো পঞ্চদশ লুই এর হাতে পড়ে। চতুর্দশ লুইয়ের তবু ব্যক্তিত্ব ছিল। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও আদেশের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা Noble ও Clergy

men দের ছিল না। কিন্তু পঞ্চদশ লুইয়ের অন্তঃসার শূন্য শাসন ও চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই দুই সম্প্রদায় বাঁধনহারা স্রোতের মতো অনাচার, কদাচার, অত্যাচার ও ব্যাভিচার নিয়ে এসে প্রবেশ করলো 'ভার্সাই প্রাসাদ'-এর আনাচে কানাচেতে পর্যন্ত! সাধারণ লোকের অবস্থা আরো শোচনীয় হ'য়ে উঠলো। আরো কর বসলো। আরো অত্যাচার ও অসাম্যের লীলা অনুষ্ঠিত হ'তে থাকলো। সাথে সাথে চরম পরিণতির সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্য এগিয়ে চললো ইতিহাস। যুগের দাবী প্রতিফলিত হলো মণ্টেস্কু [ Montes quien ] ভল্‌তেয়ার [ Voltaire, ] এবং রুশোর [ Russeau, ] যুক্তিপূর্ণ অগ্নিময় ভাষার ঝিলিকে।

কিন্তু পঞ্চদশ লুইয়ের ভাগ্য বড় সুপ্রসন্ন! তাই তিনি অনিবার্য বিপ্লবের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন। ফরাসী বিপ্লবের সূচনা স্টেটস জেনারেল [ States General ] বসবার ঠিক পনেরো বৎসর একমাস আগে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।...ফ্রান্সের ইন্দ্রপুরী ভার্সাই প্যালেসে শোকের ছায়া নেমে এলো। ফরাসী রাজার মৃত্যুতে এই শেষ শোক যাত্রা বের হলো নগর পরিক্রমায়। শত শত জনতা, সৈনিক, প্রহরী প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে শুনলো, তাদের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তার অকাল-বিদায়ের কথা। কিন্তু কারুর চোখেই জল নেই। নেই কোন বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস। তারা তাদের রাজার অকাল-প্রয়াণে বেদনাহত হয়নি। বরং, এক বিলাসী, অত্যাচারী শাসকের মৃত্যুতে নীরবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মাত্র।

আর সদাতৎপর, তোষামোদকারী মন্ত্রী ও চাটুকর সভাসদরা সাদরে সিংহাসনে বসতে আহ্বান জানালেন নতুন তরুণ শাসক ষোড়শ লুইকে।

ষোড়শ লুইয়ের মুখে বোকা বোকা হাসি; চোখের দৃষ্টিও তেমন উজ্জ্বল নয়,—আবির্ভাবেই যেন একটি ব্যক্তিত্বশূন্য পুরুষ।

ষোড়শ লুইয়ের জমকালো অভিষেক হচ্ছে।

কিন্তু সেই উৎসব-প্রাঙ্গণেই চাপ চাপ সন্দেহ দানা বাঁধছে। বাইরের চাপা অসন্তোষ, বুভুক্ষু আত্মাদের দাবী এখানেও ছায়ার মতো সিংহাসনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের সম্মিলিত ফুংকারে ষোড়শ লুই সমেত বাস্তিল কারাগার ও ভার্সাইপ্যালেস যে কোন মুহূর্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যেতে পারে!

এমন একটা ভয়াবহ সম্ভাবনা নিয়ে ষোড়শ লুই সিংহাসনে বসছেন। আগামী ফরাসী বিপ্লবের নেতারা বয়সে তখন অনেকেই তরুণ এবং কিশোর। কনডোরসেটের বয়স বত্রিশ, মীরাবো ছাব্বিশ বছরের যুবক, এবং আর সকলের বয়স পনেরো থেকে কুড়ির মধ্যে,—ব্রীসট্, মাদাম রোঁলা, লাফায়েৎ, রোবস্পীয়র, ভার্জনায়েদ, কেমিলে ডেজমলনিস্, বার্ণেভ ইত্যাদি। সেই অভিষেকের জাক জমক দেখবার জন্য ষোল বছরের একটি ছেলে সত্তর মাইল দূর থেকে ছুটে এসেছিল। ছেলেটির নাম জ্যাকুইস ডাণ্টন,—ভার্সাইয়ের জাক জমক তাঁর সবুজ দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। আঠারো বছর বাদে এই ডাণ্টনই অভিষিক্ত বিলাসপুরীর রাজাকে খতম করেছিল। ইতিহাসের নিখুঁত বিধান!

সিংহাসনে বসে ষোড়শ লুই দেখলেন, তাঁর পূর্বপুরুষদের কৃত 'ancient regime' সমগ্র রাজ্য জুড়ে যেন প্রেত-নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। অথচ, ফরাসী সভ্যতার মূল ধারাটি এখনো বর্তমান। ফরাসী জনগণ ভাবতে পারে এবং তাঁদের এই চিন্তা শক্তির জন্যই ফ্রান্সে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব দেখা দিয়েছিল। ফরাসীদের মতো সচেতন জাতির ভিতরেই একযুগে রুশো, ভলতেয়ার মণ্টেস্কু, কুয়েসন, ডেনিস ডিডেরো প্রভৃতি চিন্তা নায়কদের আবির্ভাব সম্ভবপর।

'......the high standard of French civilisation was no less a factor in the Revolution......Only a nation sensitive to ideas and culture could have produced

Montesquieu, Voltaire, Rousseau and the Encyclo paediests, or having produced them, listened to them ......'৩

পুরো সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডলে ফ্রান্স তখনো লালিত-পালিত পরিবর্ধিত। এই সামন্ততন্ত্রের চরিত্র সম্পর্কে একটি চমৎকার প্রবাদ ফ্রান্সে চালু আছে, "The nobles fight, the clergy pray and the people pay. "সামন্তরা যুদ্ধ করেন, পুরোহিতরা প্রার্থনা করেন এবং জনগণ খাজনা প্রদান করে।'

কথাটা মধ্যযুগের প্রাথমিক স্তরে আক্ষরিক সত্য ছিল। কিন্তু বিপ্লবের আগের অবক্ষয়ের যুগে শুধু একটি মাত্র কথাই সত্য ছিল, 'জনগণ খাজনা প্রদান করে!' সামন্তদের আর যুদ্ধ করবার প্রয়োজন ছিলনা; পুরোহিতেরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার চাইতে ঈশ্বরের নামে লোক ঠকিয়ে বিলাসে ব্যাভিচারে উদ্দাম হয়ে উঠলো। সমাজের এই দুই উপর স্তরের লোকেদের জন্য সুখ সুবিধার অন্ত ছিল না। চাইলে বুঝি তারা আকাশের চাঁদকেও ধরে নিয়ে আসতে পারতো। তাদের উপর রাজারও কর্তৃত্ব খাটতো না। তাদের ও রাজার বিলাসিতার খরচ যোগাতে গিয়ে সাধারণ লোকেরা [ Third Estate ] প্রাণান্ত হতো।

ধনী জমিদার সম্প্রদায় এবং সমৃদ্ধ চার্চ গুলির অধিকারী পুরোহিত বর্গ নানা ভাবে রাষ্ট্রীয় কর-প্রদানের দায়িত্ব এড়িয়ে যেত। শুধু তাই নয়, তারাই নিজ নিজ এলাকায় ধর্মভীরু প্রজাদের উপর নিত্য নতুন করভার চাপিয়ে দিত। রাজশক্তি দুর্বল,— বিলাসিতার রৌপ্য গলা স্রোতে ফ্রান্স দিনের পর দিন নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। অসাম্যের রাজত্বে সাধারণের আর্তনাদে কে কানপাতবে?

চারটি স্তরে তখন ফরাসী জনগণকে বিভক্ত করা যেতে পারে:—

(১) ধনী জমিদার সম্প্রদায় [ Nobles ] (২) পুরহিত বর্গ,

A History of Mode_n Times : C. D. M. Ketelbey.

[ clergy ]—এদের মধ্যেও আবার ধনী দরিদ্রের দুটো স্তর বর্তমান ছিল। (৩) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় [ Bourgeoisie ]. (৪) সাধারণ লোক [ Commons ].

সাধারণ লোকের সংখ্যা ছিল ফ্রান্সের মোট জনগণের নব্বুই ভাগেরও অধিক। তাদের মধ্যে ছিল ভূমিদাস, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি। প্রাণ রাখতেই তাদের প্রাণান্ত! তিন প্রকারের কর দিতে দিতে তারা ক্রমশই রক্তশূন্য হয়ে আসছিল,—তাদের কর দিতে হত চার্চকে, রাজাকে এবং স্থানীয় জমিদারকে। এই করের বোঝা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে! অথচ, দেশের, জাতির উন্নতি বলতে কিছুই হচ্ছিলো না।

ধনী ও সাধারণ সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থান করছিল মধ্যবিত্তরা। শিক্ষক, সাহিত্যিক, আইনজীবি, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, - এরা প্রত্যেকে এই সম্প্রদায় ভুক্ত। তাদের শিক্ষা দীক্ষা, কৃষ্টি, চিন্তাধারা আর সমস্ত সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। বুর্জোয়ারা যা ভাবতে পারতো রাজা বা ধনী সামন্তবর্গ তা পারতেন না। অথচ, কোন রকম রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা তারা পেত না। তাই বুর্জোয়ারাই সর্বপ্রথম বিপ্লবের চিন্তা প্রচার করতে থাকে! রুশো, ভলতেয়ার, মণ্টেস্কু,—এই স্তর থেকেই উঠে এসেছিলেন।

ফরাসী সম্রাট যেন এক ধরণের জড়ত্বে ভুগছেন। কোন মহৎ সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারেন না। বিলাসী সভাসদগণের মুখের দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকেন। ভার্সাই প্রাসাদে সুরা-নারী আর মণি-মুক্তায় ছড়াছড়ি! স্টেটস্ জেনারেল এক শতাব্দীর উপর ডাকা হচ্ছে না। সাধারণের সাথে রাজার যে চুক্তি হয়েছিল,—সেই চুক্তি তাই তখন বাতিল হয়ে গেছে।

ফ্রান্সের এই দুর্বিসহ রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হয়ে উঠলেন

ফরাসী লেখক ও দার্শনিকরা। সাহিত্যের নানা মারপ্যাঁচে তাঁরা জনসাধারণকে সচেতন করে তোলবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁদের রচনায় কখনো বিদ্রুপ, কখনো সরাসরি নির্দেশ আবার কখনো সাবধান-বাণী উচ্চারিত হতে থাকে। বাস্তিল কারাগারে নিক্ষিপ্ত না হয়েও জনগণকে সচেতন করবার বিবিধ সাহিত্যিক কলা কৌশল দেখালেন তাঁরা।— "…The art of saying without being sent to the Bastille…"

সমস্ত ধরণের লেখক ফরাসী বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই শতাব্দীর গোড়াতেই জন্মেছিলেন মণ্টেস্কু। ধনী অভিজাত বংশের সন্তান,—সমস্ত জীবনে অনটন বা দুঃখের করাল ছায়া দেখেন নি। বিপ্লবী হবার বাসনা তাই তাঁর ছিল না। ক্যাথলিক ও রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। কিন্তু একটি প্রশ্নে তিনি ফরাসী প্রভুদের মর্মস্থানে আঘাত হানলেন, —তা হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আইনের দৃষ্টিতে সাম্য। মণ্টেস্কু বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত টেনে বললেন, সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ স্বরূপ পার্লামেণ্ট সভা রয়েছে। অথচ, ফ্রান্সে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান কেন থাকবে না?

মণ্টেস্কুর "The spirit of Laws", "Persian letters. ইত্যাদি জনগণের চিন্তাজগতে তরঙ্গ তুললো। ঐতিহাসিক বিবর্তন বাদকে মণ্টেস্কু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন, যুগ পাণ্টাচ্ছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগ হবে এটা! মানুষের স্বাধীনতাকে এমন হত্যা করা চলবে না!

মণ্টেস্কুর পরে এলেন ভলতেয়ার।

ভলতেয়ারকে বলা হতো "জ্ঞানের অধীশ্বর" [ Intellectual God ]। ইউরোপের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী মানুষ হিসাবে তিনি সর্বত্র

অসাধারণ সম্মান ও সমাদর পেতেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য খুব খারাপ, —মেজাজও সময় সময় তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। আর তাঁর কলম তো কলম নয়, যেন বিষমাখানো তীর,—একেবারে মর্মে গিয়ে আঘাত হানবে। প্যারিসের তথাকথিত অভিজাত বিদগ্ধ মহল প্রথমে সাদরে গ্রহণ করেছিল ভলতেয়ারকে। কিন্তু শীঘ্রই ভলতে-য়ারের একটি স্পষ্ট বিদ্রুপাত্মক রচনা পড়ে তারা ক্ষেপে লাল,— ভলতেয়ারকে সাথে সাথে বয়কট করা হলো! প্রুশিয়ার ফ্রেডারিক দ্যা গ্রেট পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন ভলতেয়ারের যুক্তিময় রচনাতে। তাঁর সভাতে তিনি স্থান দিলেন ভলতেয়ারকে; হয়তো মনে আশা ছিল, চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ভলতেয়ার তাঁর অন্নদাতার প্রশস্তি রচনা করবেন। কিন্তু ভলতেয়ারের রচনা ফ্রেডারিকের প্রত্যাশা পূরণ করলো না; বরং দু'জনের মধ্যে বিবাদ ঘনিয়ে আসে। ফ্রেডারিক তাঁকে ফ্রাঙ্কফ্রাটের কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ভলতেয়ার ইউরোপের স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত থেকেছেন, কিন্তু শান্তি পাননি কোথাও,—তাঁর রচনার তীক্ষ্ণতা সহ্য করা সুবিধাবাদী মানুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল। অবশেষে দীর্ঘ বিশ বৎসর বাদে পক্ক কেশ ন্যুব্জ দেহ বৃদ্ধ ভলতেয়ার আবার ফ্রান্সের বুকে ফিরে আসেন। তখনো ফরাসী বিপ্লব শুরু হয়নি। কিন্তু তার প্রস্তুতি চলছে। সেই বারুদের ঘ্রাণ নিতে নিতে জ্ঞানের দেবতা চোখ বুজলেন।

ভলতেয়ার অক্লান্ত লেখক। তাঁর প্রতিভা বহুমুখী,—তিনি কবি, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, নাট্যকার, বিদ্রুপাত্মক রচনায় দক্ষ লেখক। ফরাসী চার্চের প্রতি তাঁর ঘৃণার অন্ত নেই। তিনি নিজে একসময় এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই এর ভণ্ডামি অনুভব করতে পেরে ছুটে বেরিয়ে আসেন। শুরু হয় ক্যাথলিক গুরুদের প্রতি তার তীব্র আক্রমণ। সাধারণ মানুষ এই আক্রমণের দ্যুতিতে চার্চের অন্যায় ও অবিচার বুঝতে পারে।

কিন্তু ভলতেয়ারও গণতন্ত্র সমর্থক ছিল না। তাঁর মতে রাজতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রকৃত জনকল্যাণকর কাজকর্ম করা সম্ভবপর। গণ-শাসনে দেখা দেবে নিছক অরাজকতা, হিংসা ও দ্বেষ!

আর ভলতেয়ারের এই রাজআনুগত্যকে চূর্ণ করে দিলেন পরবর্তী কালের বিশ্বের অন্যতম বিপ্লবী সাহিত্যিক জ্যাকুইস রুশো। প্রথম জীবনে রুশো অবশ্য ভলতেয়ারের রচনার খুব অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ তাঁর রচনার অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা রুশোর কাছে ধরা পড়ে। ফলে দুই দার্শনিকের মধ্যে একটি বিচ্ছেদের সেতু ক্রমশই প্রসারিত হয়ে আসে। রুশো সেখানেই শুরু করেছেন, যেখানে ভলতেয়ার প্রবেশের পথ পান নি। ভলতেয়ার আবেগের স্রোতকে অবাধে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, আর রুশো আবেগের চাইতে যুক্তিকেই বেশী করে প্রতিষ্ঠিত করলেন। রুশোর রচনায় প্রতিষ্ঠিত হলো যুক্তির যুগ।

গ্রীষ্মের উষ্ণ দিনে অথবা শীতের তুষারপাতে রুশো লাইম গাছের নীচে শুয়ে প্রকৃতির শোভা দেখতেন। অনুভব করতেন, সৃষ্টির আদিতে মানুষ ও প্রকৃতি-জগতের মধ্যে সম্পর্ক কি ছিল। বড় বড় ধূসর চোখ দুটো এ সময় সামান্য কোঁচকানো, পুরু ঠোঁটে চাপা হাসি! রুশো বোধ হয় পথ খুঁজে পেলেন।...

বিচিত্র জীবন! সেই জীবনে দুঃখ ও বেদনার ঝড় উঠেছে, অবজ্ঞার ও বৈচিত্র্যের সহ-অবস্থান ঘটেছে। নিজের "স্বীকারোক্তি" তে (confessions) রুশো সব লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বোহেমিয়ান জীবন। পদে পদে ছন্দ পতন, গুমোট কান্নার ঢেউ, তবু অনবরত এগিয়ে যাবার প্রয়াস। এক অখ্যাত জেনেভিয়ান ঘড়ি-নির্মাতার পুত্র, ভ্রাম্যমান জীবনের উপলব্ধ সত্য থেকে তাঁর শিক্ষা। শুধু মাত্র বইয়ের জগতে ডুব দিয়ে তৃপ্তি পান না, মানুষের মন ও দেহকেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, এক

বন্ধুকে ত্যাগ করে অপর বন্ধুর দিকে সাগ্রহে হাত বাড়িয়েছেন। কখনো দেখা গেছে, তিনি জুতো নির্মান করছেন, কখনো করছেন শিক্ষকতা, আবার কখনো কোন বিখ্যাত লোকের প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়েছেন। গান শিখেছেন কত, সুরও দিয়েছেন অনেক, রাত জেগে পাতার পর পাতা লিখেছেন নতুন বিশ্বকোষের ( Encyclopaedia ) জন্য। কখনো আবার জুয়ার আড্ডায় বসে ফতুর হয়ে এসেছেন। সারাদিন হয়তো একটি দানাও পড়েনি পেটে,—তবু নির্বিকার রুশো।

এমন ছন্দ হারা, ছন্নছাড়া জীবনে এক ডজন সাহিত্য-গ্রন্থ রচনা ক'রে রুশো পৃথিবীতে অমর হয়ে রইলেন। এদের মধ্যে Nouvelle Heloise সে যুগের সর্বাধিক বিক্রীত উপন্যাস। Emile শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটি যুগান্তকারী প্রবন্ধ ; এবং Contract Social বা 'সামাজিক চুক্তি' একটি দুর্দ্ধর্ষ রচনা, যা ফরাসী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল!

তাঁর জীবন-বোধ ছিল গভীর। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ব্যর্থ। তাঁর সন্তানরা অনাহারে, অনাদরে, অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগে দাতব্য চিকিৎসালয়ে একের পর এক মারা গেছে। শেষ জীবনে রুশো কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ হয়ে দাঁড়ান। সর্বদা ভয়, তাঁকে বুঝি ধরে নিয়ে বাস্তিলে নিক্ষেপ করা হবে অথবা হত্যা করা হবে! তাঁর কথায় আর কাজে সততা ছিল না, ছিল না বিশ্বাস এবং মানুষের উপর আস্থা। তাঁর এই মানসিক ও নৈতিক বিপর্যয় দেখে দ্য এলেমবার্ট ( D' Alembert ) লিখলেন, 'Jean-Jacques is a wild animal, and should be regarded only through the bars of cage.…'

২

রুশোর রচনার রাজনৈতিক মূল্য অসাধারণ। বিশেষত তাঁর 'সামজিক চুক্তি' সুদূর প্রসারী হয়েছিল। রাষ্ট্র উৎপত্তির মূলে সামাজিক চুক্তি সম্পর্কে রুশোর অনেক আগে হবস্ ও লক আলোচনা

করে গেছেন। কিন্তু রুশোর মতামত তাঁদের থেকে ভিন্ন। রুশো এখানে কল্পনা করেছেন, রাষ্ট্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ হবার আগে মানুষ বাস করতো এক প্রাকৃতিক রাজ্যে ( State of Nature )। এই প্রাকৃতিক রাজ্যে চমৎকার পরিবেশ ছিল। এখানে মানুষে মানুষে কোন রূপ রেষারেষি, কলহ বা বিবাদ ছিল না। তারা পরম সুখে ও সম্প্রীতিতে প্রকৃতির অঢেল প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতো। কোন রকম কৃত্রিমতা তাদের জীবন বোধকে জটিল করে তোলেনি। মানুষ ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন, বাঁধন হারা। রুশো তাই সেই আদিম অবস্থাকে বলেছেন "মর্ত্যের স্বর্গ!"

তবে এই স্বর্গ থেকে মানুষের পতন হলো কেন?

'জন সংখ্যার বৃদ্ধি,'—রুশো উত্তর দেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের জীবন যাত্রাও দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। প্রবর্তিত হলো ব্যক্তিগত মালিকানায় সম্পত্তির অবস্থান। লোপপেলো মানুষের প্রারম্ভিক সরলতা। ঈর্ষা ও সন্দেহে জর্জরিত এখন মানব-মন। যেদিন থেকে মানুষ এমন অহং সর্বস্ব ভাবনায় নিজেকে জড়িয়ে ফেললো, সেদিন থেকে শুরু হলো তার পতন। ( The man who reflects is corrupt )।

এই অবিশ্বাসের যুগে নিজের নিজের অধিকার ও নিরাপত্তা বজায় রাখবার জন্য মানুষ তখন নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করে রাষ্ট্রের জন্ম দিলো। রুশোর মতে, মানুষ এই মর্মে চুক্তি করেছিল যে, তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ না করে সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ করবে। অর্থাৎ সমষ্টিগত ইচ্ছাই রাষ্ট্রের মূল শক্তির আধার। এটাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই দিক থেকে রুশো আধুনিক গণতন্ত্রের প্রথম প্রবক্তা।

রুশোর দর্শনে সর্বশক্তিমান রাজার কোন স্থান নেই। তিনি বললেন, যেহেতু রাজা আর জনগণের স্বার্থ দেখেছেন না, এবং সমষ্টির ইচ্ছা পূরণে তাঁর ব্যর্থতা দেখা গেছে; অধিকন্তু সামগ্রিক অর্থে

রাজা চুক্তি ভঙ্গ করেছেন, সুতরাং, রাজাকে আর এক মুহূর্তও সিংহাসনে বসবার অধিকার দেয়া উচিত নয়।

এমন স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ আক্রমণে গণ-চিত্ত সচকিত হ'য়ে উঠলো। রুশোর বিপ্লবী মন্ত্রে তারা দলে দলে দীক্ষা নিলো। এই মন্ত্রের সাফল্য তারা আরো অনুভব করতে পারলো, যখন জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকার মাটিতে প্রকৃত গণতন্ত্রের বীজ বপন করা হলো। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফরাসী সেনাপতি লা'ফায়েৎ স্বদল বলে ফিরে এসে প্রচার করতে লাগলেন সেই কাহিনী, রুশোর দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ তাঁরা দেখে এসেছেন আমেরিকার মাটিতে। অতএব ফ্রান্সের উর্বর মাটিতেই বা তা বপন করা যাবে না কেন?···

অন্ধকার। মসীলিপ্ত জগত। ভার্সাইয়ের প্রাসাদে নির্জনতা খুঁজে বেড়াচ্ছেন ষোড়শলুই। মাত্র কুড়ি বৎসরের যুবক। এমন পতনমুখ রাজ্যের দায়িত্ব এসে তাঁর অসমর্থ স্কন্ধে পড়ায় তিনি প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, [ God ! what a burden is mine ! ...and they have taught me nothing ! ] 'ঈশ্বর! এত বড় বোঝা আমি কি করে বহন করবো?··· আমার অভিভাবকরা যে আমাকে কিছুই শিক্ষা দেন নি।'

রাজা সময় সময় ভাবনার অতলান্তে ডুবে যান! জন-কল্যাণের বিবিধ পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে, কিন্তু কাজে নেমেই গভীর হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন,—তাঁকে বেষ্টন করে চক্কর খাচ্ছে কতকগুলো দুষ্ট গ্রহ। কিছুতেই ওদের হাত থেকে তাঁর মুক্তি নেই। বিলাসী ও স্বার্থন্ধ অভিজাত সম্প্রদায় ও পুরহিতরা ভার্সাই প্রাসাদের হৃদপিণ্ডটা হস্তগত করে ফেলেছে বহুদিন; ওদের ইচ্ছায় বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা সম্রাটের নেই! তার উপর রয়েছে তাঁর রূপসী রাণী, অস্ট্রিয়ার রাজকুমারী, বিলাসিনী ম্যারি আঁতোয়ানেৎ; আঁতোয়ানেৎ অভিজাত বর্গ ও পুরোহিতদেরই যেন প্রতিভূ! তাই সম্রাটের প্রতিটি মঙ্গলজনক কাজে তার বাধা আসতে থাকে।

ষোড়শ লুইয়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করে পরবর্তি কালে নেপোলিয়ন তাই মন্তব্য করেছিলেন।

When men call a king a kind man, his reign has been a failure.

বিপ্লবী মীরাবো তাঁর সম্পর্কে বলেন, [ No one trusrs him ; for he has no will of his own. ] 'কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে না ; কারণ, ওঁর নিজস্ব মত বলতে কিছুই নেই !'

ফ্রান্সের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ষোড়শ লুই প্রথমে তুর্গো [ Turgot ] এবং পরে নেকার [ Necker ] নামে দু'জন অর্থনীতি-বিদ্‌কে মন্ত্রী করেছিলেন। কিন্তু রাণী ও অভিজাত বর্গের চাপে পড়ে তুর্গোকে তিনি পদচ্যুত করতে বাধ্য হন। তুর্গোর মতো নেকারও রাজাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, ফ্রান্সের অর্থনৈতিক বনিয়াদের উন্নতির একমাত্র উপায় হলো, বিলাসিতা ও অপব্যয় কমিয়ে ফেলা এবং ধনী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে মোটা হারে কর আদায় করা ; সাধারণ লোকের কিছুটা কর-মুক্তি ঘটিয়ে বড়লোক-দের স্ফীত অর্থভাণ্ডারে হাত বাড়াতে হবে রাষ্ট্রের ; অবাধ ও কল্যাণ কর বাণিজ্য চালু করতে হবে এবং তা হবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে।

নেকারের এ সমস্ত পরিকল্পনাই ছিল বিপ্লবের হাত থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। কিন্তু দুর্বলচিত্ত সম্রাট সব বুঝেও কিছুই বাস্তবায়িত করতে পারলেন না।

অথচ, অর্থনৈতিক কাঠামো সেই মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়বার মতো অবস্থা ; আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ার ফলে সেই, দুর্বলতা আরো প্রকট হ'য়ে উঠেছে। সাধারণ লোক কর প্রদানে অসমর্থ, ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় রাজ্যের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে একান্তই নারাজ,—ব্যক্তিগত স্বার্থের জালেই তাঁরা আবদ্ধ। এমন দুর্বিপাকে পড়ে সম্রাট ষোড়শ লুই মন্ত্রী নেকারের পরামর্শে একশত পঁচাত্তর বৎসর পর ফ্রান্সের জাতীয় সভা বা States General আহ্বান করলেন। সাথে সাথে বিপ্লবের অর্গল মুক্ত হয়ে গেলো।

ফ্রান্স বিপ্লবের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। মরচেপড়া তলোয়ারে শাণ দেয়া সমাপ্ত,—এখন সূর্যের আলোতে ঝকমকিয়ে উঠলো তারা। বারুদ শুকনোই ছিল, এবার তাতে অগ্নি সংযোগের পালা!

তুঁলো বন্দর থেকে হোটেলে ফিরতে ফিরতে সেদিন রাত হয়ে গিয়েছিল। সমস্তটা পথ আমি মিস্ রেঁাকাতার সাথে কথা বলছিলাম। সবটাই ইতিহাসের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে।

তুঁলো বললো, 'দেখবেন, মাত্র এক বছরের মধ্যে হেগেল বিদায় নিতে বাধ্য হবেন!' আমি ওর প্রত্যয়ের সাথে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ শুনে অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম। তুঁলোও সস্নেহে তাকাচ্ছিলো আমার পানে; বলছিল, আমার শরীরে 'নাকি একটা জেল্লা, দেখা দিয়েছে। ছোট বেলা থেকেই আমার শরীর বেশ দুর্বল, অল্পেতেই হাঁপিয়ে পড়ি, দারুণ অর্থকষ্টে কোনদিন পুষ্টিকর খাবার খেতে পারিনি, একবার প্লুরিসিসও হয়েছিল,—ডাক্তাররা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, সামান্য অনিয়মে টি. বি. তেও আক্রান্ত হতে পারি। আমার মুখের উপর তখন লালচে ছায়াটা থর থরিয়ে নড়ছিল,— ভয় আমি পাই না। কিন্তু যতদিন বাঁচবো, বড় হবার চেষ্টা করবো, চেষ্টা করবো সাম্যবাদের জন্য, সমর্থন জানিয়ে যাবো আমার মতো সর্বহারাদের। ইউরোপে আসা আমাদের মতো ছেলের ভাগ্যে কখনো ঘটেনা,—ওসব কালো অর্থের খেলাতেই সম্ভব! নেহাৎ কপালের জোরে ফরাসী সরকারের বৃত্তি পেয়ে গিয়েছিলাম তাই! বস্তু-বিজ্ঞানে গবেষণা করছি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে! সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা হাতের কাছে পেয়ে গেছি,—ছাত্রদের গবেষণার এখানে কত চমৎকার ব্যবস্থা।

ফ্রান্সে রেঁাকাতা পরিবারের সাথে ক্রমশই যেন একাত্ম হ'য়ে উঠছি।···হোটেলের ছাদে বসে তুঁলোকে শোনালাম রবীন্দ্রনাথের কথা। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় গান গাইলাম 'আগুনের পরশমণি···।' কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বঅনুভূতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো তুঁলো রেঁাকাতা।

আবেগের সাথে বলে উঠলো, বুঝেছি, তিনি ছিলেন লেখকের লেখক, সঙ্গীতের সুরকার, শিল্পীর রূপকার, বিশ্বমানবতাবাদের পূজারী !'

তুঁলোকে হঠাৎ বুকের কাছে আঁকড়ে ধরতে চাই। কিন্তু তার আগেই সরে গেলো ও। ওর ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপতে থাকে, 'না, সেন,···আমার সম্বন্ধে সব না জেনে অমন করে টেনে নিওনা !'

তুঁলো সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

আমি বিমূঢ়।··

রাত নামলো।

আমার চিন্তার জগতেও আবার গভীরতা নেমে আসে।

আমি ভাবছিলাম বিপ্লবের কথা। আবার ফিরে যাচ্ছি সেই সন্ধিক্ষণে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে, প্যারিস থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে, ভার্সাই-এ স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন বসলো। সেই ঐতিহাসিক সভায় উপস্থিত ছিলেন ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের দু'শ পঁচাশী জন সদস্য, পুরহিতদের প্রতিনিধি তিনশ' আট জন [এদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ দরিদ্র পুরহিতদের প্রতিনিধি এবং সেই হেতু তাঁরা তৃতীয় সম্প্রদারেই সমর্থক ছিলেন] এবং তৃতীয় সম্প্রদায়ের নির্বাচিত ছশ একুশ জন সদস্য। এরা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন সেই সমস্ত ফরাসী নাগরিকদের দ্বারা, যাদের বয়স পঁচিশ বৎসরের উর্ধ্বে এবং যারা নিয়মিত কর দিয়ে এসেছেন। প্রত্যেক সদস্যই নিজ নিজ এলাকা সম্পর্কে অভাব-অভিযোগ লিখিত দাবী পত্র [ cahier ] নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

সভা আরম্ভেই সদস্যরা একটু বিভ্রান্তিতে পড়লেন,—সভার কাজ কিভাবে পরিচালিত হবে? তাঁদের নেতৃত্ব দেবেন কারা? কেউ কারুর পরিচিত নন! সম্রাট ষোড়শ লুইয়েরও সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। মুখে তাঁর সেই বোকা বোকা হাসি, পালকের টুপিটি নামিয়ে রেখেছেন টেবিলের উপর, দু'চারবার গালভরা কথা শোনালেন, মন্ত্রী নেকার পেশ করলেন, তাঁর হতাশা-

ব্যঞ্জক অর্থনৈতিক বিবরণী, তারপর একসময় হঠাৎ সম্রাট তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর হাত ধরে সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন। জমিদারদের ও পুরহিতদের প্রতিনিধিরাও ছায়ার মতো অনুসরণ করলেন রাজাকে।

শুধু এখানে পড়ে রইলেন তৃতীয় সম্প্রদায়ের নির্বাচিত সদস্যরা!

একজন উৎসাহী হঠাৎ মন্তব্য করে উঠলেন, 'The battle has begun......আমাদের সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে!...'

সংগ্রাম শুরু হয়ে গেলো।

সংকট তীব্র হয়ে উঠলো ভোটের প্রশ্ন নিয়ে। সাধারণ প্রতিনিধিদের সংখ্যা নবেলস্ ও ক্লার্জিদের চাইতে দ্বিগুণেরও বেশী। কাজেই যে কোন প্রস্তাব তাদের সম্মতি ছাড়া পাশ হতে পারে না। কিন্তু প্রথম দুই পক্ষের লোকেরা মাথা প্রতি ভোটের বিরোধিতা করে কক্ষপ্রতি ভোটের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করলেন; তাঁদের দাবি, সদস্যরা তিনটি পৃথক পৃথক কক্ষে বসবেন,--

ধনী জমিদাররা একটি কক্ষে বসবেন, পুরহিতদের প্রতিনিধিরা দ্বিতীয় কক্ষে বসবেন, এবং সাধারণ লোকের সদস্যরা তৃতীয় কক্ষে অবস্থান করবেন। এরপর যে কোন প্রস্তাব গৃহীত হতে গেলে অন্তত দুইটি কক্ষের সমর্থন তাতে থাকা অত্যাবশ্যক!

সাধারণ পক্ষের সদস্যরা এরকম প্রস্তাবে রাজি হলেন না। হবার কথাও নয়। তাঁরা অনড় হ'য়ে বসে রইলেন। পাঁচ সপ্তাহ যাবত তাঁরা শুধুই অপেক্ষা ক'রে আছেন চরম পরিণতির জন্য। ২৮শে মে প্যারিস থেকে আরো একদল ডেপুটী এসে যোগ দিলেন তাঁদের সাথে। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্যারিসের মেয়র জ্যোতিষী বেইলি। আরো তিনজন শক্তিমান নেতা এ সময় এসে তাঁদের সাথে যোগ দিলেন,—লেসেড্, ব্যালার্ড এবং জ্যালেট। জ্যালেট আবেগ মথিত কণ্ঠস্বরে ঘোষণা করলেন, [ Preceded by the torch of reason, led by our love for public weal'; and

by the cry of our consciences, we have come to join our fellow-citizens and brothers.] "যুক্তির তাগিদে, জনগণের প্রতি গভীর ভালবাসায় এবং বিবেকের দংশনে আমরা ছুটে এসেছি ভ্রাতৃপ্রতিম সহকর্মীদের সমর্থন জানাতে।"

সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের তখনো চেতনা ফিরে আসেনি। তখনো বুঝতে পারছেন না, কী ভয়ানক সিদ্ধান্ত তিনি নিতে চলেছেন! দুষ্ট সহচরদের প্রভাবে আচ্ছন্ন লুই সাধারণদের কক্ষের দরজা সশব্দে বন্ধ ক'রে দিলেন। সংঘবদ্ধ তৃতীয় সম্প্রদায় বিস্ময়ে, বেদনায় হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছিল কপাল বেয়ে বেয়ে। এ ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজবার কি মানে আছে? ওঁরা তাই দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলো অদূরে আচ্ছাদিত টেনিস-কোর্টে।

বিখ্যাত শিল্পী ডেভিড তাঁর বহুল পরিচিতি চিত্রে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে ধরে রেখেছেন। ফ্রান্সের বাড়ীতে বাড়ীতে সেই ছবির প্রিন্ট আজো শ্রদ্ধার সাথে সজ্জিত আছে :—

ছয় শতর উপর ডেপুটি তাঁদের সভাপতি বেইলিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। বেইলি একটি টেবিলের উপর বসে হাত তুলে ঘোষণা করছেন তাঁদের অবিচল সিদ্ধান্ত। এই সেই সিদ্ধান্ত, যা রাজতন্ত্রকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটিয়েছিল এবং পুরোহিতদের ভণ্ডামিকে বন্ধ করেছিল। এ সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত!...

ষোড়শ লুই অস্থির! তাঁর অস্থির পদচারণায় প্রহরীরাও সচকিত হয়ে ওঠে। চোখ-মুখে পাণ্ডুর ছায়াপাত ঘটেছে। সাধারণ সদস্যদের এই সরব প্রতিবাদের হেতু তাঁর কাছে খুব অস্পষ্ট নয়। কিন্তু কি করা যাবে? পাহাড় ভেঙ্গে পড়লে, নদী ফুলে উঠলে, ভূমিকম্পে সমগ্র ফ্রান্স ফেটে চৌচির হয়ে গেলেও সম্রাট ষোড়শ লুই কিছুতেই আঁতোয়ানেতের আঁচল ত্যাগ করে সরে আসতে পারেন না! পারেন না ভার্সাইয়ের স্বর্ণপাত্রগুলি চূর্ণ

করে দিতে, পারেন না ওখানকার রৌপ্যগলা স্রোতকে বন্ধ করে দিতে।

ঐ দূরে আঁতোয়ানেৎ পান পাত্র হাতে দেহ এলিয়ে দিয়েছে। সূক্ষ্ম বসন ভেদ করে ফুটে উঠেছে দেহের প্রতিটি সুঠাম ভাঁজ,— বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি এ সময় কামনার মদিরতায় বুজে এসেছে; হাতের আঙ্গুলে বিশ্বের সর্বোত্তম হীরের টুকরোগুলি ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। পায়ের মণি-মুক্তো খচিত জুতো নেহাৎ অবজ্ঞিত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে। এই তাঁর রাণী। ষোড়শ লুইয়ের সমস্ত সদিচ্ছার হত্যাকারিণী,—ওর মোহে, ওর কামে সম্রাট নিজে পুড়ছেন, একটি জাতির ভবিষ্যৎ নিয়েও ছিনিমিনি খেলছেন!

সেই খেলার কি আজ সমাপ্তি ঘনিয়ে এলো?

না,—তা হতে পারে না। সম্রাট আবার ছুটে এলেন স্টেটস্ জেনারেলে! কিন্তু কি করবেন তিনি? সাধারণ সদস্যরা সমস্যায় আরো অনমনীয় হয়ে উঠেছেন, তাঁরা কিছুতেই স্থান ত্যাগে রাজি নন।

সম্রাট তাঁর প্রতিনিধি ডুক্স ব্রিজকে পাঠালেন সাধারণ সদস্যদের সভায়। ডুক্স ব্রিজ জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন, 'রাজার অনুরোধ, আপনারা এই কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান!'

মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের নীরবতা।

তারপরেই সেখানে যেন একটি বোমা-বিস্ফোরণ ঘটে।

সকলে সচকিত হয়ে দেখলেন, বৃষস্কন্ধ নাতিদীর্ঘ একটি লোক সবেগে যেন তেড়ে এলেন রাজপ্রতিনিধিকে। তাঁর চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে; চিৎকার করে জবাব দিলেন তিনি, [ Sir, go tell your master that we are here by the will of the people and nothing but bayonets shall drive us out ] 'যান আপনার প্রভুকে গিয়ে বলুন, আমরা এখানে জনগণের ইচ্ছার বলে এসেছি এবং সঙ্গিনের দ্বারা হত্যা না করে আমাদের এখান থেকে একচুলও সরাতে পারবেন না।'

কে ? কে এই লোক ?

চারদিকে সাড়া পড়ে গেলো। জানা গেলো ওঁর নাম মীরাবো।

'সাবাস মীরাবো! তুমিই আমাদের নেতা!' উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন অনেকে!

ডুক্স ব্রিজ চলে আসেন সেখান থেকে। রাজাকে জানালেন সমস্ত পরিস্থিতি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে লুই বললেন, 'বেশ ওঁদের দাবিই আমি মেনে নিলাম। একটি কক্ষেই সমস্ত সদস্যরা জমায়েত হবেন এবং ভোট গ্রহণ করা হবে মাথাপিছু, কক্ষপিছু নয়!'

বিপ্লবের প্রথম দৃশ্য অভিনীত হয়ে গেলো। জয় হলো সাধারণের। আরো আত্মবিশ্বাসে ভরপুর তাঁরা। মীরাবো আত্ম-বিশ্বাসের হাসি হাসলেন। বেইলি দিলেন উদ্দীপনাময় ভাষণ। সামন্ত ও পুরহিতরা বিপাকে পড়েছেন। জনগণের চিৎকারে তারা সেই মুহূর্তে কম্পমান। ষোড়শ লুইয়ের বোকা বোকা হাসি তখনো আকর্ণ বিস্তারিত!

বিপ্লবের পরবর্তী দৃশ্য প্যারিসে। সাধারণের বিজয়বার্তা সেখানে বিপুল উল্লাসের সৃষ্টি করছে। বিপ্লবী গুপ্তসংস্থাগুলি প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করছে। নিঃস্ব ভূমিদাস, নিপীড়িত শ্রমিক, বুদ্ধিদীপ্ত বুদ্ধি জীবিরা,—প্রত্যেই দারুণ উত্তেজনায় মুষ্টিবদ্ধ। এক বিপ্লবী বললেন, "পশুশক্তি লুটিয়ে পড়েছে,—কিন্তু আমরা তাঁকে ক্ষমা করবো না। বিজয়ীরা কখনো বিজেতাকে পুরস্কার দেয় না।...... আমাদের একে চূড়ান্ত আঘাত হানতে দাও। দেশের চল্লিশ হাজার প্রাসাদ, বাগিচা, মনোরম শহর ও অট্টালিকাগুলি আমাদের বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ দখল ক'রে নেবো!*[৩]

অগ্নিগর্ভ প্যারিস।

বিপ্লবী প্যারিস।

একদিকে উল্লাস অপরদিকে আশঙ্কা,—এই মানসিকতা নিয়েই

মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে। প্যারিসের বুকে দুর্ভিক্ষের ছায়া নেমে আসছে। শহরটিকে যেন ফ্রান্সের অপরাপর স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবার এক চক্রান্ত চলছে! হয়তো যে কোন মুহূর্তে রাজার ভাড়াটে সৈন্যরা এখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে! জনসাধারণের আকণ্ঠ রক্তপান করবেন সামন্তবর্গ ও পুরোহিতরা! অতএব সাবধান!······

এই জমা বারুদে আগুন লাগলো ১২ই জুলাই, রবিবার।

ঐ দিনই States General এর প্রকাশ্য অধিবেশনে রাজা নেকারকে বরখাস্ত করলেন। কারণ, মন্ত্রী নেকার বরাবরই সাধারণের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত করছিলেন। ···সাধারণ প্রতিনিধিরা দেখলেন, সমগ্র ভার্সাই জুড়ে হাজার হাজার সুইস ও জার্মান ভাড়াটে সেনারা বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের উদ্দেশ্য কি? ওরা হয়তো রাজ-নির্দেশে তাঁদের কুকুরের মতো গুলি করে মারবে! কিন্তু প্যারিস কি জানে একথা? যদি জানতো, তবে নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ জনতা এগিয়ে আসতো তাঁদের প্রতিনিধিদের উদ্ধার করতে।

* The French Revolution : N. H. Webster.[8]

ঠিক সেইক্ষণে এক দুঃসাহসিক প্রতিনিধি কেমিলে ডেজমলনিস্ সকলের চোখে ধূলো দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সভাগৃহ থেকে। ছুটতে ছুটতে হাজির হলেন প্যারিসে। চোখ মুখ তাঁর রক্তবর্ণ, হাত পা কাঁপছে। তবু, নিজের অসাধারণ শক্তির বলে উঠে দাঁড়ালেন একটি উঁচু টেবিলের উপর। প্যারিসের সমবেত জনগণকে জানালেন, [To arms, to arms! Not a moment must be lost! Monsieur Necker has been dismissed! His dismissal sounds the tocsin to all patriots. To-night all the Swiss and German battalions in the champde Mars will come out and slaughter us. We have but one chance left; to fly to arms.] "অস্ত্র ধারণ করুন,

অস্ত্র ধারণ করুন বন্ধুগণ! একটি মুহূর্তও আর নষ্ট করবেন না। মঁসিয়ে নেকারকে পদচ্যুত করা হয়েছে! তাঁর পদত্যাগ সমস্ত দেশ প্রেমিকদের কানে বিপদের সঙ্কেত দিচ্ছে। আজই রাত্রে সুইস্ এবং জার্মান সৈন্যবাহিনী আমাদের খতম করতে এগিয়ে আসবে। এই মুহূর্তে আমাদের একটি মাত্র কর্তব্য, তা হচ্ছে, অস্ত্র ধারণ!"

Fly to arms!

অস্ত্র ধারণ করো!

অস্ত্রের সন্ধান করো। আক্রমণের প্রতীক্ষা না করে নিজেরাই প্রথম আক্রমণের সুযোগ নাও।

যে তুষের আগুন এতকাল ধিক্ ধিক্ ক'রে জ্বলছিল, এই মুহূর্তে তা দাবানলের মতো সর্বগ্রাসী আকাশ স্পর্শী হ'য়ে ওঠে! সেই মসীকৃষ্ণ রাতে কারো চোখে ঘুম নেই। 'শুধু মাত্র শিশুরা ঘুমিয়ে ছিল'। পরদিন সকালে সরকারী রুটির কারখানা লুঠ হলো, পুলিশ -কমিশনারের বাড়ীতে হামলা চললো, হাজার হাজার লোক হোটেল দ্যা ভিলা [ Hotel de Ville ] কে ঘিরে সমস্ত মজুত অস্ত্র দাবী করতে থাকে। দ্য ফ্লেসেঁলেস্ [ De Flesselles ] নামক ধনী অস্ত্র ব্যবসায়ী জনগণের হাতে তাঁর মজুত ভাণ্ডার তুলে দিতে রাজি না হওয়ায়, প্যারিসের উন্মুক্ত জনতা তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

১৪ই জুলাইয়ের মধ্যে প্যারির জনতা বিভিন্ন ধরণের অস্ত্রে নিজেদের সজ্জিত করে নেয়। দুটো পুরনো কামান সহ বহু আগ্নেয়অস্ত্র তাঁরা প্যারিসে সম্রাটের বাগান-বাড়ী থেকেই সংগ্রহ করে, বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত লোকের আবাস ও দোকান পাট লুঠ ক'রে সংগৃহীত হলো হাজার হাজার বন্দুক।

অনেকে আগ্নেয় অস্ত্র সংগ্রহ করতে না পেরে, নিজের নিজের বাড়ী থেকে গাঁয়তি, খন্তা, কুড়োল, সাবল ইত্যাদি হাতে 'মার মার' শব্দে ছুটে এসে জমায়েত হতে থাকে। এরকম সংগৃহীত শাবলের সংখ্যাই ছিল পঞ্চাশ হাজার! হঠাৎ গুজব রটে গেলো, বাস্তিল দুর্গে প্রচুর গোলা বারুদ মজুত করে রাখা হয়েছে! আর যায় কোথায়?

হাজার হাজার নর-নারী মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র সহ ঝাঁপিয়ে পড়লো বাস্তিল দুর্গের উপর। কুখ্যাত এই কারাগারের আটটি গম্বুজেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। বাস্তিলের সামরিক অধিকর্তা দেলাউনে তাঁর ত্রিশ জন সুইস গার্ড নিয়ে বারেকের জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ এর মতো অগণিত ক্রুদ্ধ জনতার তরঙ্গ দেখে তাঁর বুকের রক্ত যেন জল হয়ে যায়। পরাজয় স্বীকার করে শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দিলেন তিনি। চাইলেন প্যারির অধিবাসীদের সাথে সন্ধি করতে।

কিন্তু কে শুনবে দেলাউনের সেই অকুতি ?

বাঁধ ভাঙ্গা জলের মতো লোকেরা কান ফাটানো চিৎকার ক'রে ঢুকে পড়লো কুখ্যাত বাস্তিলে। ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হলো এর প্রতিটি অন্ধ গহ্বরকে। বন্দীরা মুক্তি পেয়ে জড়িয়ে ধরলো বিপ্লবীদের। শত শত নিরপরাধ ব্যক্তির আত্মা অগ্নিদগ্ধ বাস্তিলকে দেখে অলক্ষ্যে যেন অট্টহাসি হাসতে থাকে,—প্রতিশোধ ! ইতি-হাসের দেনা শোধ !

দেলাউনেকে বেঁধে নিয়ে আসা হচ্ছিলো হোটেল দ্যঁা ভিলার দিকে। কিন্তু জনতার রোষাগ্নি তাঁকে আর নিস্তার দিলে না। হোটেল দ্যঁা ভিলাতে পৌঁছবার আগেই কয়েক হাজার লোক ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর উপর,—শকুনে খাওয়া মৃত দেহের মতো ছিন্ন ভিন্ন করে ফেললো দেলাউনকে ! কে এক কোপে তাঁর মাথাটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তাঁরপর সেই ছিন্নশির বর্শার মাথায় স্থাপন ক'রে জনতার সে কী পৈশাচিক উল্লাস ! এমন কি, শিশু ও নারীরা হাততালি দিতে দিতে নাচতে থাকে। বহু সামন্ত ও সৈনিকের ছিন্ন শির প্যারিসের রাস্তায় গড়াগড়ি খেতে থাকে। পথ ঘাট রক্তে পিচ্ছিল। জনতা কাঁচা রক্তের স্বাদ পেয়েছে ! দুজন নেকার বিরোধী মন্ত্রী ফোলন ও বার্থইয়ারকে নৃসংশ ভাবে হত্যা করা হয় !

১৪ই জুলাইএর রক্ত স্বাক্ষরিত অধ্যায় রচিত হলো। জনতা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিলো। ঘোষিত হলো, ঐ দিনটি ফ্রান্সের জাতীয় দিবস! প্যারিসের সংবাদ স্টেটস্ জেনারেলে পৌঁছলে জাতীয় সভায় এক পক্ষের উল্লাস ও অপর পক্ষের আতঙ্ক শিহরিত হ'য়ে ওঠে। আনন্দিত সাধারণের প্রতিনিধিরা,—তাঁদের বহু ঈপ্সিত বিপ্লব প্যারিস বাসীরা শুরু করে দিয়েছে। আতঙ্কিত জমিদার ও পুরোহিতদের প্রতিনিধিরা,—তাঁদের সর্বনাশ যে ঘনায়মান!

রাজা কিন্তু তখনো সেই বোকা বোকা হাসি হাসছেন। সাধারণ সদস্যরা যে দাবী নিয়েই উপস্থিত হচ্ছেন, তিনি তাতেই তাঁর সম্মতি দিচ্ছেন। প্যারিসের বিপ্লবী জনতার সাথে জাতীয় সভার সন্ধি-স্থাপিত হলো। এই সন্ধির ফলশ্রুতিতে বিপ্লবী লাফায়েৎ হলেন বিপ্লবীদের দ্বারা সংগঠিত 'জাতীয় রক্ষীদলের' [National guard] প্রধান; বেইলিকে পুনরায় প্যারিসের মেয়র নির্বাচিত করা হলো। সম্রাট ষোড়শ লুই আবার পদচ্যুত মন্ত্রী নেকারকে স্বপদে পুনর্বহাল করলেন!

এরপর সম্রাট জাতীয় সভার সদস্যদের নিয়ে উপস্থিত হলেন প্যারিসে। নেমে এলেন প্রকাশ্য রাস্তায়। হোটেল দ্যা ভিলার বিপ্লবী নেতারা তাঁর সাথে দেখা করলেন। হাজার হাজার উল্লসিত জনতা ছুটে আসে। জেলেনী এবং বাজারের কিছু মেয়েছেলে রাজাকে ঘিরে নাচতে থাকে। রাজার মুখে তখনো সেই নির্বিকার হাসি। হঠাৎ বিপ্লবীদের একটি ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা তিনি উঁচু করে ধরেন। সাথে সাথে সমবেত সাধারণ লোক সহর্ষ চিৎকার ক'রে উঠলো, "ইনি আমাদের লোক! ইনি আমাদের বিপ্লবকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।"

প্যারিসের সেই বহ্নিশিখা ডালপালা বিস্তারিত ক'রে রক্তমুখী আগ্নেগিরির মতো অগ্নিবমন করে চলেছে ফ্রান্সের শহরে শহরে,

গ্রামে গ্রামে। চল্লিশ হাজার গ্রামে বাস্তিলের অনুরূপ অজস্র সামন্ত কারগারগুলিকে চূর্ণ করা হলো। ভূমিদাসরা হত্যা করলো জমিদারদের, চার্চের মধ্যে ঢুকে অত্যাচারী বিলাসী পুরহিতদের টেনে এনে আছাড় মারা হলো প্রকাশ্য রাস্তায়, বুভুক্ষু কৃষকরা তাদের পরিশ্রমের ফসলদানা এতদিনে ছিনিয়ে আনতে সমর্থ হলো জমিদার ও সুদখোরদের মজুত গোলা থেকে, প্রতিটি অত্যাচারী সামন্ত ও পুরহিতের বাড়ীতে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, যারা পালাতে সমর্থ হলো তারা আশ্রয় নিলো সীমান্তের ওপারে অষ্ট্রিয়ায়, আর যারা পালাতে পারলো না, জনতার রুদ্ররোষে তারা সপরিবারে নিহত হলো।

সম্রাট ষোড়শ লুই সেই অগ্নিদগ্ধ ফ্রান্সের বাতাস বুক ভরে গ্রহণ করেন। বেদনা নয়, বরং কেমন যেন এক ধরণের প্রীতিকর উষ্ণতা অনুভব করছেন তিনি। এই সামন্ত ও পুরোহিতদের উপর প্রচ্ছন্ন অভিমান তাঁর ছিল, এঁরা তাঁকে সত্য সত্যই কাঠের পুতুল বানিয়ে রেখেছিল এতদিন !···কিন্তু রাণী আঁতোয়ানেৎ কি বলছেন ? বলছেন, বিপ্লবীরা আর তাঁর রাজদণ্ড ফিরিয়ে দেবে না, বরং সপরিবারে রাজাকে হত্যা করতে পারে! না না, তা হয় না! দুঃস্বপ্নে গিলোটিনের ধারালো ব্লেডখানা দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন সম্রাট ষোড়শ লুই !

বিপ্লবের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হলো।

জনগণ দেখলো, তারা সবই করতে পারে! মাথার কোষে কোষে তাই সমস্ত ওলোট পালোট করবার একটা উদগ্র ইচ্ছা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে! বিপ্লবীদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত [ শ্বেত, রক্ত ও নীল ] পতাকা শোভা পাচ্ছে সর্বত্র। সাধারণের দাবী—স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী [ Liberty, Equality and Fraternity ] প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজ !

৪ঠা আগষ্ট জাতীয় সভার অধিবেশন আবার শুরু হলো।

সমস্ত রাত ধরে চললো সেই সভা, গৃহীত হলো বহু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। ঘোষণা করা হলো, সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তি এবং 'মানবের অধিকার [ Declaration of the Right ot Man ], বিজ্ঞপিত হলো অসাম্যের অবসান।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট ওলোট পালোট হয়ে গেলো। কিন্তু সাধারণের দুর্দশা দূর হলো না। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া গ্রাস করে ফেলেছে ফ্রান্সকে। রুটির সন্ধানে বিলাপরত ফরাসী নারী ও শিশুরা। যুবকদের কোন চাকুরির সংস্থান নেই। সর্বত্র এক হাহাশ্বাস ও অভিশাপ শোনা যায়। ৫ই অক্টোবর খাদ্যের দাবীতে হাজার হাজার স্ত্রীলোক ভার্সাই প্যালেসের দিকে অগ্রসর হয়।

রাজা তাঁর পরিবার নিয়ে এবং জাতীয় সভার সভ্যরাও ভার্সাই ত্যাগ করে প্যারিসে চলে আসেন।...

রচিত হলো নতুন সংবিধান! প্রতিষ্ঠিত হলো নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। এককক্ষ যুক্ত আইন সভা, বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র এবং শাসন বিভাগের শীর্ষে রাজার স্থান ইত্যাদি স্বীকৃত হলো। রাজা উচ্চপদে নিয়োগের এবং সাময়িক ভাবে আইন সভার সিদ্ধান্তকে স্থগিত রাখবার ক্ষমতা [ Veto ] লাভ করলেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং আইনসভার সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করবার অধিকার হতে তিনি বঞ্চিত হলেন। সমগ্র ফ্রান্স তিরাশিটি বিভাগে বিভক্ত হলো।

কিন্তু বড় সমস্যা টাকার সমস্যা। ঋণ গ্রহণ করে বা, জনতার কাছে ভিক্ষা করে এ অভাব মেটানো সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে সরকার ধর্মযাজকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন এবং এ্যাসাইন্যাট [ assignats ] নামে একপ্রকার কাগজী নোট চালু করলেন। Civil constitution of clergy আইনের জোরে সমস্ত যাজকদের

রাষ্ট্রশক্তির অধীনে আনা হলো। স্থির হলো, এরপর থেকে ধর্মযাজকরা সরকারের কাছ থেকে বেতন পাবেন মাত্র এবং তাঁদের নির্বাচিত হতে হবে জণগণের দ্বারা। এইভাবে ধর্মযাজকদের এতদিনের সুখের প্রাসাদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ষোড়শ লুই বুঝতে পারলেন, আঁতোয়ানেতের কথাই ঠিক! বিপ্লবীরা তাঁকে সাক্ষী গোপাল বানিয়ে রেখেছে মাত্র। এতটুকু ক্ষমতাও তাঁর নেই। রাত দিন গিলোটিনের দুঃস্বপ্ন তাঁকে তাড়া করে ফিরছে! প্যারিসের টুইলেরিস্ [ Tuilleris ] প্রাসাদে বাস করে রাজ পরিবার ভার্সাই প্রাসাদের আরাম ও সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।··· মীরাবো এবং লাফায়েতের আশ্বাসে স্বস্তি পাচ্ছেন না মেরী আঁতোয়ানেৎ! তিনি গোপনে তাঁর ভ্রাতা অষ্টিয়ার সম্রাট লিওপোল্ডের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। কিন্তু লিওপোল্ড তাঁকে পরিপূর্ণ আশ্বাস দিতে পারলেন না, কারণ সম্রাটের তরফ থেকে অনুরূপ কোন অনুরোধ তিনি তখনও পান নি। সীমান্তের অপরপার থেকে সংঘবদ্ধ ফরাসী সামন্তরা গোপনে যোগাযোগ বজায় রাখলেন রাণীর সাথে। আঁতোয়ানেৎ এবার পালিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর হলেন।···

২০ শে জুন, খুব ভোরে প্যারিসের রাজপ্রাসাদ থেকে বিপদের ঘণ্টা অনবরত বেজে চলে। শত শত লোক জমায়েত হয়ে শুনলো, সপরিবারে রাজা পালিয়েছেন। রাজার শয়নকক্ষ শূন্য,— সেখানে রাজা নেই, রাণী নেই, তাঁদের সন্তানরাও নেই! ক্রুদ্ধজনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়লো প্রাসাদের উপর, ভেঙ্গে তচনছ করে দিলো রাজপরিবারের বিলাস সামগ্রীগুলিকে!

রাজা সপরিবারে তখন ছুটে চলেছেন সীমান্তের দিকে। তার ভাই আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু ষোড়শ লুইয়ের ভুল হয়েছিল, পলায়নী দলটাকেও তিনি ছোট করতে পারেন নি।

বিশাল অশ্ববাহিত শকট গ্রামবাসীদের কৌতুক জাগিয়ে তোলে। একেবারে সীমান্তের কাছাকাছি গিয়ে রাজা ধরা পড়লেন। এক পোষ্টমাষ্টারের তরুণ পুত্র ড্রোয়েট চিৎকার করে গ্রামবাসীদের সচেতন করে দিলেন, ঘিরে ফেললেন রাজার গাড়ীকে! বেদনাহত রাজা ষোড়শ লুই দেখলেন, তাঁর অবাধ্য প্রজারা সার সার গরুর গাড়ী দাঁড় করিয়ে পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে! অবরুদ্ধ পথ, ভয়াবহ ভবিষ্যৎ! ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন সম্রাট ষোড়শ লুই। ডুকরে উঠলেন মেরী আঁতোয়ানেৎ! সন্তানদের বুকে চেপে ধরলেন তিনি! আর মাত্র কয়েক মাইল অগ্রসর হলেই সীমান্ত অতিক্রম করা যেত! কিন্তু কিছুই হলো না,—তীরে এসে তরী ডুবলো! প্যারিস পর্যন্ত সমস্ত পথ ধরে জনতা রাজপরিবারকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দিতে থাকে, নানা অঙ্গ-ভঙ্গী করে বিদ্রূপ করতে থাকে! ষোড়শ লুইয়ের কপাল বেয়ে বেয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে, পা দুটো আর দেহভার বহনে অক্ষম! তবু রাণী আঁতোয়ানেতের কথায় যথাসাধ্য ঋজু হ'য়ে চলছেন তিনি! এখনো তিনি ফ্রান্সের সম্রাট! রাণী আঁতোয়ানেৎ এখনো ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী!

প্যারিসের উন্মত্ত জনতা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক রাজ-পরিবারকে দেখে দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ ক'রে, চিৎকার করে, মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ধিক্কার জানায়! রাজাকে ধরিয়ে দেবার পূর্ণ কৃতিত্বে ড্রোয়টের প্রতি সাধারণের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তারা তাকে মাথায় তুলে ধেই ধেই করে নাচছে। জনতার সেই আদরে ড্রোয়টের বেল্ট খুলে যায়, প্যাণ্ট খুলে যায়। উলঙ্গ ড্রোয়টের উপর অজস্র সোহাগ-চুম্বন বর্ষিত হতে থাকে।·· তাঁকে বারোশত ফ্রাঙ্ক পুরস্কার দেওয়া হলো এবং ১৭৯২ সালে জনতা তাঁকে ফরাসী কনভেনশনের সদস্য নির্বাচিত করে। এরপর অস্ট্রিয়ানদের সাথে যুদ্ধে তিনি অস্ট্রিয়ায় বন্দী হন। কিন্তু ষোড়শ লুইয়ের এক কন্যার

মুক্তি-পণ স্বরূপ তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁকে Legin of Honour দ্বারা বিরল সম্মানে সম্মানিত করেন। কিন্তু বোনাপার্টের পতনের পর বহুদিন ড্রোয়টের কোন সন্ধান আমরা পাই না। ১৮২৪ সালে ফ্রান্সের এক গণ্ড গ্রামে জনৈক বৃদ্ধের মৃত্যু ঘটলে জানা যায়, ঐ লোকটিই নাকি ছিলেন ছদ্মবেশী ড্রোয়ট!

এর পরের ঘটনা অতি ভয়াবহ! এখন বিপ্লবী রাক্ষুসী নিজের সন্তানদেরই ভক্ষণ করতে শুরু করলেন!

আইনসভার সদস্যদের মধ্যে রাজার ভাগ্য নিয়ে বাগ-বিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। একজন চান, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বজায় রাখতে, অপরদল চাইলেন—ফ্রান্সের বুক থেকে চিরতরে রাজতন্ত্র মুছে ফেলতে। এই রাজতন্ত্র বিরোধীরা আবার দুটি দলে বিভক্ত—জ্যাকোবিন [ Jacobin ] ও জিরণ্ডিষ্ট [ Girondist ]।

অধিকাংশের সমর্থনপুষ্ট জিরণ্ডিষ্টরা মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। মন্ত্রিসভা প্রথমেই আদেশ জারি করলেন, যে সমস্ত ধর্মযাজক এখনো সরকারী আইন অমান্য ক'রে পূর্ব ব্যবস্থা আঁকড়ে আছেন, তাদের ভাতা ও পেন্‌শন্ বন্ধ করে দেওয়া হবে; এবং যে সমস্ত অভিজাত বংশীয় লোক নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দেশে ফিরে না আসবেন তাঁদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। কিন্তু রাজা নিজের বিশেষ ক্ষমতা বলে উভয় বিধানই নাকচ ক'রে দিলেন। জনতা ঝাঁপিয়ে পড়লো রাজপ্রাসাদের উপর। ওদিকে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সমবেত সৈন্যরা ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করে এগিয়ে আসছে বিপ্লবী ফ্রান্সকে হত্যা করতে। উন্মত্ত জনতা আবার রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করলো। রাজার সমস্ত দেহরক্ষীদের হত্যা করা হলো। জনতার দাবীতে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘোষিত হলো। বন্দী হলেন রাজপরিবারের সকলে।

এইবার প্রতিষ্ঠিত হলো প্রকৃত প্রজাতন্ত্র।

সম্রাট লিওপোল্ডের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ফ্রান্সিস নিজেকে বিপ্লবের প্রধান শত্রু বলে ঘোষণা করলেন।···ফরাসী যোদ্ধারা আপ্রাণ লড়েও প্রাশিয়ান ও অস্ট্রিয়ানদের গতি রোধ করতে পারছে না। একটির পর একটি ফরাসী শহর শত্রুর হাতে চলে যাচ্ছে। জাতীয় সভার অন্যতম শক্তিশালী দল জ্যাকবিনরা এই সময় ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে। জিরণ্ডিষ্টদের এই ব্যর্থতার ও দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে! তাঁদের শক্তিও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এখন এই বিপ্লবী জ্যাকোবিন দলের গোড়ার কথা কিছু বলে নেওয়া ভালো। একটি রাজনৈতিক বিতর্ক থেকে জ্যাকোবিন দলের সৃষ্টি হয়েছিল ১৭৮৯ সালে। যে বাড়ীতে তাদের এই রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে এক সময় জ্যাকোবিন নামে একদল ডোমিনিকান সাধু [ Dominican monks ] বাস করতেন। সেই সাধুদের নাম অনুসারেই এই দলের নাম রাখা হলো জ্যাকোবিন। প্যারিসকে কেন্দ্র ক'রে ফ্রান্সের অপরাপর শহরেও জ্যাকোবিনদের শাখা বিস্তারিত ছিল। এদের সদস্য ও নেতারা অধিকাংশই ছিলেন তীব্র জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান।···জ্যাকোবিনদের মধ্যে রোবস্পিয়রই নিঃসন্দেহে সব চাইতে প্রভাবশীল ছিলেন। অন্য বড় নেতাদের মধ্যে ছিলেন —ম্যারাট, ড্যান্টন, মাদাম রোঁলা এবং ব্যার্‌রে।

প্যারিসে জ্যাকোবিনদের চরমনীতি দেশের এই ঘোর দুর্দিনে দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিরোধী জিরণ্ডিষ্টদের উদ্দেশ্যে ড্যান্টন বললেন, [ ···Paris is the Centre of light. Paris has made the revolution, and when it shall perish there will no longer be a revolution. ] আমি মনে করি, প্যারিসই হলো ফ্রান্সের প্রাণকেন্দ্র।···সমস্ত আলোকের উৎস!

প্যারিস বিপ্লবীর জন্মদাত্রী ; সুতরাং এই নগরী ধ্বংস হ'য়ে গেলে, বিপ্লবও একেবারে মুছে যাবে !'

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই জ্যাকোবিন দল রাজা ষোড়শ লুইয়ের বিচারের কাজে হাত দিল। অধিকাংশের সমর্থনে রাজার প্রাণ-দণ্ডের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ১৭৯৩ সালের ২১শে জানুয়ারী গিলোটিনে [ Guillotine ] ষোড়শ লুইয়ের শিরচ্ছেদ হয়।

রাজার এই মৃত্যুদণ্ডের সংবাদে বৈদেশিক আক্রমণের তীব্রতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি জোট বেঁধে বিপ্লব ধ্বংসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফ্রান্সের অভ্যন্তরেও স্থানে স্থানে প্রতি বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা করতে থাকে। অনেকটা তাই নিরুপায় হয়েই কন্‌ভেন্‌শান ফ্রান্সের অভ্যন্তরে কঠোর শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। স্থাপিত হলো Reign of Terror বা সন্ত্রাসের রাজত্ব। এদিকে ড্যান্টনের নেতৃত্বে ফরাসী যুবকরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে দেশরক্ষায় এগিয়ে এসেছে। ফরাসী বাহিনীর সেই পাল্টা মার খেয়ে যূথবদ্ধ ইউরোপীয় সেনারা ক্রমশই পিঁছু হটতে থাকে।

ফ্রান্সের অভ্যন্তরে জন-নিরাপত্তা সমিতি [ Commitee of Public Safety ], ও বিপ্লবী বিচারসভা [ Revolutionary Tribunal ] মারফৎ জ্যাকোবিন নেতা রোবস্পিয়র এক ভয়ঙ্কর রাজত্ব কায়েম করে বসলেন। এমন ভয়ানক রক্তক্ষরণকারী যুগ ফরাসী জাতির ইতিহাসে ইতিপূর্বে রচিত হয় নাই। সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিমাত্রকেই হত্যার আদেশ দেওয়া হয়। সন্ত্রাস রাজত্বের শিরোমণী হলেন দুই রক্তপিপাসু বিপ্লবী—রোবস্পিয়র ও ম্যারাট ! তাঁদেরই নির্দেশে বিচারের প্রহসনে প্রাণ হারালো হাজার হাজার নিরপরাধ যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশু,…। গিলোটিনে মাথা রাখলেন রাণী মেরী আঁতোয়ানেৎ, জিরণ্ডিষ্ট দলের প্রধান নেতৃবৃন্দ এবং ফ্রান্সের বহু বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্‌ও বিপ্লবের নেতা।

ফ্রান্সকে বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে ফিরে

এলেন ড্যান্টন; তিনি চাইলেন, এই ভীতির-রাজত্বের অবসান ঘটাতে। কিন্তু রোবস্পিয়র তাঁর সাথে একমত হতে পারলেন না। ফলে ড্যান্টনকেও হঠাৎ একদিন ধরে এনে হাজির করা হলো বিপ্লবী বিচার সভায়। কয়েক মিনিটের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন হতভাগ্য দেশপ্রেমিক ড্যান্টন। অনুরূপভাবে হত্যা করা হলো 'বিপ্লবের জননী' তেজস্বিনী মহিলা মাদাম রোঁলাকেও! হত্যা করা হলো অন্যতম বিপ্লবী নেতা হোবার্টকে। শ্মশানচারী প্রেতের মতো উন্মত্ত রোবস্পিয়র খুনের নেশায় মেতে উঠলেন। তাঁর নিজেরই প্রাণের আশঙ্কা তাঁকে আরো উত্তেজিত ক'রে তোলে। তাঁর এত দিনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা, অবদান-সমস্তই মুছে যাচ্ছে! এখন তিনি সর্বত্রই ঐ একই দৃশ্য দেখতে চান,—শুধু রক্তের ফোয়ারা!

অবশেষে দেশের শান্তিকামী লোকেরা সংঘবদ্ধ হ'য়ে রুখে দাঁড়ায় এই খুনে নেতার বিরুদ্ধে। কনভেনশানের অধিকাংশ সদস্যই রোবস্পিয়রের Age of Virtueকে চূর্ণ করতে অগ্রসর হন। হঠাৎ এক রাত্রে হোটেল দ্যা ভিলা থেকে টেনে নামানো হলো তাঁকে। এনে দাঁড় করানো হলো তার নিজেরই সৃষ্ট Revolutionary Tribunalএর সামনে। সেই কয়েক মুহূর্তের বিচার! তারপরই গিলোটিনের ধারালো ব্লেডে শিরচ্ছেদ হলো দুর্দান্ত রোবস্পিয়রের। সাথে সাথে অবসান হলো ভীতি রাজত্বের!

পাঁচজন সদস্য দ্বারা গঠিত Directoryএর হাতে এলো প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব।

ভীতির রাজত্ব বিপ্লবী ফ্রান্সের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় অধ্যায়। কত নিরপরাধের যে প্রাণদণ্ড হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই! প্রাণ হারিয়েছিলেন বহু খ্যাতিমান বিপ্লবী, যাঁদের অবদানে ফ্রান্সের মাটিতে প্রথম গণতন্ত্রের বীজ বপন করা হয়েছিল। তবু, একথা অস্বীকার করলে চলবে না যে, ফ্রান্সের সেই দুঃসময়ে ভীতির

রাজত্বের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয় ছিল। অমন কঠোর ও ভয়াবহ শাসন যন্ত্র প্রবর্তিত না হলে বিপ্লবী ফ্রান্স অঙ্কুরেই রাজতান্ত্রিক দেশগুলির পদতলে গুঁড়িয়ে যেতো। বিপ্লবের অঙ্কুরটিকে রক্ষার জন্য কনভেনশান্ সজোরে অঙ্কুশ চালনা করেছিল মাত্র। তাতে অনেক বিপ্লবীও প্রাণ হারিয়েছিলেন। কারণ, ঘুরে ফিরে সেই একই কথা আসছে, 'বিপ্লব রাক্ষুসী তার নিজের সন্তানদেরও ভক্ষণ করে!'

॥ চার ॥

এক সঙ্গে যেন পিয়ানোর সবকটি রিডে স্বরগ্রাম ওঠানামা করছে। রেঁাকাতা পরিবারের স্টাডিতে বসে শুনছি তুঁলোর পাঠ,—রেঁামা রেঁালার 'শিল্পীর নবজন্ম' পাঠ করছিল সে ; ওর কণ্ঠস্বরে পিয়ানোর ঝঙ্কার। রূপে ও পরিবেশে আমার এই প্রবাসী ছাত্র জীবন সত্যই অনুপম। শুধু একদিন বোধ হয় সামান্য ভুল ক'রে বসেছিলাম,—মনের আকুতিতে তুঁলোকে বক্ষলগ্না করতে চেয়ে ছিলাম। কিন্তু ফরাসী তনয়া তাতে সায় দিতে পারে নি। সেই মুহূর্তে ওর আতঙ্কিত দৃষ্টিতে কোন এক চাপা বেদনা যেন আমি দেখতে পেয়েছিলাম। সেই বেদনার উৎস আমি আজও খুঁজে পাই নি। আর পাঁচটা ফরাসী মেয়ের চাইতে আলাদা, সম্পূর্ণ আলাদা মনে হয় মিস্ রেঁাকাতাকে। দর্শন ও ইতিহাসের পাঠ-গ্রহণে ওর সহায়তা আজকাল আমার পক্ষে অপরিহার্য। হৃদয়ের আবেগকে চেপে রেখে রেঁাকাতার সাথে শুধুই ইতিহাস-আশ্রিত আলোচনায় ডুবে থাকি আমি।

ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লব ও তার ফলশ্রুতিতে সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে রেঁামা রেঁালার উক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম সেদিন দু'জনে। আলোচনার গতি কখনো একটি ক্ষেত্রেই ঘুরপাক খায় না, মূল নদী থেকে যেমন অসংখ্য শাখা-নদী নানা ধারে নিজেদের বিছিয়ে দেয়, আমাদের আলোচনাও তেমনি একটি মূল সূত্রকে অবলম্বন করে দর্শন, রাজনৈতিক মতবাদ ও ঐতিহাসিক বিবর্তন ও বিপ্লবের ছোট-বড় অঙ্গনে অবাধে ঘুরে বেড়ায়। আলোচনা প্রসঙ্গে আসে সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি, কার্ল-মার্কসের আশ্চর্য-জীবন-কাহিনী এবং মার্কসবাদের আলোকে রুশ বিপ্লবের প্রসঙ্গ। একটা থেকে আর একটা,—কিন্তু যোগসূত্র একটিই!…

শিল্প-বিপ্লবের ফলে শ্রেণী সংগ্রামের উৎপত্তি। শুরু হয় শ্রমিক-

মালিক বিরোধ। মালিকদের প্রধান লক্ষ্য, মুনাফা অর্জন এবং সেই মুনাফায় স্ফীত হয়ে উঠবার উপায়, শ্রমিকদের তাদের পরিশ্রমের যথাযথ ফল লাভ থেকে বঞ্চিত করা। অল্প বেতন, দীর্ঘ সময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জানোয়ারের মতো খাটুনি এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তির ঔদাসীন্য ইত্যাদি কারণে শ্রমিকরা ক্রমশ সংঘবদ্ধ হতে থাকে, যৌথভাবে তারা তাদের দাবী উত্থাপন করতে বাধ্য হয়। এরই ফলে দেশে দেশে শ্রমিক বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে, শ্রমিক সংঘ গঠিত হয়, বাঁচবার প্রশ্নে মেহনতী মানুষদের ঐক্যবোধ আরও তীক্ষ্ণ হয়ে আসে।

Trade Union বা শ্রমিক সংগঠনের ইতিকথা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে কয়েকটি শ্রমিক সংঘ গড়ে উঠেছিল এবং তারা রাষ্ট্রের স্বীকৃতিও লাভ করেছিল। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে তাঁদের সংখ্যা ও কার্যকারিতা অনেক বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকদের দাবী আদায়ের জন্য এগুলো হলো একমাত্র শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। মালিক পক্ষের যদি অর্থ থাকে, শ্রমিকদের থাকবে ঐক্যবোধ। মালিক বনাম শ্রমিকদের এই সংঘর্ষের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য এবং শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের জন্য বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই কতকগুলি আইন পাশ করেছে। কিন্তু এতেও শোষিত শ্রমিকশ্রেণী মালিক পক্ষের শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। তাই শ্রমিক শ্রেণীর দাবী, রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকার লাভ। শ্রমিকদের এই দাবী থেকেই সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি।

সমাজতন্ত্রবাদের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাই বলা হয় যে, [ There are as many varieties of socialism as there are socialists ] পৃথিবীতে যতজন সমাজতন্ত্রী আছেন, ততো রকম সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যাও রয়েছে, কিন্তু কয়েকটি মৌলিক দাবীতে তাদের মতামত অভিন্ন।

প্রথমত, শ্রমজীবীদের স্বার্থে তাঁরা সকল প্রকার পুঁজিবাদের অবসান কামনা করেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী।

কিন্তু উদ্দেশ্য এক হলেও কি ভাবে যে, ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর সে সম্পর্কে সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ রয়েছে। ইংল্যাণ্ডের শ্রমজীবী মানুষরা মনে করে, শাসন-তান্ত্রিক ব্যবস্থার সংস্কার করে উৎপাদন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেই পুঁজিবাদের কুফল দূর হবে। আবার ফ্রান্স ও ইটালীর Syndicalists সমাজতন্ত্রীরা বলেন, কলকার-খানায় শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারাই সাম্যবাদের প্রবর্তন সম্ভবপর। সবশেষে, সাম্যবাদীগণ বা Communistsরা অভিমত পোষণ করেন, বিপ্লবের মাধ্যমেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিলোপ করে শ্রমিক শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এলে প্রকৃত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের প্রবর্তন ঘটবে।

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে যে সমস্ত সমাজ বিজ্ঞানী সমাজতন্ত্র-বাদের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে রবার্ট আওয়েন [ Robert Owen ], সেণ্ট সাইমন [ St. Siman ], প্রুধঁ [ Proudhon ] এবং ফুরিয়ার [ Fourier ] এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁরা বৈজ্ঞানিক সত্য ও বাস্তবতার চাইতে আবেগ ও আদর্শকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সর্বহারাদের প্রতিষ্ঠিত করতে কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গঠনের কথা তাঁরা চিন্তা করেন নি। তারা তাই অবাস্তব আদর্শে বিশ্বাসী সমাজ-তন্ত্রী' [ Utopian Socialists ]

সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পথ নির্ণয়ে প্রথম সক্ষম হলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ বিজ্ঞানী কার্ল মার্কস্ [ Karl Marx ]। তাঁর প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদ সাম্যবাদ বা Communism নামে পরিচিত। কার্ল মার্কসের এই কীর্তি যুগ ও কাল অতিক্রমকারী। ধনতন্ত্র তথা

শোষণতন্ত্রের বিনাশ করে কমিউনিজমের জয়ে ইতিহাসের অমোঘ গতি—এ কথা মার্কস বিজ্ঞানসিদ্ধ ভাবে প্রমাণ করে সমাজতন্ত্রকে মানব কল্যাণের ফাঁকা স্বপ্ন থেকে একটা বিজ্ঞানে পরিবর্তন করেছেন। সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত রয়েছে মার্কসবাদের মূলগত আদর্শ। এটা হচ্ছে বিশ্বের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের বিজ্ঞান।

কার্লমার্কসের জীবন-কাহিনী বিচিত্র এবং তাও আমাদের কাছে কম শিক্ষপ্রদ নয়। তাঁর জন্ম প্রুসিয়ার রাইন প্রদেশের টিয়ের শহরে এক আইন ব্যবসায়ীর পরিবারে। এই স্থানটি ছিল খুবই শিল্পোন্নত। তাই ধনতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিয়েছিল বিশাল এক নতুন শ্রেণী—সর্বহারাদের দল।

মার্কস তাঁর স্নাতক-উপাধি লাভ করেন একটি বিচিত্র প্রবন্ধ রচনা করে,—জীবিকা বাছাই করার প্রাক্কালে একজন যুবকের চিন্তা [ Reflections of a youth upon choosing a profession ]। এই প্রবন্ধেই যেন মার্কস নিজের আগামী জীবনের আদর্শ ও বিশ্বাসের ছবি এঁকেছেন,—স্বার্থহীন ভাবে—সর্বহারাদের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতে চান তিনি!

ট্রিয়ের জিমনাশিয়ামে স্নাতক উপাধি লাভের পর মার্কস প্রথমে বন ও পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের পাঠ গ্রহণ করেন। আইনের সাথে সাথে দর্শন ও ইতিহাসেও তাঁর গভীর একাগ্রতা দেখা গেল।

মার্কসের যখন আবির্ভাব, ইউরোপে ধনতন্ত্র তখন তুঙ্গে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে প্রভেদ হয়ে দাঁড়িয়েছে আকাশস্পর্শী, কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের দীক্ষা তারা তখনও পায় নি। শোষিতদের প্রতিবাদ সে সময় প্রায় চেতনাহীন ও নীরব। বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীরা পরস্পর হাত ধরাধরি ক'রে দাঁড়িয়েছে,—সর্বহারাদের নিছক উৎপাদনের উপাদান হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে।

এমন এক পরিবেশের মধ্যে তীক্ষ্ণধি মার্কস্ তাঁর চিন্তার

আয়ুধকে খুঁজে পেলেন। ছাত্রকালেই দার্শনিক হেগেলের রচনার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু মার্কস্ হেগেলের ভাববাদী চিন্তাধারার সামিল হতে পারলেন না। হেগেল যেখানে নিরিশ্বরবাদ ও বস্তুবাদকে আক্রমণ করেছেন, মার্কস্ সেখানে উক্ত দুই চিন্তাধারাকেই প্রতিষ্ঠিত করবার বিশেষ প্রয়াস পেয়েছেন। ১৮৪১ সালের এপ্রিল মাসে মার্কস্ জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে [ Jena University ] তাঁর গবেষণা পেশ করে 'ডক্টর অব ফিলসফি' উপাধি লাভ করেন।

নিজের স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশে অসুবিধা হবে জেনে মার্কস প্রুসিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা গ্রহণ করতে চাইলেন না। Rheinische zeitung নামে এক জনপ্রিয় প্রগতিসম্পন্ন পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনি। এই পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা দ্রুত প্রচারিত হতে থাকে। সমগ্র জার্মানী ব্যাপি যেরকম রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়ন চলছিল মার্কসের তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ সেখানে ক্রমশই সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাঁর একাধিক ধারাবাহিক রচনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো,—জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থ তুলে ধরলেন তিনি।

মার্কস কেবল জার্মানীর দুঃস্থ জনগণের কথাই ভাবতেন না, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো উন্নত দেশে কেন সর্বহারাদের এত সংখ্যাধিক্য ও লাঞ্ছনা, তারও কারণ নির্ণয়ের প্রয়াস পেতেন। তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, ইউরোপের একাধিক উন্নত দেশে বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের ঝড় ক্রমশই দানা বাঁধছে।

Rheinische zeitung শীঘ্রই সরকারের ঘুম কেড়ে নিলো। প্রুশিয়ান সরকার সেন্সর ব্যবস্থা কঠোর করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সরকারী হুকুমে মার্কসের ঐ মুখপাত্রটির প্রকাশনা বন্ধ হ'য়ে গেলো।

মার্কস এবারে জার্মানী ত্যাগে উদ্যোগী হলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, বিদেশে থেকেই গোপনে তিনি তাঁর বৈপ্লবিক রচনাগুলি

জার্মানীর যুব সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। জর্মানী পরিত্যাগের পূর্বে মার্কস্ তাঁর বাল্য প্রণয়নী জেনী ভন ওয়েষ্টফালেনকে বিয়ে করলেন।

হেগেল এবং ফঁয়েরবাকের দর্শন পাঠ করে কার্ল মার্কস্ নিজের চিন্তাধারা ও বক্তব্যকে আরো বলিষ্ঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ করে তুললেন। "এই ভাবে তাঁর রচনায় প্রতিষ্ঠিত হলো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ ও আধুনিক বস্তুবাদ, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে যার অপরিমেয় গভীরতা এবং যা বস্তুবাদের পূর্বতন ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক বেশী সঙ্গতিপূর্ণ!"*[৫]

১৮৪৩ সালে মার্কস্ এই প্যারিস শহরে এসেছিলেন। ফরাসী রাজধানীর বিদগ্ধ মহলে পরিচিত হয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা আরো বহুমুখী হয়ে ওঠে। শহরের বাইরে শ্রমিকদের সাথেও তিনি প্রায়ই মেলামেশা করতেন। জর্মান শ্রমজীবীদের গোপন সমিতি 'লীগ অব দি জাস্ট'-এর নেতাদের সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। এখানেই তাঁর সাথে পরিচয় হয় ফরাসী সমাজতন্ত্রী পীয়ের লেরো, লুই ব্ল্যাঁ, ক্যাবেট এবং প্রুঁধের সাথে। মার্কস্ বুর্জোয়া অর্থনীতির মূল কাঠামোকে অনুধাবন করবার জন্য অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো এবং অন্যান্যদের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন।

এই সময়েই মার্কস্ তাঁর প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে নিজেকে বিপ্লবী ভাবধারায় ভাবিত দার্শনিক রূপে পরিচিত করে তোলেন। 'ইহুদী সম্পর্কিত প্রশ্ন' On Jewich Question প্রবন্ধে বুর্জোয়া বিপ্লবের সাথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভেদটি স্পষ্ট ভাবে চিত্রিত, '... এ কথা সত্য যে, সমালোচনার অস্ত্রদ্বারা অস্ত্রের সমালোচনা [ সশস্ত্র অভ্যুত্থান ] কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, সামাজিক শক্তিকে সামাজিক শক্তি দ্বারাই নির্মূল করতে হবে, আর যখন তত্ত্বটি জনসাধারণকে প্রভাবান্বিত করে তখন তত্ত্বও একটি সামাজিক শক্তি রূপে দেখা দেয়।'*[৬]

* কার্ল মার্কস্ : ই স্তোপানোভা।৫

মার্কস অ্যাণ্ড এ্যাঙ্গেলস্' ওয়ার্কস : রাশিয়ান এডিশন।৬

সর্বহারাদের স্বপক্ষে তাঁর আ-জীবন সংগ্রামে কার্ল মার্কস একজন মহান বন্ধু ও সহকর্মী লাভ করেছিলেন। তিনি হলেন ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্। এঙ্গেলসের সাথে মার্কসের প্রথম দেখা ১৮৪২ সালে কলোন শহরে। এঙ্গেলস্ Reinsche zeitung পত্রিকা কার্যালয়ে এসেছিলেন। সেখানেই পরিচয়ের সূচনা, ইংল্যাণ্ডে অবস্থান কালে সেই সম্পর্ক দাঁড়ালো প্রগাঢ় বন্ধুত্বে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এঙ্গেলসের লিখিত প্রবন্ধগুলিতে মার্কস তাঁরই বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে পেলেন।

মার্কস আর এঙ্গেলসের মধ্যে সেই যে বন্ধুত্বের সেতু রচিত হলো তাতে কোনদিন মরচে ধরেনি, কোনদিন ভেঙ্গে পড়েনি। পৃথিবীর ইতিহাসেও এই দুই চিন্তানায়কের মিলন এক কথায় অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন।

আবেগে ভি, আই লেনিন তাই বলেছিলেন, "...মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব সম্পর্কে প্রাচীন কাহিনীগুলিতে অনেক মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু ইউরোপের প্রলেতারিয়াত শ্রেণী এইকথাই জানাবে যে, সর্বহারার দর্শন ও বিজ্ঞানের সৃষ্টিকর্তা হলেন এমন দুইজন পণ্ডিত ও যোদ্ধা, যাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক অতীত ইতিহাসের সর্বাধিক হৃদয়স্পর্শী মানবিক বন্ধুত্বকেও ছাপিয়ে গেছে।..."

প্যারিসে বসে মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ তাঁদের ক্ষুরধার চিন্তাধারায় রচনা করলেন এক বৈপ্লবিক প্রবন্ধ The Holy family, & the critique of critical critiqued. Against Bruno and co. "পবিত্র পরিবার অথবা সমালোচনামুলক সমালোচনার সমালোচনা —ব্রুনো বয়ার কোম্পানীর বিরুদ্ধে"

দুই বন্ধু এখানে হেগেলবাদী বয়ার ভ্রাতাদের [ The Brothers Bauer ] বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা এখানে বিধৃত। শ্রমিকশ্রেণী শুধু মাত্র অসহায় নিপীড়িত জনসমষ্টি নন, তাঁরা হচ্ছেন বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সক্ষম এক সক্রিয় সামাজিক শক্তি।

আত্মমুখী ও ভাববাদী দার্শনিকদের ধারণা, শুধু মাত্র কয়েকজন বিরল ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই ইতিহাস সৃষ্টিতে সক্ষম। এই 'বীরেরা' ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেন। কিন্তু মার্কস এঙ্গেলস্ বললেন, ইতিহাসের আসল স্রষ্টা জনগণ, সময়ের গতিপথে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ ক্রমশই সচেতন হয়ে উঠেছে।

মার্কস এঙ্গেলসের এই সমস্ত প্রবন্ধগুলিকে কিন্তু সুবিধা বাদীরা হজম করে নিতে রাজি হলো না। প্যারিসের অধিকাংশ পত্রিকা তাঁদের রচনা প্রকাশে অস্বীকার করলো। ওদিকে প্রুসিয়ান সরকারও ফরাসী সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, এই বিপ্লবী লোকটিকে ফ্রান্সে স্থান না দিতে। ১৮৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কস্ তাই ব্রুসেলস্-এ এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং প্রুসিয়ান সরকার তাঁরে বিচারের জন্য অন্যকোন উপায় অবলম্বন করতে পারে ভেবে মার্কস প্রুসিয়ার নাগরিকত্ব ত্যাগ করলেন।

এ সময় এঙ্গেলস্ লিখলেন তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' [ Condition of the working class in England ]। মার্কসের আহ্বানে তিনিও ব্রুসেলস্-এ চলে আসেন। ব্রুসেলস্-এর আবাসে বসে দুই চিন্তানায়ক আর একটি গ্রন্থ রচনায় হাত দিলেন,—'জার্মান মতাদর্শ'[ German Ideology ]। এখানে হেগেলবাদীদের সমস্ত দুর্বলতা ও নষ্টামির মুখোশ তাঁরা খুলে ফেললেন। পেটি-বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল ও কল্পাশ্রয়ী লোকদের বিপ্লব নিয়ে বিলাসিতাকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করা হলো। কিন্তু মার্কস এঙ্গেলসের সেই বই কোন প্রকাশকই ছাপতে রাজি হলেন না। অথচ, এঁদের এমন আর্থিক সঙ্গতি ছিল না, যার দ্বারা এই বইখানা প্রকাশ ও প্রচার করা সম্ভব। 'জার্মান মতাদর্শ' প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশিত হয় [ রুশ অনুবাদে ] ১৯৩২ সালে রাশিয়ায়।

মার্কসের পরিপক্ক চিন্তাধারা এ সময় ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে

বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এই বিশ্লেষণ ইতিহাসকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করলো। ইতিহাসের গতিপথে কি ভাবে দাস, উপজাতি সামন্ত ও বুর্জোয়াদের সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকার একের পর এক হস্তান্তরিত হচ্ছে, তাই মার্কস নির্ণয় করলেন। মার্কস প্রমাণ করলেন, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পতনের আর বেশী দেরী নেই, আগামী বিপ্লব হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তা সর্বহারাদের নেতৃত্বে। সেই জন্যই সর্বহারা শ্রেণীর প্রথমেই রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করতে হবে।

মার্কস্ এরপর আর একটি কাজে হাত দেন। ফরাসী সমাজ বিজ্ঞানী প্রুঁধের বিখ্যাত রচনা "দারিদ্র্যের দর্শন" [ Philosophy of Poverty ] কে আক্রমণ করে লিখলেন তাঁর বস্তুনিষ্ঠ গ্রন্থ "দর্শনের দারিদ্র্য" [ Poverty of Philosophy ]। দ্বন্দ্ববাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিকাশে 'দর্শনের দারিদ্র্য' আর একটি বড় ধাপ। বুর্জোয়া অর্থতত্ত্বের দুর্বলতা ও ভ্রান্তিকে তিনি এখানে চিত্রিত করেছেন। শোষণ, দারিদ্র্য, সংকট,—এরাই হচ্ছে ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। একমাত্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সমূল বিনাশ সাধন করেই এই সমস্ত অসহনীয় অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভবপর।

মার্কস্ ও এঙ্গেলসের এ সমস্ত রচনা তখন যথেষ্ট আলোড়ন আনতে শুরু করেছে। ১৮৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কস্ ও এঙ্গেলসকে ইউরোপের বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠন "League of the Just"-এর নেতৃবৃন্দ এই সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগে আহ্বান জানালেন। মার্কস ও এঙ্গেলস সানন্দে এই শ্রমিক সংগঠনের সাথে নিজেদের যুক্ত করলেন। তাঁদের উৎসাহে এর নাম পরিবর্তিত করে রাখা হলো, 'কমিউনিস্ট লীগ' [ Communist League ]। "সকল মানুষ ভাই ভাই"—এই পুরানো আদর্শের পরিবর্তে মার্কস ও এঙ্গেলস্ নতুন শ্লোগান তুললেন,—"দুনিয়ার শ্রমিক এক হও !"

কমিউনিস্ট লীগের কার্যধারা ও নিয়মাবলী রচনা করেছিলেন এঙ্গেলস। তিনি প্রথমেই লিখলেন, "লীগের উদ্দেশ্য হচ্ছে বুর্জোয়া-

দের উচ্ছেদ করা, সর্বহারাদের শাসন প্রবর্তন করা, শ্রেণী বিরোধের উপর কায়েমী পুরাতন, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার সমূল বিনাশ সাধন করা এবং শ্রেনী হীন, শোষণমুক্ত ও ব্যক্তিগত-সম্পত্তিহীন নতুন সমাজ গঠন করা।"

প্রত্যেক প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সমর্থন জানাবার প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হলো কমউনিস্ট লীগে। ১৮৫৭ সালে লীগের দ্বিতীয় অধিবেশনে অনেক বিতর্কের পর মার্কস ও এঙ্গেলসের বক্তব্য কে গ্রহণ করা হয় এবং তাঁদের উপরই ম্যানিফেস্টো বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা পত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হলো।

মার্কস ও এঙ্গেলসের কালজয়ী রচনা 'কমিউনিস্ট ইশ্তেহার' ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনের ছাপাখানা থেকে মুক্তি পায়। এটাই হচ্ছে কমিউনিজমের আগামী কর্মসূচীর বৈজ্ঞানিক দলিল। লেনিন এর প্রসঙ্গে লিখেছেন, "প্রতিভার স্পষ্ট ও দীপ্ত স্ফুরণ দেখা গেলো এই ইশ্তেহারে। এটি নূতন বিশ্বদৃষ্টির, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মূলগত ভাব রচনা করেছে—যার মধ্যে সামাজিকতা বিস্তারের গভীর মতবাদ ডায়েলেকটিকস্ আলোতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।'

সর্বহারা শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা মার্কস ও এঙ্গেলস বর্ণনা করেছেন। শ্রেণী সংগ্রামের পথে প্রলেতেরিয়ত বিপ্লব নেমে আসবে। সর্বহারারা বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করবে, ধণতন্ত্রের কবর খনন করবে। প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণীহীন সমাজ। লেনিন লিখেছেন, "সংগঠিত সর্বহারারা চালাবে রাষ্ট্র—এই হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব।"

কার্যসূচী ছাড়াও ইশ্তেহারে মার্কস্-এঙ্গেলস্ লিপিবদ্ধ করেছেন, কিভাবে সর্বহারা পার্টি বুর্জোয়াদের পরাস্ত করতে পারবে। কমিউনিস্টরা শ্রমিকশ্রেণীর আশু দাবি ও স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করবে, কিন্তু ভবিষ্যৎ আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির প্রতিও তাদের সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিটি সংস্থা ও কার্যধারার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে সংগ্রাম চালিয়ে

যেতে হবে। ইশ্‌তেহারের একেবারে প্রান্তিক অনুচ্ছেদে মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌ সর্বহারাদের বিজয়-বার্তা যেন ঘোষণা করেছেন :

"কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভয়ে ধনতান্ত্রিক শাসকশ্রেণী কম্পিত হোক! একমাত্র শৃংখল ব্যতীত সর্বহারাদের হারাবার কিছুই নেই। তাদের দ্বারা বিজিত হবে সারা জগৎ।"

মার্কসের এই অতুলনীয় দর্শনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেলিন বললেন, "মানুষের চিন্তালব্ধ যা কিছু ফসল আজ পর্যন্ত হয়েছে তিনি [ কার্ল-মার্কস ] তাকে নতুন রূপে বিধৃত করেছেন, শ্রমিক আন্দোলনের কষ্টি পাথরে যাচাই হয়েছে সেই দর্শন, এবং তিনি এমন এক উপলব্ধ সমাধানে গিয়ে পেঁাছেছেন যা, বুর্জোয়া সংকীর্ণতার দ্বারা জনমতের চিন্তাধারাকে বিষাক্ত করে তোলে নি। বুর্জোয়া সংস্কারের গণ্ডিবদ্ধতায় আবদ্ধ থাকলে তাঁর তত্ত্ব কোনদিন পথ নির্ণয়ে সক্ষম হতো না।"*[৭]

মার্কস্‌ এঙ্গেলসের কমউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশের সময়েই ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে ফ্রান্সে আর একবার বুর্জোয়া বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। এর ঢেউ গিয়ে লাগছে জার্মানীতে, অষ্ট্রিয়াতে ও ইটালীতে। জার্মান কবি হের ওয়েগ [ Herr Wegh ] তখন প্যারিসে। সেখানে তিনি প্রবাসী জার্মানদের নিয়ে এক মুক্তি ফৌজ গড়ে তুললেন। ওয়েগের পরিকল্পনা ছিল, মুক্তি ফৌজ নিয়ে জার্মানী আক্রমণ করবেন এবং তাঁর প্রয়াসেই জার্মানীতে বিপ্লব সফল হবে।

মার্কস ওয়েগের এই ভাবধারার তীব্র সমালোচনা করলেন। বললেন, এ ধরণের বে-পরোয়া হঠকারিতায় মেতে না ওঠে জার্মানীর শ্রমজীবী মানুষদের সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে তোলা উচিত।...

১৮৪৮ এর এপ্রিল মাস। জার্মানীতে তখন বিপ্লবের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। মার্কস ও তাঁর সহকর্মীরা এসে উপস্থিত হলেন জার্মানীর কোলান শহরে। মার্কস্‌ বুঝলেন, শ্রমিকশ্রেণী খুব

* Marxism and the State : V. I. Lenin. ৭

* Selected works : V. I. Lenin. ৭

দুর্বল, অসংগঠিত ও রাজনৈতিকভাবে নেহাৎ অপরিপক্ক। সে সময়ে এদের নিয়ে সর্বহারা দল গঠন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, সম্পূর্ণ অসম্ভব। সর্বহারাদের সেই সংগঠন গড়ে তোলবার জন্য মার্কস এ সময় পেটি বুর্জোয়াদের সাথেও হাত মিলিয়েছিলেন। বিপ্লবের প্রথম স্তর অতিক্রম করতে হলে এই পেটি বুর্জোয়াদের সহায়তা দরকার,—মার্কস্ তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এ সময় মার্কসের সম্পাদনায় নিউ রাইনিশে জিতাং [ New Rheinische Zeitung ] জার্মানীতে দারুণ জনপ্রিয় পত্রিকা হয়ে ওঠে। এটাই হলো মার্কস্-এঙ্গলস্‌এর চিন্তাধারা প্রচারের সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

বিপ্লবের শত্রুদের চিনে রাখবার জন্য ও তাদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা মার্কস্ বলেছেন। জনগণের বিপ্লবী এক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথে সমস্ত বাধা চূর্ণ করতে তিনি আহ্বান জানালেন।...১৮৫৮ সালের জুন মাসে প্যারিসে প্রথম ও প্রকৃত অর্থে শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটে। মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ এই শ্রমিক অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন এবং একে বুর্জোয়া ও সর্বহারাদের মধ্যে প্রথম সংগ্রাম বলে অভিহিত করলেন।

অবশ্য ফরাসী শ্রমিকদের সেই প্রয়াসকে পদদলিত করা হলো। বুর্জোয়া-উস্কানিতে এখানে সেখানে দেখা দিলো নোংরা প্রতি বিপ্লব। মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ এ সময় দিবারাত্র পরিশ্রম করেছেন জনগণকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে। নেমে এলো বুর্জোয়াদের প্রচণ্ড জঙ্গী হামলা। নিত্য নতুন আইন পাশ করে, গণতন্ত্রের নামে ভাওতা দিয়ে, গণ-স্বাধীনতার ও গণ-ইচ্ছারই কণ্ঠরোধ করা হলো। মার্কসের বর্তমান আবাস কোলোন শহরে পুলিশী নির্যাতন চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে যায়। শ্রমিকদের নিরস্ত্র করা হয়, তাদের বিভিন্ন ইউনিট গুলিকে ভেঙ্গে ও বিচ্ছিন্ন করে শ্রমিক-আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করা হয়, প্রতিবিপ্লবীদের মদত নিয়ে লেলিয়ে দেয় সর্বহারাদের পিছনে, শ্রমিকদের আলেচনা সভায়, সর্বহারাদের মিলন-স্থানগুলিতে গুণ্ডামী ও হামলাবাজী চলতে থাকে। মার্কস্‌এর

সম্পাদিত সর্বাধিক জনপ্রিয় পত্রিকা নিউ রাইনিশে জিতাং-এর প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হলো। গ্রেপ্তার হবার আশঙ্কায় এঙ্গেলস্ কোলোন থেকে সরে এলেন।

মার্কস্ কিন্তু এতেও বিচলিত হলেন না। শীঘ্রই জনতার প্রতিবাদ আবার সোচ্চার হয়ে ওঠে। সেই গণ-আন্দোলনের চাপে পড়ে প্রুসিয়ান সরকার আবার নিউ রাইনিশে জিতাং এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হন।

কিন্তু প্রুসিয়ান সরকার বুঝতে পারলেন, কার্ল মার্কসের চিন্তাধারাই জনগণের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আসল হেতু। সুতরাং, যেমন করেই হোগ মার্কস্‌কে জার্মানীর মাটি থেকে আবার তাড়াতে হবে। প্রুসিয়ান সরকার ঘোষণা করলেন, যেহেতু কার্লমার্কস্ ১৮৪৫ সালে প্রুসিয়ান সরকারের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছিলেন, সুতরাং তিনি এই দেশে 'বহিরাগত' এবং তাঁকে অবিলম্বে এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। মার্কস্ বুঝলেন, তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, তাতে আর পত্রিকা চালানো সম্ভব নয়। ১৮৪৯ সালের ১৯শে মে নিউ রাইনিশে জিতাং পত্রিকার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। সমস্ত সংখ্যাটি বিপ্লবের চিহ্ন লাল কালিতে ছাপা হয়েছিল। মার্কস্ তাঁর শেষ সম্পাদকীয়তে কোলানের শ্রমিক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে লিখলেন।

"আপনাদের বিদায় অভিনন্দন জানাতে গিয়ে নিউ রাইনিশে জিতাং পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে! সর্বদা এবং সকল ক্ষেত্রেই আমাদের শেষ কথা হবে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি!"

এঙ্গেলস্ সে সময় প্রকাশ্যে প্রতি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদ ঘোষণা করে, পালাটিনেটে সর্বহারাদের নিয়ে তিনি দল গঠন করলেন। এবং প্রতি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কয়েকটি সশস্ত্র সংঘর্ষে স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেন।

মার্কস্ জার্মানী থেকে এলেন প্যারিসে। কিন্তু ফরাসী সরকারও তাঁকে বরদাস্ত করতে রাজি নন। তাই প্যারিস ত্যাগ করে কার্ল মার্কস চলে এলেন লণ্ডনে। লণ্ডনে শুরু হলো মার্কসের নতুন জীবন সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের তীব্রতম দিনগুলিতে মুহূর্তের জন্যও মার্কস্ নিজের কার্যধারা থেকে দূরে সরে যান নি। লণ্ডনে তাঁর নতুন জীবনের সূত্রপাত এবং আমৃত্যু তাঁর এখানেই অবস্থান।

লণ্ডন থেকে মার্কস্ বললেন, ১৮৪৮ এর বিপ্লব থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে যে, সর্বহারাদের বিপ্লবকে সফল করতে হলে, কৃষকদের এসে দাঁড়াতে হবে শ্রমিকদের পাশটিতে। তাদেরকেও স্বীকার করে নিতে হবে সর্বহারাদের নেতৃত্ব।

সর্বহারার একনায়কত্ব সম্পর্কে মার্কস্ এ সময় একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বললেন, "আজকের সমাজে একাধিক শ্রেণী-গুলি পাশাপাশি অবস্থান করছে। তাদের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাদের কথা আমার আগে অনেকেই বলে গেছেন। বহু পূর্বে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকগণও এটি লক্ষ্য করে গেছেন। কিন্তু আমি যা ভাবছি, তা হলো, (১) উৎপাদনের ক্রমোন্নতির একটি ঐতিহাসিক পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গি ভাবে অবস্থান করে। (২) পরবর্তী শ্রেণী-সংগ্রামে সর্বহারার এক নায়কই চূড়ান্ত পরিণতি। (৩) সকল শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটিয়ে এক শ্রেণী হীন, শোষণ হীন, সমাজ গঠনের পথে এই একনায়কত্ব পরিচালিত হবে।"

১৮৪৯ সালে কার্ল মার্কসের জীবনে দুঃসহ তিক্ততা বয়ে আনলো। বিপ্লবের তখন পরাজয় ঘটেছে। শ্রমিক নেতাদের উপর অত্যাচারের সীমা নেই। শত্রুরা মার্কসের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। চরম অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন কার্ল মার্কস্ ও তাঁর পরিবার। ইংল্যাণ্ডের কোন সংবাদ পত্র বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, প্রতিভাবান ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে রাজি হলো না।

মার্কস্ পরিবারকে অনাহারে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে এ সময় এঙ্গেলস্ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এঙ্গেলস্ তখন ম্যাঞ্চেস্টারে এক অফিসে কাজ করেন। যা বেতন পান, তার অধিকাংশই ব্যায় করতে হয় বন্ধু ও তাঁর পরিবারকে বাঁচাবার জন্য।

মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ এই সময়ে পরস্পরের মধ্যে চিঠি পত্রের মাধ্যমে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বকে পরিস্ফুট করে গেছেন।

মার্কস্ স্থির করলেন, অর্থতত্ত্বের উপর লেখা তাঁর গবেষণা তিন খণ্ডে ১৮৫১ সালের মধ্যেই শেষ করে ফেলবেন। কিন্তু পারিবারিক ঝড়-ঝাপটা ও আর্থিক দৈন্যতা তাঁর উদ্দেশ্যের পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ভয়াবহ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে কার্ল মার্কস্ ও তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী জেনীকে চরম মূল্য দিতে হলো। লণ্ডনে বসবাস কালে পর পর অনাহারে ও রুগ্নতায় তাঁদের তিনটি সন্তান মারা গেল। সবচেয়ে মর্মান্তিক আঘাত এলো শেষ জীবিত সন্তান পুত্র এডগারের [ প্রিয়নাম মাশ্চ ] অকাল মৃত্যুতে।

পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর গভীর বেদনায় মার্কস্ এঙ্গেলস্কে লিখলেন।

৮* "বন্ধু, আমার জীবনে অনেক দুঃসময় এসেছে, কিন্তু প্রকৃত বেদনা যে কি তা এখন আমি বুঝতে পেরেছি। এই ভয়ঙ্কর কষ্টের দিনগুলিতে তোমার উষ্ণ বন্ধুত্বই আমার একমাত্র সান্ত্বনার উৎস এবং আমি এমন অবস্থাতেও উৎসাহ পাই, যখন ভাবি, আমরা দু'জনে একত্রিত হয়ে এমন কিছু করতে পারব যা, জগতের প্রয়োজনে আসবে।"

ভারতবর্ষ, চীন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণীর ভবিষ্যৎ—ইত্যাদি বিষয় বস্তুর উপর মার্কস্-এঙ্গেলসের অসংখ্য প্রবন্ধ আষাঢ়ের নব ধারার মতো নেমে আসতে থাকে।

জীবন যুদ্ধে লাঞ্ছিত, আহত হয়েও মার্কস্ কখনো অবনমিত হন নি। তিনি তাঁর আদর্শ নিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

অধ্যায়নকে তপস্যা জেনেছেন, সর্বহারাদের জন্য রচিত তাঁর দর্শনে যেন অগ্নিবান নিক্ষেপিত হয়েছে বুর্জোয়াদের বক্ষস্থল লক্ষ্য করে।

ভারতবর্ষে ইংরাজদের সাম্রাজ্যবাদ ও তার ফলে এ দেশের জনগণের নিদারুণ দারিদ্র্য লক্ষ্য করে মার্কস্ সক্রোধে ইংরাজ সরকারকে আক্রমণ করেছেন। ১৮৫৭ সালে ভারতীয় সিপাহীদের মুক্তি-যুদ্ধকে তিনি তাই সমর্থন জানিয়েছেন। আরো বলেছেন, বৃটেনে সর্বহারা শাসন ব্যবস্থা যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, অথবা ভারতীয়রা পর্যাপ্ত শক্তি সংগ্রহ না করছে, ততোদিন ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও শোষণ বন্ধ হবে না।

ইন্দো-চীন যুদ্ধ ও তাইপিং বিপ্লবের উপরও মার্কসের মূল্যবান প্রবন্ধ এ সময় রচিত হয়।···

এই সময় মার্কস্ তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' রচনায় হাত দিয়েছেন। ১৮৬৭ সালে সেই পাণ্ডুলিপি নিয়ে মার্কস প্রকাশকদের দরবারে গিয়ে হাজির হন। প্রথম খণ্ডটি তিনি প্রুফ দেখবার সময় বার বার পরিবর্তন করেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে বন্ধুবর এঙ্গেলস্কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মার্কস্ লিখলেন!

*"অবশেষে প্রথম খণ্ড রচনা শেষ হলো। এর জন্য আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা তোমার জন্য নিবেদিত হলো। আমার জন্য তোমার অমন আত্মত্যাগ না থাকলে এই বিরাট রচনার তিনটি খণ্ড আমি কোন মতেই শেষ করতে পারতাম না।

বন্ধু আমার, তোমাকে আলিঙ্গন করি, আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করো, অসংখ্য ধন্যবাদ।"*৮

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হলেও পরের দুটি খণ্ড রচনা করতে কিন্তু মার্কসের অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল।

মার্কস্ তাঁর জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত 'ক্যাপিটাল' রচনায় অমানুষিক পরিশ্রম করে গেছেন। ইতিহাস, দর্শন, প্রযুক্তি-বিদ্যা, প্রকৃতি-বিদ্যা, রাশিয়ার ভূমি-ব্যবস্থা, বৃটেনের শ্রম-নীতি—ইত্যাদি

৮* Selected Letters : Marx and Angles.

সমস্তই তিনি গভীর আগ্রহের সাথে পাঠ করেন। তার জ্ঞানের গভীরতাকে পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে আজও সাধ্যাতীত।

মার্কসে্র এই অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্পর্কে পল লাফার্গ [ Paul Lafargue ] মন্তব্য করেছেন, "মার্কসে্র মস্তিষ্ক ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানের গভীর তথ্যে অবিশ্বাস্যরূপে পূর্ণ ছিল। তাঁর চিন্তাপূর্ণ রচনায় আমরা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাই। তাঁর মস্তিষ্ক ছিল বন্দরে অপেক্ষমান যুদ্ধ জাহাজের মতো, চিন্তা জগতের যে কোন ক্ষেত্রে তা ধাবিত হবার জন্য প্রস্তুত।..."*৯

মার্কসের মৃত্যুর পর 'ক্যাপিটাল' কিছুটা অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। সুযোগ্য বন্ধু এঙ্গেলস্ তা সযত্নে সম্পাদিত করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত করেন। ..মার্কসে্র এই রচনার দর্পণে আমরা ধরতে পারলাম, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বের ধারা; ধনতন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আরো তীব্রতর হ'য়ে আসছে।...

বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীদের পথ নির্দেশ কালে মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ সেই সমস্ত দেশের শ্রমিকদের অবস্থা ও বিপ্লবের সম্ভাবনা পর্যালোচনা করে দেখতেন। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মার্কস্ ১৮৭০ সালেই সিদ্ধান্তে এলেন, প্রথম সফল কমিউনিস্ট বিপ্লব ঘটবে সোভিয়েট রাশিয়ায়। এই বিপ্লব বিশ্বের অন্যত্রও সর্বহারাদের প্রেরণা যোগাবে। রাশিয়া সম্পর্কে অসংখ্য দলিল ও পুস্তকাদি পাঠ করে মার্কস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।...জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে মার্কস্ সেই রুশ বিপ্লবের বাস্তব চিত্রাঙ্কণ করতে থাকেন, বিশ্ব ইতিহাসের দিক-পরিবর্তনকারী চিহ্ন হবে সেই বিপ্লব।

অমানুষিক পরিশ্রমে ও আথিক অনটনে মার্কসে্র স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। ১৮৮১ সালের ২রা ডিসেম্বর প্রিয়তমা পত্নী জেনী মৃত্যুমুখে পতিত হলে মার্কস আরো ভেঙ্গে পড়েন।

৯* Memory on Marx and Angles : Paul Lafargue.

দিন দিন তাঁর অবস্থা আরো খারাপের দিকে যায়। প্লুরিসি ও ব্রঙ্কাইটিস তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রকে প্রায় শেষ করে আনে। শারিরিক শক্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে, অবশেষে ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ তিনি নিজের পড়বার ঘরেই টেবিলের সামনে ঝুঁকে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এঙ্গেলস্ বেদনাবিধুর আবেগে লিখলেন, "আমাদের দলের মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনটি আর চিন্তা করবে না, আমার জানা সর্বাধিক শক্তিশালী হৃদয় আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে।"*৯

মার্কসের কবরের উপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ভাষণ দিলেন এঙ্গেলস্। সবশেষে তিনি উচ্চারণ করলেন, "তাঁর নাম ও কাজ যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রেরণা দেবে।"

মার্কস্ ও এঙ্গেলসের তিরোধানের পর তাঁদের দর্শন বিশ্ব-আঙ্গিনায় দিনের পর দিন ভাস্বর হয়ে উঠেছে। সর্বহারাদের সার্থক বিপ্লবে এই দর্শনকে সৃজনশীলতায় আরো সমুন্নত ক'রে তোলবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মার্কস্‌বাদের যাথার্থ অনুগামী লেনিন বিপ্লবের সময় সেই দায়িত্ব পালন করেন। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে নতুন কোন ব্যবস্থা সংযোজিত ক'রে তিনি মার্কসের অবদানকে আরো সমৃদ্ধ করে গেছেন। মার্কস্‌বাদের পতাকার নীচে সর্ব-হারাদের নিয়ে এক ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালিয়ে যান লেনিন।

কার্লমার্কস্ ও এঙ্গেলসের পরই এসে যায় লেনিনের নাম।

আর লেনিন মানেই রুশ বিপ্লব। ১৯১৭ সালের সেই মহা বিপ্লব। বিপ্লব এলো রাশিয়ায়, অথচ রাশিয়ান অর্থনীতি মোটেই শিল্প-সমৃদ্ধ ছিল না, শুধু ছিল কৃষি নির্ভর। আবার সেই কৃষি ব্যবস্থাও আধুনিক সংস্কারে উন্নত নয়। দেশের বেশীর ভাগ জমির মালিক ছিলেন মুষ্টিমেয় জমিদার বর্গ। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ভূমি দাসদের মুক্তি বিধান ঘোষণা করে কিছু জমি তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। কিন্তু আসলে জমিতে ঐ মুক্ত ভূমিদাসরা ব্যক্তিগত

মালিকানা পায় নি। ঐ জমিগুলির মালিক ছিল 'মির' [ Mir ] নামে পরিচিত গ্রাম্য সমিতি। মিরদের তদারকি কৃষকদের কাছে কোন আশীর্বাদ বয়ে আনলো না, বরং তাদের ব্যবহার দিনের পর দিন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।

এছাড়া রাশিয়ার অসংখ্য ভূমিহীন চাষী ও ক্ষেতমজুরের দল প্রতিনিয়ত শোষিত হচ্ছিলো। কৃষকদের উন্নতি করবার কোন প্রচেষ্টাই গ্রহণ করা হয়নি। অনটন ও অত্যাচারের জ্বালায় কৃষকরা মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ করত। ১৯০৫ সালের বিপ্লবে তাঁরা প্রথম সংঘবদ্ধভাবে জমিদারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, এবং তাঁদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়।

কৃষকদের মতো রুশ শ্রমিকরাও সেই অবক্ষয়ের যুগে শোষিত ও লাঞ্ছিত। মাত্র ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ার শিল্পের প্রসার লাভ শুরু হয়েছে। প্রচুর প্রাকৃতিক ভাণ্ডার এবং অপরিমেয় লোকবল,—রুশদেশে শিল্প প্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ততোটা হয় নি। সামান্য শিল্পোন্নতিতেই সে দেশে শুরু হলো শ্রমিক-শোষণ ব্যবস্থা। শ্রমিকদের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় কালাতিপাত করতে হতো। কমিউনিজম বা সাম্যবাদের আলোতে তারা কখনো আলোকিত হয় নি। তারা জানে না, সমাজের উৎপন্ন জিনিসের দখলী অধিকার থেকে কমিউনিজম কোনও মানুষকে বঞ্চিত করে না। দখলীর মাধ্যমে অপরের পরিশ্রমকে করায়ত্ত করবার ক্ষমতাটাই সে কেবল হরণ করে। শ্রমিকদের এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে শিল্পপতিরা ব্যক্তিগত মুনাফায় দিনের পর দিন স্ফীত হয়ে উঠ-ছিলেন। তাঁরা শ্রমিকদের নির্মম ভাবে শোষণ করতেন। শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, অল্প মজুরীতে দীর্ঘ সময় খাটানো হতো। এ ছাড়া তাদের চাকুরিরও কোন নিরাপত্তা ছিল না। যখন তখন ছাঁটাইয়ের খড়্গ ঝুলতো মাথার উপর।···এই দুর্বিসহ অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য শ্রমিকরা ক্রমশই সংঘবদ্ধ আন্দোলনের কথা ভাবতে শুরু করে। কালক্রমে সাম্যবাদী দল [ Communist

Party ] তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সরকারী দমন-মূলক নীতির বিরুদ্ধে মাথা তুলে তারা দাবী জানায়, শিল্পে তথা উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করতে। শ্রমিকদের এই দাবীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের মুখপাত্র এবং কল্যাণকামী তত্ত্ববিদরা মত দিলেন, ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হলে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, এক সর্বগ্রাসী আলস্যে আমরা অভিভূত হয়ে পড়বো! বুর্জোয়াদের এই চিৎকার যে কত বড় ভুল, ইতিহাসই তার প্রমাণ দেয়। 'এই মত ঠিক হলে বহু পূর্বেই নিছক আলস্যের টানে বুর্জোয়া সমাজের রসতলে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ এই-সমাজে যারা খাটে তারা কিছু উপার্জন করে না, অথচ যারা সবকিছু পায়, তাদের খাটতে হয় না।'*১০

সেই অসন্তুষ্ট, শোষিত, বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ১৯০৫ সালের বিপ্লবে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে এবং পুঁজিপতিদের বুকের পাঁজরগুলি ভেঙ্গে টুকরো করে দেয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রাক বিপ্লব রাশিয়ার অনেক জঞ্জাল এসে জমা হয়েছিল। জারের স্বেচ্ছাচারীতা তখন চরম লগ্নে। স্বেচ্ছাচারের সাথে কুসংস্কার জড়াজড়ি করে আছে। সাধারণের কোন রাজনৈতিক অধিকার নাই। শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই,—এই প্রভেদ দিন দিন আকাশস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে। জার দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডার অবশ্য জনগণকে কিছু কিছু অধিকার দিতে চেয়েছিলেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান Zemstvo সৃষ্টি করেন। কিন্তু আলেকজেণ্ডারের পরবর্তী জারেরা আবার গণ-স্বাধীনতার সেই ছিটে ফোটাটিও কেড়ে নেন। Land Captains উপাধিধারী সরকারী চরেরা সবসময় জন-সাধারণের মনোভাবের উপর নজর রাখতো, সরকার-বিরোধী গন্ধ পেলেই জানিয়ে দিতো জারকে, জারের পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে

১০* কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তাহার: মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌।

পড়তো বিক্ষুব্ধ জনতার উপর, প্রচণ্ড মারধর চলতো, পালাতে গেলে হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হতো, বহুলোককে গুহার মত চিরান্ধ কারাগারে বিনা বিচারে নিক্ষেপ করা হতো অনির্দিষ্ট কালের জন্য। বুদ্ধিজীবি রুশেরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জন-মত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন।

প্রকাশ্য আন্দোলনের উপায় নেই। রাষ্ট্রীয় খড়্গ অত্যাচারী ও নির্মম। যুগের এই অভিশাপে ছটফটিয়ে উঠলো তিক্ত, রিক্ত, বুভুক্ষু জনসাধারণ। প্রকাশ্য আন্দোলনের পথ বন্ধ বলে সন্ত্রাসমূলক ও ধ্বংসাত্মক কাজে মেতে উঠলো তারা। ১৯০৫ সালে এই ধ্বংসাত্মক অভিপ্রকাশ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলে, জারের টনক নড়লো। জনগণকে তুষ্ট করতে প্রতিনিধি সভা বা ডুমা [Duma] আহ্বান করলেন। কিন্তু কার্যত এই ডুমাও ছিল ক্ষমতাহীন, স্বার্থপরদের আড্ডাস্থল মাত্র!

যাক, ডুমার কথা পরে আসছে। বিপ্লবের আগুন জ্বালাতে লেখক ও দার্শনিকদের অবদানও কম ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের মতো রুশ বিপ্লবেও এঁদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়।

রুশ সরকারের বিশেষ নীতি ছিল, জনগণ যেন বেশী কিছু ভাবতে না শেখে। যেন উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির সমুন্নত ভাবধারা এ দেশের তটে এসে আছড়ে না পড়ে। কিন্তু শিক্ষার প্রভাবকে রোধ করা সম্ভবপর ছিল না। পাশ্চাত্য জগতের উদার দার্শনিক ভাবধারা রাশিয়ার দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

জন্মালেন লারমন্তোভের মতো বিপ্লবী ঔপন্যাসিক, যাঁর 'এ যুগের নায়ক' মানুষের চিন্তার আকাশে বৈদ্যুতিক রেখা এঁকে দিলো। আবির্ভূত হলেন লিও টলস্টয়ের মতো শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, যাঁর রচনার দ্যুতিতে রুশ জনগণের চিন্তার ক্ষেত্র ক্রমশই প্রসারিত হয়ে আসে। তুর্গেনিভ, ডষ্টয়ভস্কি, পুশকিন, অ্যান্তন চেখভ প্রভৃতির রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত রাশিয়ার শিক্ষিত সম্প্রদায় মানবিক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন শুরু করে দিলেন।

ম্যাক্সিম গোর্কীর রচনায় সাম্যবাদের আস্বাদন পেলো প্রত্যেকে। সর্বোপরি, কার্ল মার্কসের রচনা রুশ ভাষায় অনুদিত হবার ফলে সর্বহারা সম্প্রদায় বিপ্লবের বারুদে অগ্নিসংযোগের উপায় জানতে পারে।

জনগণের রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির সাথে সাথে রাশিয়ায় একাধিক রাজনৈতিক দলও প্রতিষ্ঠিত হলো। এদের দেশ-ব্যাপী প্রচারে ও আন্দোলনে রুশ জনগণ জারতন্ত্রের স্বরূপ চিনতে পারে এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এই সমস্ত দলের ভিতর Social Democratic Party ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল। দলটি মূলত মার্কসীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু ১৯০৩ সালে মতের অমিল হওয়ায় এই দল দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়,—Bol shevik সংখ্যাগুরু এবং Men shevik সংখ্যা লঘু। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে বলশেভিক দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং রুশ বিপ্লবের সার্থক নেতৃত্ব দিয়েছিল এই দল।

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে শোচনীয় ব্যর্থতা জারতন্ত্রের মরচে ধরা কাঠামোকে আরো নতমুখ ক'রে তোলে। এই স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের স্থায়িত্বের জন্যই প্রয়োজন ছিল বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতির। বৈদেশিক নীতির ঝলকানিতে অনেক সময় গণ-অভিযানকে চেপে রাখা সম্ভবপর। কিন্তু রুশ সরকার তেমন কোন জোরাল নীতি অনুসরণে তখন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ১৯০৪ সালে রুশ জাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপানের হাতে বিশাল রাশিয়ার পরাজয় রুশদের পক্ষে এক মর্মান্তিক ঘটনা। এই প্রথম একটি এশীয় রাষ্ট্রের হাতে ইউরোপের এক বৃহৎ শক্তির পরাজয়। বিক্ষুব্ধ জনগণ এই পরাজয়ের জন্য জারতন্ত্রের অপদার্থতাকে দায়ী করলো। সরকারের প্রতি সাধারণের আর কোন আস্থাই নেই!

এরপর আসছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিশপ্ত দিনগুলি। অপরিমেয় লোকবল, কিন্তু অপ্রতুল অস্ত্রবল নিয়ে রাশিয়া জার্মানীর সাথে পাঞ্জা লড়তে এগিয়ে আসে। যুদ্ধের প্রথমার্ধে রুশ সেনাদের সাফল্য ছিল

বিস্ময়কর। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো সামর্থ্য রুশ সরকারের ছিল না। কয়েকমাস যুদ্ধ চলবার পরই রুশ সেনাদের সেই অগ্রগতি বন্ধ হয়ে গেলো, উপযুক্ত রসদ ও অস্ত্রের অভাবে তারা বিভ্রান্ত। জার্মান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল ভন্ হিন্দেনবার্গ যেন এই সুযোগেরই প্রত্যাশায় ছিলেন। তিনি প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলেন রুশদের। সেই আক্রমেণের তীব্রতায় বিধ্বস্ত হয়ে গেলো রুশসেনারা। অজস্র রুশ সেনার মৃতদেহে পাহাড় হয়ে ওঠে, লক্ষ লক্ষ রুশ সৈন্য বন্দী হয়। অস্ট্রিয়ার রণক্ষেত্রেও সাময়িক সাফল্য লাভের পর জার্মানদের হাতে রুশরা প্রচণ্ড পাল্টা মার খেয়ে ফিরে আসে। সৈন্যদের ব্যারাকে ব্যারাকে মহামারী দেখা দেয়। দেশে দেখা দিয়েছে দারুণ খদ্যাভাব। মাথার উপর শকুনের মরাকান্না। প্রত্যয়হীন অসন্তোষে জনগণ ফুসছে। আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভার মতো তাদের সেই বিক্ষোভ যে কোন মুহূর্তে জ্বালামুখ ভেঙ্গে চারধারে ছিটকে পড়বার আশঙ্কা আছে!

রাজ প্রাসাদে জার দ্বিতীর নিকোলাস এক অক্ষম, ব্যক্তিত্ব শূন্য, অস্থির মানুষ। সাধু রাসপুটিনের দুষ্ট গ্রহ তাঁকে আর জারিনাকে সর্বদাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিপ্লবের চিন্তা থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে এনে উদ্দামআনন্দ-স্রোতে, বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিতে রাসপুটিনের আলৌকিক আবেদন মানুষের মনকে দ্বিধায় এনে ফেলেছে। রোমানভ পরিবার এই সাধুকে মাথায় তুলে রেখেছে, —পতনের পূর্ব মুহূর্তে দৈবের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে বসে আছেন জার দ্বিতীয় নিকোলাস।

যুদ্ধ চলেছে! সর্বগ্রাসী যুদ্ধ।

বিপ্লব আসছে! ক্ষমাহীন বিপ্লব।

সব যুদ্ধেরই সূচনা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধও মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির কারসাজি। বিভক্ত বিশ্বকে আরো টুকরো

টুকরো করে নিজেদের অর্থনৈতিক রাজত্বকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস।... যুদ্ধের ভয়ানক দিন গুলিতে রাশিয়ার অর্থনীতি ক্রমশই ভেঙ্গে পড়েছে। শিল্প, পরিবহন, এবং কৃষি ব্যবস্থা এক অচল অবস্থায় ধুঁকছে। রাশিয়ার ৯,৭৫০টি বৃহৎ কারখানার মধ্যে মাত্র ৪,৮২০টি উৎপাদনক্ষম ছিল। রেলগাড়ীর অভাবে রেলওয়ে বিভাগ আংশিক অচল হয়ে পড়েছে। খাদ্যের দোকানে খাদ্য নেই, দু'পকেট ভর্তি রুবল নিয়ে গেলেও যথেষ্ট রুটির সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রতিবাদ করলেই কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা ঠেলে পাঠানো হবে সীমান্তে জার্মানদের কামানের মুখে বুক পেতে দাঁড়াতে।

এই তো অবস্থা। পনেরো মিলিয়ন লোক সীমান্ত জুড়ে লড়াই করে চলেছে। মাঠে চাষ করবার লোক নেই, শ্রমনিপুণ শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত ঘটছে অপমৃত্যু। রুবলের মুদ্রা মূল্য হ্রাসে বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার উপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা আরো বৃদ্ধি পায়। একমাত্র বিপ্লব ব্যতীত এই বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই। বলশেভিকরা বিশুদ্ধ শ্রমিকদের মধ্যে সাম্যবাদের উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে থাকে। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ধনতন্ত্রকে চরম আঘাত হানতে সর্বহারার দল শ্রেণীবদ্ধ, তাদের শপথ এক, আদর্শ অভিন্ন। বল-শেভিক দলের পতাকার নীচে তারা জমায়েত হতে থাকে দিনের পর দিন। বুদ্ধিদীপ্ত যুগের শ্রেষ্ঠ নেতা লেলিন মার্কসবাদের ভাষ্যে তাদের সচেতন করে তুলছেন, তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামে বিজয়ের উপায় নির্ণয় করে দিচ্ছেন। সহজ ও সরল ভাষ্যে তথাকথিত অশিক্ষিত মানুষ বুঝতে পারছে, মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ কী বলেছেন এবং সর্বহারা নেতৃত্বে তাদের দেশ কোন্ পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারবে!

যুদ্ধের বৎসর গুলিতে বিপ্লবের ভাবধারা আরও স্ফীত হয়ে উঠতে থাকে। এক অর্থে বিপ্লব যেন শুরু হয়ে গেছে। প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চল গুলিতে ধর্মঘট চলছে। তৎকালীন এক অসম্পূর্ণ রিপোর্টে জানা যায় প্রায় ৬,৭৬,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিয়ে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় চূড়ান্ত আঘাত হানে।

শ্রমিকদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে কৃষকরা। গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত। সুসংবদ্ধ কৃষকরা জমিদারদের সুদৃশ্য প্রাসাদ গুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয়, কেড়ে নেয় ওদের মজুত শস্য ভাণ্ডার।

শ্রমিক-কৃষক যৌথ আক্রমণে টলমলায়মান জারতন্ত্র। জার বুঝলেন, মুক্তির উপায় নেই। প্রতিক্রিয়াশীল ধনতন্ত্রবাদীদের সাথে বৈঠকে বসলেন তিনি। মারমুখী বিপ্লবী মানুষগুলোকে আপাতত শান্ত রাখবার উদ্দেশ্যে জার্মানীর সাথে শান্তি চুক্তির সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করা হল। বলা হল, যুদ্ধ থামলেই সাধারণের অবস্থার পরিবর্তম ঘটবে।

কিন্তু চক্রান্ত চলছে ধনতন্ত্রীদের ভিতরও। বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটোয়া লোকরা এখানে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় খুব সচেষ্ট। জার দ্বিতীয় নিকোলসকে পদচ্যুত করে তাঁর ছেলে এ্যালেক্সিকে সিংহাসনে বসবার চক্রান্ত করেছেন তাঁরা। জারের ভাই মিখায়েল এই চক্রান্তের অন্যতম পক্ষ। চক্রান্ত সফল হলে যুদ্ধ রাশিয়ায় থামাবে না, বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা পাবে এবং বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে রুশীয় প্রলেতেরিয়তদের কণ্ঠরোধ করাও সম্ভব হবে।

চক্র ও চক্রান্ত।

কিন্তু সাধারণ মানুষের বৈপ্লবিক সচেতনতাকে কে রুখতে পারে? বাঁধ ভাঙ্গা নদীর মতো ওরা উদ্দাম, বেপরোয়া। ১৯১৭ সলের ১৮ই ফেব্রুয়ারী মেহনতী মানুষের এই অসন্তোষ চরম রূপ ধারণ করে পেট্রোগাদ শহরে। ছ'লক্ষ শ্রমিক বলশেভিক নেতৃত্বে ধর্মঘট করে, পেট্রোগাদের সাধারণ জীবন যাত্রা অচল করে দেয়।

২৫শে ফেব্রুয়ারী খুব সকালে প্রত্যেক মানুষের দৃষ্টির সামনে ঝুলতে থাকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফেষ্টুন, "সামনেই সংগ্রাম! কিন্তু জয় আমাদের সুনিশ্চিত! লাল পতাকা নিয়ে আসুন

আমরা পথে অগ্রসর হই। জমিদারের সমস্ত জমি সাধারণের। যুদ্ধ বন্ধ করো! তমাম বিশ্বের শ্রমিক-ভাতৃত্ব দীর্ঘ জীবন লাভ করুক!"

পেট্রোগাদের প্রতিটি কারখানায় স্ট্রাইক চলছে। চলছে র‍্যালি ও ডেমনেস্ট্রেশান। হাজার হাজার মানুষের মুখর মিছিল, সেই সব ধ্বনি "জারতন্ত্র নিপাত যাক!···যুদ্ধ বাদীরা নিপাত যাক!·· আমাদের দাবী রুটি ও শান্তি।" ··

পেট্রাগাদের পুলিশ বাহিনী জারের নির্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়লো ধর্মঘটীদের উপর। ধর্মঘটীরাও প্রস্তুত ছিল এর জন্য। মুখোমুখি দাঙ্গায় পথ-ঘাট রক্ত পিচ্ছিল হয়ে ওঠে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী পেট্রোগাদের সামরিক অধিকর্তা খাবালোভ বললেন, পুলিশ বাহিনীর পক্ষে অবস্থা আয়ত্তে আনা সাধ্যাতীত। এখন সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসবে রাইফেল উঁচিয়ে; সামান্য বাধারও উত্তর দেওয়া হবে ঝাঁক ঝাঁক গুলির মুখে।

খাবালোভ্ কিন্তু বুঝতে পারলেন না, যুগের কাঁটা ঘুরে গেছে। শ্রমিক ও কৃষকদের মতো পুঞ্জ পুঞ্জ অসন্তোষ জমা হয়ে আছে সেনা শিবিরেও। গণ-আন্দোলনের সামিল হতে তাদের আর বাধা নেই। ···জীবনের ঝুকি নিয়েও বলশেভিক নেতারা ঢুকে পড়ছেন সৈন্যদের ব্যারাকে ব্যারাকে। বিলিয়ে দিচ্ছেন হাজার হাজার লিফলেট। ছোট ছোট গোপন সভাতে জোয়ানদের বলা হলো, "···মনে রাখবেন সৈনিক বন্ধুগণ, মেহানতী মানুষদের সাথে বিপ্লবী সৈনিকদের ভাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হলেই দুঃস্থ জনগণকে আমরা মুক্ত করতে পারবো, এবং আমাদের জনগণকে শোষণ ও হত্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারব।"

রুশ সৈনিকরা সাগ্রহে স্বাগত জানালো প্রলেতেরিয়ত বিপ্লবকে। প্রতিশ্রুতি দিলো, তাদের রাইফেল থেকে একটি বুলেটও নিক্ষিপ্ত হবে না বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে।

২৭শে ফেব্রুয়ারীর গোধূলি লগ্নে পেট্রোগাদের ষাট হাজার

সৈনিক শপথ গ্রহণ করে, সর্বহারাদের বিপ্লবের তারাও অংশীদার হতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ।

'মার মার' শব্দে বিপ্লবীরা ছুটে আসতে থাকে সমস্ত সরকারী ভবনগুলি দখল করতে। পুলিশ বাহিনীর দুর্বল প্রতিরোধ অল্পক্ষণেই ভেঙ্গে পড়ে। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারালেন শ্রমিক নেতা করোকভ। তাঁর মৃত্যুতে প্রাভদা লিখলো, সংগ্রামের সেই চরম লগ্নে তিনি এগিয়ে আসেন সামনের সারিতে। শত্রুর বন্দুক সেই মুহূর্তে গর্জে উঠলো, তিনিই তাঁর রক্তে প্রথম বিপ্লবের স্বাক্ষর এঁকে দিয়ে গেলেন।'

বিপ্লবী শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকরা দখল করে নিলো রেল ষ্টেশন, পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, পিটার ও পাউল দুর্গশ্রেণী এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সেতু। কয়েদ খানার প্রাচীর ভেঙ্গে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হলো। সর্বত্র এক মুক্তির আনন্দ! পেট্রোগাদ প্রোলেতেরিয়ত বিপ্লবে মুক্তি স্নান সম্পন্ন করলো। স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে বিশাল রাশিয়ায় পেট্রোগাদ একক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে রইল, শুকতারার মত উৎসাহিত করতে লাগলো অপরাপর স্থানের রুশ জনগণকে।

জারের আপ্রাণ আয়াস সত্ত্বেও পেট্রোগাদের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো রাশিয়ার অন্যান্য কেন্দ্রেও। বিপ্লবের আগুন ধিক ধিক করে জ্বলতে থাকে সর্বত্র। সাধারণ ভাবে মনে হলো, বিপ্লব বুঝি সফল হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিপ্লব তখন অনেক দূরে। বিপ্লবীদের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে আছে পেটি-বুর্জোয়াদের ধ্বজাধারী মেনশেভিকরা। ষ্টেকলভ, সুখানভ, ক্রেনেস্কি ইত্যাদির জবরদস্ত মেনশেভিক নেতা। তাঁরা আবার হাত মেলাতে চাইলেন বুর্জোয়াদের সাথে।

বিপ্লবীদের প্লেনামে বলশেভিকরা তীব্র আক্রমণ করলো মেন-

শেভিকদের। জানালো, মেনশেভিকরা সর্বহারা শ্রমজীবীদের দাবী অস্বীকার করে আবার বুর্জোয়াদের মদত দেবার নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

বলশেভিকদের সমালোচনার উত্তরে মেনশেভিক নেতা সুখানভ বললেন, "আমরা যে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছি, তা জারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বে নেই, এটা নিঃসন্দেহে বুর্জোয়াদের কৃতিত্বের পরিচায়ক। আর বুর্জোয়াদের বাদ দিলে কোন বিপ্লব স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। তার ধ্বংস হয়ে ওঠে অনিবার্য। শুধু মাত্র এই ডুমার প্রগতি সম্পন্ন নেতারাই পারবেন ট্রেপোভ এবং রাসপুটিনের মতো মানুষের কু-প্রভাব থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে!" পেটি বুর্জোয়ারা আরও বললে, বলশেভিকরা যে ধরণের বিপ্লবের কথা বলে থাকে, রাশিয়ায় তা কোন দিনই সম্ভবপর নয়। কারণ এ দেশ কৃষি নির্ভরশীল ; এর কাঠামো অনুরূপ বিপ্লবের পক্ষে অনুকূল নয়।

সর্বহারাদের নেতা লেলিন সরাসরি বললেন, মেনশেভিকরা বিপ্লবের অপমৃত্যু কামনা করছে। বিপ্লবের প্রতি তারা বিশ্বাসঘাতক। ...বলশেভিকরা আর একবার রুখে দাঁড়ালো ডুমার প্রতিক্রীয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে। আবার শুরু হল একটানা ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রদর্শন, জ্বালাময়ী বক্তৃতা, "কমরেড, কাজ বন্ধ রাখুন। সৈনিক বন্ধুরা, এই সেই মুহূর্ত যা, আপনাদের জনগণের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। বেরিয়ে আসুন খোলা রাস্তায়। জমায়েত হোন বিপ্লবের রক্ত পতাকার নীচে। শ্রমিকদের ভেতর থেকেই নির্বাচিত করুন প্রতিনিধিদের। ঐক্যবদ্ধ করুন এক মহান বিপ্লবী শক্তিকে।"

তবু বলশেভিকদের তুলনায় মেনশেভিকরা তখনো অনেক শক্তিশালী এবং গণ-সমর্থন পুষ্ট। চারশত জন সোভিয়েট ডেপুটীর মধ্যে মাত্র কয়েকজন ছিলেন বলশেভিক। এই ভাবে জারতন্ত্রের পতন সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়ার মূলগত চরিত্রের কোন সংশোধন হয় নি। বড় বড় শিল্পপতিরা আবার আসর জাঁকিয়ে বসলেন,

দেশের শাসনযন্ত্রে তাঁদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের ধকুবেররা দূর থেকে কলকাঠি নাড়তে থাকেন। ধনতান্ত্রিক দুনিয়া চাইল, এই অস্থায়ী সরকার চিরদিনের জন্য অনড় পাহাড়ের মতো চেপে বসুক রুশ জনগণের বুকে। অবাধে বৈদেশিক সাহায্য আসতে থাকে রাশিয়ায়। অস্থায়ী রুশ সরকারও যুদ্ধখাতে খরচের বহর দিনের পর দিন বাড়িয়ে চলেন।

লেনিন তখনো অনেক দূরে,—সুইজারল্যাণ্ডে, সাগ্রহে নিরীক্ষণ করে চলেছেন রুশ বিপ্লবের গতি প্রকৃতি। সব সময় বলশেভিকদের সাথে তাঁর চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলতো। সময় উপযুক্ত হলেই রাশিয়ার মাটিতে পা রাখবেন তিনি। লেনিনের রচনা রুশ সীমান্ত পেরিয়ে মেহনতী মানুষদের হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। প্রাভদায় তিনি লিখলেন, 'বিপ্লব সমাপ্ত হয়নি। আমরা এখন একটা মাঝা-মাঝি জায়গায় এসেছি। জারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে জমিদার ও ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদীদের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছি!'

বিদেশে থাকাকালীন লেনিন বিশ্বের সর্বহারাদের ডাক দিলেন, রুশ সর্বহারাদের বিপ্লবকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে। লেনিন আরো মনে করলেন, দেশের বাইরে যে দু'লক্ষ রুশ যুদ্ধবন্দী রয়েছে, তাদের মধ্যেও বিপ্লবের বাণী প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। যুদ্ধবন্দীদের কাছেও তাঁর আবেদনকে পৌঁছে দেওয়া হলো।

লেনিনের আদর্শে শত শত শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠলো। এই সংগঠনের সদস্যরা প্রায়ই সশস্ত্র থাকতো। যেমন পেট্রোগাদের একটি শ্রমিকসংঘে ছিল প্রায় পঞ্চান্ন হাজার রাইফেল এবং ত্রিশ হাজার রিভলবার। শ্রমিকদের চাপে পড়ে মেনশেভিকদের অনেক কিছুই মেনে নিতে হলো! যেমন, আট ঘণ্টার বেশী পরিশ্রম করানো নিষিদ্ধ হয়ে গেলো।

অস্থায়ী সরকার দেশপ্রেমের ফাঁকা বুলি তুলে হাজার হাজার মেহনতী মানুষকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে থাকেন। খাদ্য দপ্তরটি

ধনী ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। কৃষকদের অবস্থার জার আমলের চাইতেও অবনতি ঘটে। উৎপাদন ব্যবস্থা এবং যুদ্ধ,—উভয় ক্ষেত্রেই জারতন্ত্রের পুরানো নীতি অনুসৃত হতে থাকে।...

রুশ বিপ্লবীদের আহ্বানে এবারে স্বদেশের পথে চললেন ভি. আই. লেনিন। পেট্রোগাদে পৌঁছবার সাথে সাথে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। শ্রমিক, সৈনিক, কৃষক,—হাজার হাজার জনতা ছুটে আসে, তাদের প্রিয় নেতাকে দেখবার জন্য। লাল পতাকায় চারদিক লালে লালময়।...পেট্রোগাদে বসে লেনিন তার April Theses রচনা করলেন। ঘোষণা করলেন, সর্বহারাদের আপোষ-হীন সংগ্রামের কথা। ব্যাখ্যা করলেন, কিভাবে সোভিয়েটরা প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। মূল রাজনৈতিক শ্লোগান রচনা করলেন তিনি, "All power to the Soviets."

১৯১৭ সালের ২৪শে এপ্রিল থেকে ২৯শে এপ্রিল অবধি নিখিল রুশ বলশেভিক সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো পেট্রোগাদে। লেনিনের April Theses গৃহীত হলো সেই সভায়। লেনিন পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। লেনিনের গৃহীত নীতি ঘোষণা করে, বুর্জোয়া ও ধনীদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে সর্বহারাদের কাছে। মেনশেভিকদের বুর্জোয়াপন্থী মনোভাবের দ্রুত অবসান চাই!

বলশেভিকদের বড় সমর্থন আসছে রুশ সৈন্যদের তরফ থেকে। সৈনিকরা আশা করেছিল, জারের ক্ষমতাচ্যুতির পর নতুন সরকার দ্রুত যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেবেন! কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা না ঘটায়, তাদের অসন্তোষ চরমে পৌঁছে যায়। ২০শে এপ্রিল পনের হাজার সৈনিক মস্কো নগরে প্রকাশ্যে যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে নগর পরিভ্রমণ করে। বলশেভিকরা এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে।

বলশেভিকদের এই সমস্ত আন্দোলনের জবাব দেবার জন্য মেনশেভিকরাও পাল্টা সভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি বের করতে থাকে! 'বর্তমান সরকারের প্রতি আস্থা অটুট', 'চূড়ান্ত জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে,' 'লেনিনকে কারারুদ্ধ করা হোক'—ইত্যাদি শ্লোগানও শোনা যায়!

কিন্তু বলশেভিকদের সাংগঠনিক শক্তি ও বিজ্ঞান-সিদ্ধ নীতি ক্রমশই বেশী সংখ্যক জনগণকে আকর্ষণ করতে থাকে! লেনিনের অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভা, তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ও যুক্তি উপস্থাপনের কায়দা,—বলশেভিক পার্টিকে দিন দিন জনপ্রিয়তার তুঙ্গেতে পৌঁছে দেয়।

১৯১৭ সালের মে-জুন মাসে 'সিটি ডুমা'র নির্বাচন উপলক্ষে বলশেভিকরা তাঁদের নীতিকে গণসমক্ষে ব্যাপকভাবে উপস্থিত করবার সুযোগ পায়। রাশিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম গণ-ভোট। লেনিন তিনটি নীতি ঘোষণা করলেন:

(১) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে আমরা সমর্থন করি না।

(২) ধনতান্ত্রিক সরকারকে আমরা সমর্থন জানাই না।

(৩) পুলিশী-ব্যবস্থার চাইতে, জনগণের হাতেই শান্তি রক্ষার ভার আমরা তুলে দিতে চাই। ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে বলশেভিকরা শক্তিশালী 'লালরক্ষী বাহিনী' গড়ে তুলতে থাকে। তারা জানতো, আগামী বিপ্লবকে সফল করতে এই লাল ফৌজের গুরুত্ব হবে অসাধারণ!

সিটি ডুমার নির্বাচনে মেনশেভিকরা তখনো সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও, বলশেভিকদের শক্তি বৃদ্ধিটুকু লক্ষণীয়। ৫৫, ৫৬ ও ৪৫তম রিজার্ভ ইনফেন্ট্রি রেজিমেণ্টে বলশেভিক দল তাদের পার্টি গ্রুপ গড়ে তোলে। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দ্রুত সাম্যবাদ বিস্তারিত হয়। মেনশেভিকদের আপ্রাণ প্রয়াসেও এই ব্যবস্থার অন্যথা ঘটে না। উত্তর এবং পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধরত সৈনিকরাও সাম্যবাদে দীক্ষিত

হয়। সাম্যবাদ ছড়িয়ে পড়তে থাকে উক্রাইন, বাল্টিক এলাকা ও মধ্য এশিয়ায়।

এরই মধ্যে জুন মাসে পেট্রোগাদ শহরে সমস্ত রুশ শ্রমজীবী মানুষ ও সৈনিকদের এক প্রকাণ্ড অধিবেশন হয়ে গেলো। অধিবেশনে মেনশেভিক নেতা কেরেনেস্কি বললেন, সোভিয়েটদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্য লেনিনের নীতি কখনই তাঁর দল সমর্থন করে না। মেনশেভিক দলের অপর এক নেতা পোষ্টমাষ্টার জেনারেল টারেটেলি বললেন, বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়াদের বাদ দিয়ে কোন বৈপ্লবিক কাজ সম্পন্ন হতে পারে না।

এস. আর এবং মেনশেভিকদল যৌথভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বজায় রাখলো তাদের সরকারকে।

লেনিন বক্তৃতা দিতে উঠে বললেন, 'মেনশেভিক ও এস. আর দলের নেতারা আহ্বান জানান বিশ্বের সর্বত্র রাজা ও ধনীদের রাজত্বের অবসান ঘটাতে, অথচ, তাঁরা নিজেরাই ধনতান্ত্রিক তুনিয়ার মানুষদের নিয়ে সরকার গঠন করে বসে আছেন!…এই ধরণের সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন, সাম্রাজ্যবাদী লড়াই ততোদিন থামবে না। কারণ, আসলে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী ব্লকেরই মানুষ!'

লেনিনের এই বক্তৃতার পর সমগ্র রাশিয়া জুড়ে শ্রমজীবী মানুষ ও সৈনিকদের ভিতর দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দোকানপাট, কল-কারখানা এবং সৈনিকদের ব্যারাকে ব্যারাকে উত্তেজিত জনগণ নতুন বিপ্লবের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে নেয়। এস. আর ও মেনশেভিকরা অভিযোগ করলো, বলশেভিকরা ক্ষমতা দখলের জন্য পাঁয়তাড়া কষছে। সমস্ত রকম বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সরকার-বিরোধী সভার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হলো। বলশেভিক নেতারা শ্রমিক ও সৈনিক বন্ধুদের শান্ত ও সংযত থাকতে অনুরোধ করলেন, প্রতি বিপ্লবীদের সাথে এখনই কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

কিন্তু লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের শোভাযাত্রাকে কেউ রোধ করতে

পারলে না। মস্কো, পেট্রোগাদ, কিয়েভ, তাসখন্দ,—সর্বত্র ঐ এক দৃশ্য: হাজার হাজার শ্রমিক, সৈনিক লাল পতাকা তুলে নিজেদের দাবী জানাচ্ছে 'যুদ্ধ বন্ধ করো, আমরা শান্তি চাই!' 'সোভিয়েটদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিতে হবে' 'সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা চলবে না!'

রিগাতে ষাট হাজার মানুষ এক সভায় মিলিত হয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুললো: 'Down with these ten Capitalist ministers'. 'এই দশজন ধনী মন্ত্রীর রাজত্ব আমরা চাইনা!' 'All powers to the Soviets of Workers, Soldiers and Landless Peasants.' 'সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিতে হবে শ্রমিক, সৈনিক এবং ভূমিহীন কৃষক সংগঠনগুলির হাতে।'

রাশিয়ার গণ-আন্দোলনের এই গতি দেখে পশ্চিমী দেশগুলিতে দুশ্চিন্তা ঘনিয়ে আসে। তাদের হীন প্রয়াস হলো, এই শ্রমজীবী মানুষদের দাবীকে ভিন্নমুখী করে তোলা। আমেরিকা থেকে বিশেষ মিশন এলো রাশিয়ার অস্থায়ী সরকারকে কিভাবে শক্তিশালী করে তোলা যায়, সে বিষয়ে তদন্ত করে যেতে। ঢালাও সাহায্য এলো পশ্চিমী দুনিয়া থেকে। একদিকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এবং অপরদিকে শ্রমজীবীদের কণ্ঠরোধ করা,—এই উভয় কাজ চালিয়ে যেতে মেনশেভিকদের মদত দিয়ে চললো আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স।

উল্লসিত মেনশেভিক সরকার রুশসেনাদের হুকুম দিলেন, নতুন করে আক্রমণ চালাতে জার্মান ও অষ্ট্রিয়ানদের উপর। আরও লক্ষ লক্ষ তাজা তরুণকে ঠেলে পাঠানো হলো সীমান্তের ওপারে। এটা একটা মস্ত উন্মত্ততা এবং বিরাট অপরাধ। কারণ, যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো অস্ত্রবল ও মজুত খাদ্য তখনও রাশিয়ার নেই, সৈনিকদের উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত নেই, যুদ্ধ করতে মনের দিক থেকেও তারা আর সাড়া পাচ্ছে না! তবু ওদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাঠানো হলো জার্মান বাহিনীর মুখোমুখি হবার জন্য।

রণক্ষেত্র থেকে একজন বিপ্লবী সৈনিক ক্ষমতাশীল মন্ত্রীদের

উদ্দেশ্য করে লিখলেন, [ You now want us to start an offensive in the interests of the land owners and capitalists of Britain, France and Russia···but you are quite mistaken, Mr. Minister, we refuse to start the offensive or to shed our blood for alien causes ······we inform you that······we have no trust in you because you have betrayed the nation. ( Quoted from soldier's letters of 1917, Russ. Ed. bosizdat, Moscow-Lenin guard, 1927 ) ] '···আপনারা চাইছেন, আমরা যেন এখনই দ্বিগুণ তেজে আক্রমণ শুরু করি। কিন্তু এই আক্রমণ কাদের স্বার্থে? নিশ্চয়ই তা বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার ধনতান্ত্রিক মানুষদের স্বার্থে! ···কিন্তু এটা ভাবাও আপনাদের মস্ত ভুল। আমরা আর মিত্র পক্ষের [ Alien causes ] হয়ে আক্রমণ করব না, রক্তপাত ঘটাবো না!······

আপনাদের অবগতির জন্যই জানাচ্ছি, আপনাদের উপর আমাদের কোন আস্থা নেই, কারণ আপনারা জাতির প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতক!'

এমন অপ্রস্তুত, অনিচ্ছুক সৈন্যদের যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিলে যা হবার তাই হলো। প্রচণ্ড মার খেলো রুশ সৈনিকরা! তচনছ হয়ে গেলো তাদের ব্যূহ। মাত্র দশ দিনের লড়াই-এ ষাট হাজারের উপর তরুণ রুশ হয় প্রাণ হারায়, নতুবা মারাত্মক আহত হয়ে দেশের হাসপাতাল গুলিতে এসে শয্যা নেয়।

পেটি বুর্জোয়া সরকারের হঠকারিতার চরম মূল্য দিলো তারা।

যুদ্ধ বিরোধী বাতাস ঝড়ের ক্ষিপ্রতা নিয়ে ছেয়ে ফেলে এবার সমগ্র রাশিয়াকে। সর্বত্র গণ-বিদ্রোহের সম্ভাবনায় রাশিয়ার মাটি যেন থর থর করে কাঁপছে।

অস্থায়ী সরকারও তাঁর দমন নীতি চালালেন। শ্রমিক ও সৈনিকদের উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষিত হলো। কয়েক ডজন

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হলো, মেনশেভিক-শাসিত রাস্তায়। পেট্রোগাদের প্রতিটি রাস্তা শ্রমিক ও সৈনিকদের রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো। ব্যাপক হারে চললো বলশেভিক গ্রেপ্তার।

সামরিক আইন জারি হলো বিপ্লবী পেট্রোগাদ শহরে। লেনিন তখনো ঐ শহরে আত্মগোপন করে আছেন এক শ্রমিক বন্ধুর আস্তানায়। কিন্তু ওখানে থাকা আর তাঁর পক্ষে নিরাপদ ছিলনা, —প্রতিবিপ্লবীরা সন্ধান পেলে তাঁকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হবে না। তাই ছদ্মবেশ গ্রহণ করলেন লেনিন। দাড়ি কামিয়ে মুখোশ পরলেন, তারপর একটি লাল কোট গায়ে চাপিয়ে খুব ভোরে পেট্রোগাদ শহর ত্যাগ করলেন তিনি, উপস্থিত হলেন রেজলিভে।

৮ই জুলাই যুদ্ধমন্ত্রী কেরেনেস্কি অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন।···জুলাই মাসের পেট্রোগাদের ঘটনা রাশিয়ার অন্যত্রও দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিদ্রোহী হয়ে উঠলো কার্ণিলোভ শহর। এবারেও অত্যন্ত নির্মম ভাবে দমন করা হলো মেহনতী মানুষের বিক্ষোভকে। এই দমনে বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার হস্তক্ষেপের কথা উল্লেখযোগ্য।

মেনশেভিক দলের জনপ্রিয়তা দিনের পর দিন হ্রাস পেতে থাকে, আর সর্বহারার দল সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ক্রমশই এগিয়ে চলে। সৈনিক, শ্রমিক, কৃষক—প্রত্যেকেই সশস্ত্র বিপ্লবের কথা চিন্তা করছে। এ ছাড়া প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে ক্ষমতাচ্যুতির অন্য উপায় নেই। ছদ্মবেশে লেনিন তখন রাশিয়ার স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনিও তখন বিশ্বাস করেন, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। পাঁচ লক্ষ শ্রমিক পেট্রোগাদের এক সভায় জমায়েত হয়ে শপথ নিলো, বলশেভিকদের হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তুলে দিতে হবে।

এরপরের ঘটনা ছায়াছবির মতো অনুষ্ঠিত হতে থাকে!

কেরেনেস্কি সরকার ক্রমশই নিজের দুর্বলতা বুঝতে পারছেন।

শ্রমিকরা উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে, কৃষকরা আর বিশ্বাস করতে পারছে না তাদের সরকারকে, আর সৈনিকরা দলে দলে যোগ দিচ্ছে ট্রটস্কীর নেতৃত্বে গঠিত লালরক্ষী বাহিনীতে। এই সশস্ত্র বাহিনী বিনাবাধায় রেল স্টেশন ও সরকারী অফিসমূহ দখল করে নিলো। প্রায় বিনা রক্তপাতেই নভেম্বর বিপ্লব সাধিত হলো। কেরেনেস্কি প্রাণভয়ে পাড়ি জমালেন ইংল্যাণ্ডে। ভি. আই লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার গঠিত হলো সোভিয়েট রাশিয়ায়।

ক্ষমতা লাভের পরই লেনিনের প্রথম কাজ হলো যুদ্ধের অবসান ঘটানো। ১৯১৮ সালে ব্রেষ্ট লিটোভস্কের সন্ধির দ্বারা রাশিয়া জার্মানীর সাথে শান্তি স্থাপন করে। এই সন্ধির শর্তানুসারে সাম্য-বাদী রাশিয়াকে অনেক মূল্য দিতে হলো। তাকে ছেড়ে দিতে হলো বাল্টিক ও কৃষ্ণসাগরের তীরে বিস্তৃত ভূখণ্ড।

রাশিয়ায় কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো বিশ্বের তাবৎ ধনতান্ত্রিক দেশগুলি। তারা যেন ভূত দেখছে—কমিউনিজমের ভূত। এ ভূত ঝেড়ে ফেলার জন্য জোট বেঁধে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো সাম্যবাদী রাশিয়ার উপর। তাদের আগমনের সাথে সাথে উৎসাহিত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলিও গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে এমন বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন একালের যোদ্ধা ডেমিকিন [ Demikin ]। সাইবেরিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলদের নেতা হলেন কোলচাক [ Kolchak ]।

বৃটিশ, ফরাসী ও মার্কিন সৈন্যেরা রাশিয়ার উত্তরে আর্চেঞ্জেল [ Archangel ] এবং দক্ষিণে ককেশাস্ অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। এই সুযোগে পোলাণ্ডও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এই ভয়ানক দুঃসময়ে রুশবাসীদের আত্মত্যাগের কাহিনী অতুলনীয়, বিপ্লবকে রক্ষার জন্য তারা সর্বস্ব পণ রেখেছিল। দেশে দেখা দিয়েছে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ,—খাদ্যাভাবে ও গৃহযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যু মুখে পতিত হলো। কিন্তু এমন বিপর্যয়ের মধ্যেই

ভ্লাদিমির ইলিয়াভিচ্ লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক সরকার নিজের অস্তিত্ব—রক্ষার্থে সক্ষম হলো। ১৯২১ সালে বলশেভিকদেরই জয় হলো, সমস্ত চক্র ও চক্রান্ত গুঁড়িয়ে পড়লো লেনিনের পায়ের কাছে, পেটি বুর্জোয়ারা স্তব্ধ হয়ে গেলো ইতিহাসের বুকে, লালরক্ষীদের প্রচণ্ড মারে বিদেশী শত্রুরা পা তুলে নিতে বাধ্য হলো রাশিয়ার মাটি থেকে। রিগাতে [ Riga ] সন্ধি হলো, পোল্যাণ্ডের সাথে। সীমান্ত-সমস্যার একটা সম্মানজনক মীমাংসা করলেন বলশেভিক সরকার। এই সঙ্গে রুশ সরকার এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটাভিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন।

এই হলো রুশ-বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা।

ইউরোপ তথা বিশ্বের একটি দেশ সাম্রাজ্যবাদের শিকল চূর্ণ করে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্যকে মুছে দিয়ে, সর্বহারাদের বিপ্লবকে সফল করলো। ঘটনাটিকে তৎকালীন পটভূমিতে একটি বিচ্ছিন্ন ও বিরল ঘটনা বলেই মনে হয়। কিন্তু এর এমন সাফল্যের কারণ কি? কারণগুলি বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ।

বৈদেশিক কারণ তিনটি :

প্রথমত, অক্টোবর বিপ্লব যখন আরম্ভ হয়, তখন বিশ্বযুদ্ধের মধ্যলগ্ন। ইঙ্গ-ফরাসী-আমেরিকান গোষ্ঠী প্রাণপণে লড়ে চলেছে আস্ট্রো-জার্মান গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ। নিজেদের মধ্যে এমন জীবন-মরণ সংঘর্ষে লিপ্ত থাকায় তাদের পক্ষে অক্টোবর বিপ্লব বিধ্বস্ত করা সাধ্যাতীত ছিল। অক্টোবর বিপ্লবের পক্ষে এই ঘটনার গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। ওদের লড়াইয়ের সুযোগে বিপ্লবীরা নিজেদের শক্তিকে সংহত করে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ব্লক তখন ক্রমশই অবসন্ন হয়ে পড়েছে। মেহনতী মানুষরাই তখন শান্তির জন্য আকুল হয়ে যুদ্ধের বদলে চাইছে শান্তি এবং শান্তির পথ হিসাবে স্বতস্ফূর্ত-ভাবে তারা এগিয়ে গেছে বিপ্লবের পথে। মেহনতী মানুষরাই

ঘৃণিত যুদ্ধকে স্তব্ধ করে দেয়। এর ফলে পাশ্চাত্যে শ্রমিকদের মধ্যেও রুশ-বিপ্লবের প্রতি ব্যাপক সহানুভূতি দেখা দেয়।

তৃতীয়ত, ইউরোপের সর্বত্রই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এক সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সম্ভাবনা বর্তমান ছিল। রুশ দেশে সরকারপক্ষ দুর্বল হওয়ায় সেই বিপ্লব দ্রুত সাফল্য অর্জন করে। এই বিপ্লব বিশ্বের অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী মানুষদের কাছ থেকে বিপুল নৈতিক সমর্থন লাভ করেছে।

আর আভ্যন্তরীণ কারণ সাতটি:

এক: রুশীয় শ্রমিকগণ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে এই বিপ্লবকে সমর্থন করেছিল।

দুই: ভূমিহীন কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষরা হাত মিলিয়েছিল শ্রমিকদের সাথে।

তিন: যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ নিঃস্ব, লাঞ্ছিত, অপমানিত রুশ সৈনিকরাও নিঃসংশয় চিত্তে বিপ্লবকে সমর্থন জানায়।

চার: বলশেভিক দলের নেতৃত্ব ছিল বহু-পরীক্ষিত। লেনিনের মতো নেতার আবির্ভাব এই বিপ্লবের সাফল্যের পক্ষে ছিল অপরিহার্য।

পাঁচ: অক্টোবর বিপ্লবের আগেই ১৯০৫ সালে কৃষক বিদ্রোহের ফলে বুর্জোয়াশ্রেণী বহুলাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অক্টোবর বিপ্লব তাই তাদের অনেক সহজে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

ছয়: রেডগার্ডদের শক্তি ও নেতৃত্ব এই বিপ্লবকে সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সাত: দেশের আভ্যন্তরীণ খাদ্য, জ্বালানী ও কাঁচামালের সমস্ত সঞ্চয় বিপ্লবীদের হাতে চলে আসায় অক্টোবর বিপ্লব দ্রুত সাফল্য অর্জন করে।

এই সমস্ত আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিস্থিতির জন্য অক্টোবর বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, অক্টোবর বিপ্লবের কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি ছিল না। বরং, কৃষিনির্ভর

অনগ্রসর দেশ হিসাবে রাশিয়ায় বিপ্লব অনুষ্ঠানের অনেক বাধা ছিল। বিশ্বের সর্বপ্রথম সাম্যবাদী বিপ্লব অনুষ্ঠিত হলো এমন একটি দেশে, যে দেশের কোন বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতাই ছিল না। তাই বিপ্লবের প্রথম কয়েক বৎসর বিপ্লবী রাশিয়াকে নিদারুণ দুরাবস্থায় পড়তে হয়েছিল। পরবর্তী কালে, যে সমস্ত দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটলো, সে সমস্ত দেশকে এ'খানি প্রারম্ভিক বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়নি। কারণ তারা একটি পূর্ব নির্দিষ্ট পথ দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু রুশ বিপ্লবীরা তা পান নি!

রুশ বিপ্লবকে বিশ্ব-বিপ্লব রূপে বিস্তারিত করবার একটা উদগ্র ঝোঁক দেখা দিয়েছিল রুশ নেতা ট্রটস্কীর চিন্তায়। কিন্তু এর অবাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন লেনিন এবং তাঁকে সতর্কতার সাথে বাধা দিয়েছিলেন পরবর্তী রাষ্ট্র নেতা যোশেফ ষ্টালিন। বিপ্লব কখনো আমদানী করা যায় না, রপ্তানী করবার মতো পণ্য সামগ্রীও সে নয়। একসাথে বিশ্ব-বিপ্লবের ধুঁয়ো তুলে বস্তুতপক্ষে সর্বহারাদের সংগ্রামকে নিস্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। শোষণতান্ত্রিক দেশগুলিতে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে সাম্যবাদী বিপ্লবের দিন ঘনিয়ে আসবে। কিন্তু সমস্ত দেশেই যে একই লগ্নে বিপ্লব সম্পাদিত হবে, —এমন চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়া বাতুলতা মাত্র।

লেনিন বলেছেন, "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যবস্থা এমন একটা রূপ নিয়েছে, যেখানে ইউরোপের একটি রাষ্ট্র জার্মানী আজ বিজয়ী দেশগুলির দ্বারা চূড়ান্তভাবে শোষিত হচ্ছে। পশ্চিমী বিজয়ী শক্তিগুলি এই জয়ের সুযোগ গ্রহণ করে, নিজ নিজ দেশের অত্যাচারিত শ্রেণীগুলির জন্য কতকগুলি সামান্য সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করে দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সামান্য হওয়া সত্ত্বেও এই সুযোগ-সুবিধাগুলি ঐ সমস্ত দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে এবং 'সামাজিক শান্তির' একটা নকল চেহারা তুলে ধরেছে।"

"আবার সাথে সাথে গত সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধেরই ফলস্বরূপ কয়েকটি পীড়িত দেশ—যেমন প্রাচ্যের ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি— তাদের অভ্যস্ত ধারা থেকে একেবারে সরে গেছে। তাদের এতকালের বিকাশের ধারা পরিবর্তিত হয়ে ইউরোপীয় পুঁজিতন্ত্রের পথ ধরেছে। সাধারণ ভাবে ইউরোপে যে চাঞ্চল্য, প্রাচ্য দেশগুলিতেও তা সঞ্চারিত হচ্ছে। তমাম তুনিয়ার দৃষ্টিতে আজ এ কথা স্পষ্ট যে, প্রাচ্য দেশগুলিকে যে পথে টেনে আনা হচ্ছে, তাতে একদিন সমগ্র পুঁজিতন্ত্রেরই সংকট ঘনিয়ে আসবে!"

রুশ বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে লেনিনের এই দূরদৃষ্টি দেখে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। রুশ বপ্লবের অর্ধশতাব্দী পর আজ সেই উক্তির চূড়ান্ত সত্যতা প্রমাণিত হতে চলেছে। সত্যই প্রাচ্যের দেশগুলিই পুঁজিতন্ত্রের সংকট ঘনিয়ে তুলেছে। চীনের মহাবিপ্লব ধনতান্ত্রিক তুনিয়ায় এক মস্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে, কোরিয়ার যুদ্ধে ছয় লক্ষ মার্কিন ফৌজের রক্ত পীতসাগর শুষে নিলো, ভিয়েতনামের রণাঙ্গনে পেন্টাগণদের সুখস্বপ্ন চুরমার হয়ে গেলো, জাপানে মার্কিন বিরোধী আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে, হৃতমান বৃটেন তার তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়েছে, গুটিয়ে নিয়েছে তার পড়তি নৌ-শক্তিকে সিঙ্গাপুর থেকে,—সর্বত্রই পুঁজিতন্ত্রবাদের মহাসংকট! নিকট প্রাচ্যে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং দূর প্রাচ্যে পুঁজিতন্ত্রের আজ ঘোরতুর্দিন!

## ॥ পাঁচ ॥

কাছাকাছি এসে গেছি আমরা।

এ রকম রাত্রি ফ্রান্সে থাকাকালীন আমি আর কখনো দেখিনি। সাততলা বাড়ীর ছাদের উপর আমরা। ইচ্ছে হয়, আরো উঁচুতে জলের ট্যাঙ্কটার উপর উঠে বসি। উঁচুতে শুধু উঁচুতে উঠবার নেশা। পূর্ণিমার চাঁদ সর্বত্র লেপ্টে আছে—আমার গায়ে, ওর গায়ে, থাম-গুলোর গায়ে গায়ে, মসৃণ রাস্তার উপর, ফুলের কেয়ারিতে, আলোর বান ডেকেছে,—চন্দ্রালোকে সব রূপালী!

এই রাত্রে তুঁলো আমার কাছে ধরা দিয়েছে। এই সর্বপ্রথম। চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে তুলেছি ওর প্রায় সুপ্ত মুখখানাকে। বার বার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, আমি ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেই তুঁলোকে নিয়ে যাবো সেই দেশে। পরগাছার মতো বিদেশে পড়ে থাকতে আমার সম্মানে বাধে! যেমন করেই হোক, একটা কিছু কাজ নিশ্চয় আমি আমার দেশে যোগাড় করে নিতে পারবো। দেশের প্রতি আমার কর্তব্য অনেক। ক্ষীণ স্বাস্থ্য, কিন্তু কলম তো আছে। কলমটাকে পরিমার্জিত করবার সাধনায় ডুব দেবো এবার।

যাই হোক, তুঁলো এখন আমার বক্ষলগ্না। ওর বুকের প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠানামা আমি অনুভব করতে পারি। তুঁলোর বেদনার ইতিহাস আমার জানা হয়ে গেছে। জীবনে একটা মস্ত ভুল সে করে বসেছিল একবার। এক মার্কিন শিক্ষাবিদের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল! বয়স ছিল তখন ওর মাত্র ষোলো কি সতেরো। প্রথম বয়সের দুর্বলতায় সে যথাসর্বস্ব সমর্পণ করেছিল সেই মধ্যবয়স্ক মার্কিন লোকটিকে। পরে সে হঠাৎ প্যারিস ত্যাগ করে কোথায় যেন উবে যায়। আরো পরে তুঁলো জানতে পারে, লোকটি এখন চেক-সীমান্তে বন্-সরকারের আতিথ্য নিয়ে আছে। নিঃসন্দেহে

Central Intelligencyর হয়ে কাজ করে চলেছে। একাধিক জার্মান রমণীর সঙ্গসুখে দিনগুলি তার আরো মধুময়!…

তুঁলোর কান্নাভেজা কাহিনী শুনে গভীর আবেগে ওকে আঁকড়ে ধরি। একজন ভারতবাসীর সততা, বিশ্বাস ও নিষ্ঠাকে উপহার দিতে চাইলুম। ও তা সকৃতজ্ঞে গ্রহণ করতে উন্মুখ। এখন শুধু আমার দেশে ফেরবার অপেক্ষা!··

দেশে ফিরে এলাম ১৯৬৯ এর জানুয়ারীতে।

আমার গবেষণা সমাপ্ত। বস্তুবিজ্ঞানে ডিগ্রি নিয়ে ফিরছি প্যারিস বিশ্ববিত্তালয় থেকে। কিন্তু এখানে এসে হতাশ। মোহ ভাঙ্গতে দিন দশেকই যথেষ্ট। বাংলা দেশের তপ্ত মাটির বুকে দাঁড়িয়ে অনুভব করা যায়, কেন এ দেশের প্রতিভারা চিরদিন প্রবাসে থাকতে চান! বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে বসে ভারতবর্ষের নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আবেদন করেও কোন ফল পেলাম না। সর্বত্র No vacancy—চাকুরির কোন সংস্থান নেই। "এ যেন সেই ধার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না,—অহেতুক কেন আবেদন করিতেছেন?" অথচ, এমন দেশে পুঁজিবাদের কী অবাধ রাজত্ব!—অটোমেশানের অট্টহাসি না শোনালেই নয়?

হ্যাঁ, কাজ অবশেষে একটা পেলাম।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ক্যাশিয়ার হলাম আমি। মাইনে পত্তর অন্যান্য চাকুরিজীবীদের তুলনায় খারাপ নয়। কিন্তু কাজের বহরে পেটের বিদ্যে বাষ্পীভূত হ'য়ে যাবার যোগাড়। শুধুই টাকার বাণ্ডিল গুণে চলা,—এক থেকে একশ'। লক্ষ লক্ষ টাকার পাহাড়, —চোখ আর মনে জ্বালা ধরে যায়।

খাজাঞ্চি দাশগুপ্তের কর্মব্যস্ততা দেখে অবাক হই। এজেণ্ট দত্তগুপ্তের অফিসার সুলভ গাম্ভীর্যটুকুও লক্ষণীয়।

অফিসে কাজের চাপে মাথা তুলতে পারছি না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে রেমিট্যান্স এসেছে। টাকা গুণে চলেছি। আঙ্গুলগুলো ব্যথায় টন টন করছে। সময় সময় ইউনিয়নের কাজে মেতে উঠি।

ইউনিয়ন সেক্রেটারী দীলিপ মুখোপাধ্যায় বর্ধমান, কলকাতা, কানপুর, জয়পুর ঘুরে এসে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন, সহকর্মী বীরেন রায় বর্ণনা করেন তাঁর খেলোয়াড় জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়, মেমারির ছেলে শিশির দে কাঁচা খিস্তি দেয়, অপর এক সদ্যবিবাহিত সহকর্মী মোটা সোটা মৃণাল সেন কেমন যেন ঘুমের আবেশে ঢুলছে।

অফিসের কাজ সেরে ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত জমাট বেঁধে আসে। আকাশের দিকে তাকিয়ে তুঁলোকে স্মরণ করতে থাকি। মনে পড়ছে, সেই স্বাপ্নিক দিনগুলির কথা!

সমস্যা! তুঁলো, ভারতবর্ষে যুবশক্তির চূড়ান্ত অপচয় হচ্ছে। এমন ভয়াবহ বেকার সমস্যা কোন ইউরোপীয় দেশে থাকলে এতদিনে হয়তো বিপ্লবের পটভূমি রচিত হতে পারতো। পরিকল্পনা,—হাজার হাজার কোটি টাকার কত প্রকল্পে হাত দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সুরাহা হচ্ছে কোথায়? মুক্তির পথ এখানে অবরুদ্ধ!

পুঁজিবাদের এক নিরাপদ আশ্রয় ভূমি করে তোলা হয়েছে এই ভারতবর্ষকে। মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীর কব্জায় এসে গেছে দেশের অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় শক্তি। ধনী-দরিদ্রের ফারাক দিনের পর দিন দুস্তর হয়ে উঠছে। পণ্ডিত নেহেরু তবু 'সমাজতন্ত্রের' কথা বলতেন, ইদানীং ঐ শব্দটিও আর রাজধানীর মন্ত্রীরা উচ্চারণ করেন না, বোধ হয় লজ্জা পান।

কিন্তু ভারতবর্ষেও শ্রেণী-সংগ্রামের সূচনা আর অদৃশ্য নয়। কেরল, পশ্চিম বাংলা ইত্যাদি প্রদেশে মোটামুটি সমাজতান্ত্রিক দলগুলি পরস্পর হাতে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করেছে! মধ্যবিত্তের আশা আকাঙ্খা দানা বেঁধেছে এই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ঘিরে!

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, সর্বহারাদের জন্য এই সরকার কতটুকু করতে পারবেন? পেটি বুর্জোয়াদের নিয়ে একটা স্তর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর, কিন্তু তারপর নেতৃত্ব তুলে দিতে হবে সর্বহারাদের হাতে। দিতেই হবে।

বাংলার যুব সমাজ আজ অশান্ত। জীবনের কোন নিরাপত্তা তাদের নেই! অসহ্য বেকারত্বের জ্বালায় ছটফটিয়ে উঠছে! ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় বাংলা দেশের উপর সবচেয়ে অবিচার করা হয়েছিল। যেন বাংলার মনীষাকে হত্যা করবার একটা ঘৃণ্য চক্রান্ত করেছিলেন আমাদের তথাকথিত মাননীয় সর্ব-ভারতীয় নেতারা। নেহাৎ শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন, তাই ক'লকাতাকে বুকে চেপে পশ্চিমবঙ্গ তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

১৯৪৭ সালের পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা ছিল আড়াই কোটি। আজ সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চার কোটির উপর। পূর্ববাংলা থেকে ষাট লক্ষের উপর উদ্বাস্তু এসেছে। আসছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে কর্মহীনের দল কাজের সন্ধানে। এরকম অবাঙ্গালী শ্রমিক ও ব্যবসায়ীর সংখ্যাই হলো সত্তর লক্ষের উপর। বাঙ্গালীদের মনে কোনদিন সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা স্থান পায় নি, তবু আজ বাঁচার প্রশ্নে পশ্চিমবাংলায় বাঙ্গালীরা কর্মসংস্থানে তাদের প্রাধান্য দিতে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে! এটা তো স্বাভাবিক!

সর্বত্রই অসন্তোষ. শিক্ষক, ছাত্র—উভয়েই আজ নিজ নিজ দাবীপত্র হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, মহাকরণের সামনে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলে দারুণ ভাঙ্গন ধরেছে। কংগ্রেস ভাঙ্গছে, পি. এস. পি. ভাঙ্গছে, ভাঙ্গছে ভারতীয় ক্রান্তি দল. কমিউনিষ্ট পার্টির তো কথাই নেই,—এক থেকে দুই হলো, দুই থেকে তিন এবং তিন থেকে চার হতেও হয়তো খুব বেশী দেরী নেই।

তবু ওরই মধ্যে জনগণের ইচ্ছার স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। ভারতীয় গণ-মানস ক্রমশই সচেতন হয়ে উঠছে। ধনতন্ত্রীরা নিজেদের মুখোশ খুলে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে,---তাদের ফ্যাসিস্ত চরিত্র আজ পদে পদে ধরা পড়ে যায়। তবু নবীনের অনিবার্যতাকে রোধ করে সাধ্য কার? দ্বান্দ্বিক নিয়মে নবীনের আগমন এখন সুনিশ্চিত।

ফ্রান্সে যেমন কাফেতে এখানে তেমনি রাস্তার মোড়ে মোড়ে, চায়ের দোকানে রাজনীতি, সিনেমা ও খেলা নিয়ে তুফান ওঠে। প্রায়ই এলোপাথাড়ি প্রশ্ন ও জবাব আসে চীনের আধুনিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে। মাওসেতুং সম্পর্কে নানা জনে নানা মত পোষণ করে। একদল তাঁকে যুদ্ধবাজ ও মেগালোম্যানিয়াক রাজনীতিজ্ঞ বলে মনে করে, আবার অপর একদলের মতে তিনিই প্রকৃত সর্বহারা বিপ্লবের নেতা।

যে যাই সমালোচনা করুন না কেন, Long March এর নেতা মাওসেতুংকে ইতিহাস কিন্তু চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। ওপিয়াম ওয়ার থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত দুর্বল, পদলাঞ্ছিত, দুর্ভিক্ষ পীড়িত চীনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন সর্বহারাদের নেতা মাওসেতুং।

মাওয়ের কৃতিত্ব আলোচনা করতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হয় ১৯৪৫ সালে। মার্কিন পুঁজিবাদ তখন সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত। পরাজিত জাপান সরে গেছে, কিন্তু তাঁর ফেলে যাওয়া জুতো পায়ে গলিয়ে পেণ্টাগনরা অবাধে ঘুরে বেড়াতে চায় দূর প্রাচ্যে ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়। সবচাইতে লোভনীয় বিশাল চীনের অপরিমেয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও আন্তর্জাতিক বাজার।

মরণপণ যুদ্ধ করে জাপানীদের হটিয়ে দিলো চৈনিক জনসাধারণ। আর সেই বিজয়ের ফসল ঘরে তুলতে চাইলো মার্কিন রাজপুরুষরা। সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক,—তিনদিক থেকেই মার্কিন অনুপ্রবেশ চললো। যতদিন জাপানীদের হামলাবাজি চলছিল, ততোদিন এদিকে চৈনিক সমাজতন্ত্রবাদীরা দৃষ্টি ফেরবার সময় পান নি। জাপানীদের হটাতে তাঁদের হাত মেলাতে হয়েছিল মার্কিন সমর্থন পুষ্ট কুয়েং মিটাংদের সাথে।

কিন্তু যুদ্ধ শেষে পরিষ্কার হয়ে গেলো, জেনারেল চিয়াং কাইশেক এই মহাচীনকে কার মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। রাষ্ট্র প্রধানের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে মার্কিনদের জন্য অবাধ রাজত্ব করে দিতে চান চিয়াং।

ডলারের রাজত্ব এখানে একবার কায়েম হতে পারলে, চিয়াং তাঁর রাজত্বকাল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করতে পারবেন।

সামরিক ক্ষেত্রে আমেরিকার খবরদারি তখন অসহ্য হয়ে উঠছে। মার্কিন জেনারেল ম্যাকার্থার জাপানী বাহিনীকে হুকুম করলেন, তাঁরা যেন চীনের গণশক্তির [People's Force] কাছে আত্ম-সমর্পণ না করে! তাদের সম্পর্কে বিবেচনা করবার একমাত্র অধিকার আছে আমেরিকান সরকার ও জেনারেল চিয়াং কাইশেকের। জেনারেল চিয়াং আরো একধাপ এগিয়ে জাপানীদের কাছে প্রস্তাব রাখলেন, সম্ভব হলে তারা যেন এখনই গণ-ফৌজকে আক্রমণ করে। মার্কিন ও কুয়েং মিটাং বাহিনী তাতে বাধা দেবে না। জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়বার সময় চীনে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। অথচ, যুদ্ধের পর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল দেড় লক্ষে। আমেরিকার বোমারু বিমানগুলি চক্কর খেতে থাকে মহা-চীনের আকাশে, পীত সাগরে! ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বিশাল মার্কিন নৌবহর।

এগিয়ে চললো চীন রক্তাক্ত গৃহ যুদ্ধের পথে।

চীনের জনগণ তো আর মার্কিন প্রভুদের পদলেহনের জন্য জাপানীদের সাথে লড়াই চালায় নি। তারা চেয়েছে সর্বহারাদের হাতে রাষ্ট্রীয় শক্তি তুলে দিতে। চেয়েছে জাতীয় মুক্তি। তারা চায়নি গৃহ যুদ্ধের রক্তাক্ত স্বাক্ষর আঁকতে, চেয়েছিল দেশকে নতুন প্রাণ শক্তিতে গড়ে তুলতে।

কুয়েং মিটাংরা যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে দ্রুত কল-কারখানা, উৎপাদন ব্যবস্থা, কৃষিক্ষেত্র নিজেদের কব্জায় এনে ফেলতে, উঠে পড়ে লেগে যায়। ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা অতিদ্রুত লয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত চীনে কায়েম হতে থাকে। দেশের সর্বনাশ করে নিজেদের স্ফীত করে তুলতে লাগলেন "চারটি বৃহৎ পরিবার" [Four big families] —চিয়াং কাইশেক, অর্থমন্ত্রী এইচ. এইচ. কুং, বৈদেশিক মন্ত্রী টি. ভি. সুং এবং কুয়েং মিটাং দলের কর্মকর্তা চেন পরিবার। এই সমস্ত

স্বার্থপর প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ সাম্যবাদীদের নেতা মাও সেতুংয়ের ব্যক্তিত্বের কাছে নেহাৎ তুচ্ছ। এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল, কল-কারখানার শ্রমিকদের দ্বারাই সাম্যবাদী বিপ্লবকে জয়যুক্ত করা যায়। কিন্তু মাও সেতুং প্রমাণ করলেন কৃষকদের নেতৃত্বেও সর্বহারাদের বিপ্লব সার্থক হতে পারে। এতদিন বিপ্লবের জন্মস্থান ছিল শহরে, বড় বড় শিল্প সমৃদ্ধ নগরে। কিন্তু চীন দেখালো, কৃষি নির্ভর গ্রামগুলি থেকে কী ভাবে বিপ্লব এগিয়ে আসছে শহরের দিকে! চৈনিক সমাজতন্ত্রের তাই শ্লোগান:

"Down with the local Tyrants and Evil Gentry!
All power to the Peasant Associations!"

এই শ্লোগানেই আধুনিক চৈনিক ইতিহাসের মূল সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে!

মধ্য চীনের হুনান প্রদেশে বিপ্লবের পূর্বাহ্নে গিয়ে মাও সেতুং নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

"আমি সম্প্রতি ঘুরে এলাম হুনান প্রদেশে।...৪ঠা জানুয়ারী থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী,—এই বত্রিশ দিনে বিভিন্ন সভায় উপস্থিত হয়েছি। এই সভাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন অভিজ্ঞ কৃষকরা এবং কৃষক-আন্দোলনে অভিজ্ঞ আমাদের বন্ধুরা। আমি গভীর আগ্রহে তাদের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনেছি এবং প্রচুর তথ্যও এই ভাবে সংগ্রহ করতে পেরেছি।...আমি এমন অনেক অদ্ভুত জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি বা শুনতে পেয়েছি, যাদের সম্পর্কে এর আগে আমি অবহিত ছিলাম না। আমি বিশ্বাস করি, অনুরূপ অবস্থা চীনের অন্যত্রও বর্তমান। ...খুব অল্প সময়ের মধ্যে মধ্য, দক্ষিণ ও উত্তর চীনের প্রদেশ গুলিতে প্রচণ্ড শক্তিশালী কৃষক-বিপ্লবের সূচনা দেখা দেবে। ভয়ঙ্কর ঝড়ের মতো এর তীব্রতা, বিশ্বের কোন শক্তিই এর গতিরোধ করতে পারবে না,—ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো উড়ে যাবে। সমস্ত রকম পুরানো বন্ধনকে তারা চূর্ণ করবে এবং মুক্তির পথে দ্রুত ধেয়ে যাবে। তাঁরা ঝেঁটিয়ে বিদায় দেবে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীদের, অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের,

দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের, স্থানীয় স্বেচ্ছাচারীদের এবং বদ রাজনীতিজ্ঞদের। এদের কবরের কিনারে এনে দাঁড় করানো হবে।...

প্রত্যেক বৈপ্লবিক সংগঠন এবং প্রত্যেক বিপ্লবী বন্ধুকে তখন যাচাই করে নেওয়া হবে,—তারা এই বিপ্লবের উপযুক্ত কিনা! না হলে, তাদেরও আবর্জনা স্বরূপ দূরে সরিয়ে দিতে হবে।..."

এই হলো মাও সেতুং-এর পর্যবেক্ষণী অভিজ্ঞতা। অটুট মনোবল, বিস্তৃত অভিজ্ঞতা এবং অপরিমেয় উৎসাহ নিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন চীনকে নেতৃত্ব দিতে।

১৯৪৬ সালে চীন-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হলে মহাচীনে ডলারের প্রাধান্য আরো বৃদ্ধি পায়। অবাধে মার্কিন দ্রব্য চীনের বাজারে প্রবেশ করতে থাকে।

আমেরিকার সস্তা মালের কাছে মার খেতে থাকে চীনের নিজস্ব শ্রমলব্ধ বস্তুগুলি। বিমান পথ, রেলপথ—সর্বত্রই হোয়াইট হাউসের কর্তৃত্ব! চীনের খনিগুলিও ইজারা নিয়ে আছে পশ্চিমের এই মুরুব্বী মহলটি।

এর পর আছে কাইশেকের বাজেটের বহর। জাতীয় আয়ের মোটা অংশই কুয়েং মিটাং সরকার তাঁর সেনাদের পুষতে খরচ করে ফেলছেন। ঘাঁটতি হচ্ছে অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। সেই ঘাঁটতি পূরণে নোট ছাপা হচ্ছে। দেখা দিচ্ছে মুদ্রা-স্ফীতি!...Bureaucrat-Capitalistরা তাদের জাল বিস্তার করেই চলেছে, বড় মাছ গিলে খাচ্ছে ছোট মাছগুলিকে। চন্দ্রহীন, তারকাহীন আকাশ,—নিকষ কালো প্রেতের রাজত্বে শুধুই উল্কাপাত!

সেই চণ্ডযুগে গণ-বিক্ষোভ দ্রুত দানা বাঁধতে থাকে। কারখানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট করছে, কৃষকরা তালিম পাচ্ছে গোরিলা যুদ্ধের, পুঞ্জ পুঞ্জ বারুদে অগ্নি সংযোগের মহড়া চলেছে।

মার্কস-এঙ্গেলসের বাস্তব রূপকার লেনিন।

এবার আর একবার তার প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখালেন, মাওসেতুং।

মার্কিন সৈন্যদের চরিত্র জাপানীদের চাইতেও জঘন্য ও ঘৃণ্য হয়ে ওঠে। প্রায়ই হত্যাকাণ্ড ও নারী-ধর্ষণ তাদের বৈশিষ্ট্য। চীনারা ওদের নামে থুথু ফেলে মাটিতে, দারুণ অভিমানে-অপমানে হাত দুটো মুষ্টি বদ্ধ হয়ে আসে।

কাইশেক-পেন্টাগন-আঁতাত [illegible] হয়।

এই অন্তিম-লগ্নে তারা দক্ষিণ আফ্রিকার হিংস্র শ্বাপদের চাইতেও ভয়ানক। গুলির মুখে, চোখ রাঙিয়ে তাদের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। সাংহাইয়ের একটি কাপড়ের কলে ধর্মঘট চলছে। শ্রমিকরা শত চোখ-রাঙানিতেও কাজ করতে রাজি নয়। শ্রমিকদের অধিকাংশই নারী। মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে কারখানার চত্বরে দাঁড়িয়ে তারা শ্লোগান দিচ্ছিলো। হঠাৎ বিনা প্ররোচনায় একটি মার্কিন ট্যাঙ্ক চালিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ে কয়েক শত কুয়েং মিটাং সৈন্য। ট্যাঙ্কের কামান গর্জে ওঠে। ঝপ্ ঝপ্ কারখানার প্রাঙ্গণে প্রাণহীন দেহগুলি লুটিয়ে পড়ে। জীবিতরা পালাবার চেষ্টা করছে, সেই ভীত নারী-শ্রমিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো চিয়াং-এর চরেরা। বন্য উল্লাসে ওদের প্রতিটি অভিব্যক্তি হিংস্র, ট্যাঙ্কটির রক্তমুখ বেয়ে ক্ষণে ক্ষণে অগ্নি বমন,—ইতিহাসে এমন দৃশ্যের অভিনয় খুব বেশী এর আগে হয় নি।

মার্কিন নৌ-দপ্তর কুয়েংমিটাং গুপ্তচরদের হাতে তুলে দিয়েছে নিঃশব্দ-পিস্তল! চিয়াং কাইশেক তাদের অধিকার দিয়েছেন, দলের স্বার্থে অবাধে হত্যা করবার। বিপ্লবী অথবা প্রগতি চিন্তাধারার মানুষ মাত্রই তাদের শিকার। চীনের কত শ্রেষ্ঠ সন্তান যে, তাদের চোরা-গোপ্তা আক্রমণে প্রাণ হারালেন, তার কোন হিসাব নেই।

প্রাণ হারালেন অধ্যাপক ওয়েন, লি-কাং পোর মতো সব চিন্তাবিদরা। কলেজ প্রাঙ্গণে সশস্ত্র চিয়াং বাহিনী ঢুকে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদেব উপর মেশিন গানের গুলি বর্ষণ করে, অনেক সময় হোষ্টেলে ঘুমন্ত ছাত্রের বুক লক্ষ্য করে পিস্তল ছোঁড়া হয়েছে।

নির্বিচারে হত্যা, জেলখানায় পাঠানো, বিচারের প্রহসনে মৃত্যুদণ্ড,—কুয়োমিটাংদের কার্যকলাপ নাৎসী স্বেচ্ছাবাহিনী এস. এ. এবং এস. এস. দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু এমন অবস্থা চিরদিন চলতে পারে না। কারণ, এটা ১৯১৯ অথবা ১৯২৭ অথবা ১৯৩৯ সালের চীন নয়। ঐতিহাসিক পটভূমির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। জাতীয় মুক্তির আহ্বানে সাম্যবাদী চৈনিক জনগণ পরস্পর আদর্শে, প্রতিজ্ঞায় সংবদ্ধ। ইতিহাসের জঞ্জাল চিয়াং কাইশেকের প্রতিটি প্রয়াস তাই সেই মুহূর্তে ব্যর্থ হতে বাধ্য। ব্যর্থ হতে বাধ্য মার্কিনদের ছলা-কলা।

মার্কিন সেনাপতি জেনারেল মার্শাল তো প্রকৃত পক্ষে সাম্য-বাদীদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা শুরু করে দিলেন। একটি মার্কিন সমর্থন পুষ্ট কাগজ China Weekly Review পর্যন্ত জেনারেল মার্শালের ভূমিকাকে চেপে রাখতে পারে নি :

"For our part we are still attempting to figure out whether General Marshall has come here as an American mediator or as the commander of the combined American—Nationalist i.e. kuomitang forces."*১১

ইউ. এস. এর মিলিটারী মিশনরা এবার সরাসরি চীনের গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে থাকে। পেণ্টাগনদের এই চরিত্র ইতিহাস কখনো ক্ষমা করে না। চীনের বুকে তাদের যা ভূমিকা, আধুনিক ভিয়েতনাম রণাঙ্গনে তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

গৃহ-যুদ্ধের প্রথম পর্বে ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত চীনের গণ-মুক্তি ফৌজ কুয়োং মিটাং ও মার্কিন সৈন্যদের হাতে মার খেতে থাকে, চীনের অধিকাংশ বড় বড় নগরগুলি থেকে তারা পিছু হটে আসতে থাকে, এমনকি,

---

China Weekly Review—Shanghai, June 22 1946.*১১

ইনান [ Yenan ] প্রদেশ থেকে তারা তাদের হেডকোয়াটারকেও সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু মাও সেতুং তাঁর শক্তিকে সুসংবদ্ধ করছেন চীনের হাজার হাজার গ্রামগুলিতে। গ্রামের লক্ষ লক্ষ কৃষক লাঙল ফেলে রাইফেল হাতে ছুটে আসে লাল পতাকাকে সেলাম জানাতে। গোরিলা যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সৈনিক তারা। তাদের অতর্কিত আক্রমণে কুয়েং মিটাং ও মার্কিন বাহিনী বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সাম্যবাদীদের মূল ঘাঁটিগুলির সন্ধানে তারা বৃথাই এলোপাথাড়ি আক্রমণ চালাতে থাকে। এতে তাদের শক্তিক্ষয় হয়, মানসিক ধৈর্য ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। ঠিক এমন কায়দাতেই লক্ষ লক্ষ মার্কিন ফৌজকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে ইদানীং ভিয়েতমিন্‌রা ভিয়েতনাম-রণাঙ্গনে।

যুদ্ধের সাথে সাথে সাম্যবাদী দল গ্রামগুলির সংস্কারও করতে থাকে। দ্রুত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটে সেখানে, সুদের পরিবর্তে মহাজনদের 'দাদন' নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ভূমি দাসরা মুক্ত ও নিজের পরিশ্রমের যথাযথ মূল্যের অধিকারী।

কুয়েং মিটাং বাহিনীর এরপর ক্রমাগত পরাজয়ে হতাশ হয়ে আমেরিকান সরকার তাঁদের 'শ্বেত পত্রে' স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, "The kuomintang troops found themselves in a position not dissimilar from that of the Japanese during their war with China···while the People's Army succeeded in keeping their own units intact and mobile for eventual concentration and use at points of their choosing.*১২

কোটি কোটি ডলারের মার্কিন সাহায্যের কোন সম্মান রাখতে

[১] United States Relations with China, U. S. State Department, 1949.*১২

পারলেন না চিয়াংকাইকেশ। চীনের মাটিতে আমেরিকার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারলেন না তাদের বহু যুদ্ধের কৃতি সৈনিক জেনারেল মার্শালও।

গণশক্তির কাছে জঙ্গীশক্তির পরাভব ঘটছে।

সাম্যবাদের কাছে পুঁজিবাদ মার খাচ্ছে।

যুগে যুগে বিপ্লবের চরিত্র পাল্টায়।

ইটালীর রেনেসাঁস সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উদারতার যুগ এনেছিল। ফরাসী বিপ্লব শিক্ষা দিয়েছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। রুশ বিপ্লবে প্রমাণিত হয়েছে, সর্বহারা শ্রমিকদের নেতৃত্বে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করা সক্ষম।

এবার চীন বিপ্লব দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে, কৃষকরাও বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্যবাদের জন্ম দিতে পারে।

বিপ্লবের জন্ম এখানে শহরে নগরে নয়। দূর দূর বিস্তৃত গ্রামগুলিতে লালিত-পালিত হয়েছে বিপ্লব। চৈনিক বিপ্লবের সার্থকতা এখানেই। বৈশিষ্ট্য এটাই। গ্রাম এগিয়ে এসে চেপে ধরছে শহরকে-নগরকে।···

কুয়েং মিটাংরা ক্রমশই বিছিন্ন হয়ে পড়ছে। জন-সংযোগ থেকে তারা অনেক দূরে। সবসময় এক ধরণের আতঙ্ক তাদের ঘিরে আছে। চোখের সামনে অন্ধকার,—আদর্শহীন অন্ধ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তারা। আন্দাজে গুলি ছুঁড়ছে, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হচ্ছে, পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে শক্তি ক্ষয় হচ্ছে।

কুয়েং মিটাং সেনাদলেও তাই অসন্তোষ ধিক্ ধিক্ করে জ্বলতে থাকে। এমন স্ব-বিরোধী যুদ্ধ চালাতে তারা আর নিজেদের কাছেই নৈতিক সমর্থন পাচ্ছে না।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে পার্টি কনফারেন্সে সহর্ষে মাও সেতুং বললেন, "আমরা এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছি। এই সন্ধিক্ষণ শুধু গৃহ যুদ্ধের নয়, সামগ্রিক অর্থে গত এক শত বৎসরের

চীনে সাম্রাজ্যবাদের অবসানে এক বিশেষ মুহূর্তে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি।"*১৩

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে চিয়াং কাইশেকের সমস্ত আস্ফালন শূন্যে মিলিয়ে গেল। ঐ সময়ের মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ কুয়েং মিটাং সৈন্য নিহত, অথবা বন্দী হয় সাম্যবাদীদের হাতে। সাম্যবাদীদের এই সামরিক সাফল্যের মূলে রাশিয়ার অবদানকে অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে। মার্কিন অস্ত্রের জবাব দেবার জন্য গণমুক্তি সৈনিকদের হাতেও থাকতো সর্বাধুনিক রুশ সমরাস্ত্র। মার খাচ্ছে মার্কিন সৈন্যরাও। আস্তে আস্তে পিছু হটে আসছে সাম্রাজ্যবাদী ব্লক। মুকডেনের যুদ্ধে পেন্টাগনের দলবলরা গণ-শক্তির আক্রমণের তোড়ে টিকতে না পেরে, জাহাজে চেপে সোজা পাড়ি জমায় স্বদেশের অভিমুখে। নখ-দন্তহীন বাঘের মতো দাপা-দাপি করছেন চিয়াং কাইশেক, কিন্তু থাবা বসাবার মতো শক্তি আজ তাঁর নেই।

১৯৪৯ সালের জানুয়ারী।

কুয়েং মিটাংদের শেষ শক্ত ঘাঁটি শান্টুংকে ঘিরে ফেলেছে সাম্য-বাদীরা। সাড়ে পাঁচ লক্ষের উপর চিয়াং বাহিনী হার মানতে বাধ্য হয় সেই একটি রণক্ষেত্রেই। গভীর হতাশায় মার্কিন সেনাপতি বার [ Barr ] লিখলেন, "চোখের সামনে দেখতে পেলাম, বিশাল কুয়েং মিটাং বাহিনী অবসাদগ্রস্তের মতো ভেঙ্গে পড়লো কমিউনিষ্ট-দের কাছে।...আমাদের অজস্র ভারী ভারী ট্যাঙ্ক, গোলা বারুদ এবং আরো রকমারি আধুনিক সমরাস্ত্র দখল করে নিলো মাও সেতুং-এর দলের লোকেরা। ওদের আরো শক্তি বৃদ্ধি ঘটলো।"

নিশ্চিত পরাজয়ের মুখোমুখি হয়ে নির্লজ্জ চিয়াং কাইকেশ এবার দেশের সমস্ত ভার আমেরিকাকে লিখে দিতে চাইলেন, বললেন,

১৩* The Present situation and our Tasks : Mao Tes Tung.

কোন আমেরিকান সেনাপতি এসে গ্রহণ করুন এ দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব!

কিন্তু মার্কিন সরকার জানতেন, খেল খতম হয়ে গেছে। বিশাল চীনের এক ছটাক জমিতেও পা রাখবার স্থান তাঁরা পাবেন না।

White House তাই বললে,

"We can't, for it would be a very serious matter for United States to send an officer to almost certain failure,"

১৯৪৯ সালের জানুয়ারীতে পিকিং পর্যন্ত ধেয়ে আসে সাম্যবাদী স্বেচ্ছাসেবকরা। কুয়েং মিটাংদের সৈন্যরা অনেক ক্ষেত্রেই বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করতে থাকে।

মার্কিন প্রভুরা শেষ চেষ্টা করলেন চৈনিক বিপ্লবের গতিকে রোধ করতে। অস্ত্রবলে ব্যর্থ হয়ে ডলারের চাকচিক্য দেখাতে এলেন। তাঁরা চাইলেন টাকা দিয়ে বিপ্লবীদের কিনে নিতে। অবশ্য টাকা দিয়ে আদর্শ কিনে নিতে তাঁদের জুড়ি নেই। ভারতবর্ষেও অনেকে এমন আদর্শের জন্য নাটকে, বক্তৃতার মঞ্চে এক সময় যথেষ্ট সোচ্চার থেকে হঠাৎ ডলারের টোপ গিলে ফেলেছেন ।

কিন্তু চীনে তেমন ধড়িবাজের সন্ধান বিপ্লবীদের মধ্যে পাওয়া গেলো না।

চিয়াং কাইকেশের সকরুণ আবেদনে বেশ কিছু বৃটিশ রণতরী এ সময় রক্ত চক্ষু দেখাতে চীনের উপকূলের দিকে আসছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাদের সেই উনবিংশ শতক-সুলভ Gunboat diplomacy এ যুগে একেবারেই অচল।

চৈনিক জনগণ কামান দাগতে থাকে।

সেই কামানের গোলার মুখে পড়ে বৃটিশ জাহাজগুলি আর এগিয়ে যেতে সাহসী হয় না। ওরা পিছিয়ে যায়,—ক্রমশই পিছু হটতে হটতে সিঙ্গাপুরে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

Newyork Herald Tribune আত্ম-সমালোচনা করলে,

"If effective foreign intervention were possible in China, the communist rebels might be dealt with in the same manner that the Boxer Rebellion with put down almost 50 years ago and the Taiping rebellion was put down in 1865......This cannot be done to day......A few western guns, or even many of them, are no longer effective instruments to cow and control millions of Asiatics,"

সাম্রাজ্যবাদীদের শিবির দুশ্চিন্তার কালো মেঘে আচ্ছাদিত। পুঁজিবাদ তার আত্মঅভিমান জ্ঞাপন করছে! কিন্তু সহানুভূতি পাচ্ছে না। বক্সার বিদ্রোহ ও তাই পিং উত্থান একদিন কামানের মুখে দমন করা হয়েছিল। সেদিন বিজয় সূচিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের।

কিন্তু আজ?

আজ ইতিহাসের চাকা উল্টোদিকে ঘুরছে। সাম্রাজ্যবাদের কবর খোঁড়া হয়ে গেছে, এবার তাতে কফিন পোরবার সময়। আত্মরক্ষার প্রশ্নই ওঠে না।

মার্কিন মিশনগুলিকে বাধ্য করা হলো চীনের ভূমি ত্যাগ করতে। জেনারেল চিয়াং কাইশেক অবশিষ্ট মুষ্টীমেয় অনুচর ও এতকালের শোষণ করা পুঁজি নিয়ে পালিয়ে এলেন তাইওয়ানে। সাগর বেষ্টিত ফরমোসাতে বসে মার্কিন প্রহরায় তাঁর দিন কাটছে। তাইপের পাহাড় গুলির দিকে তাকিয়ে হয়তো তাঁর চোখে জ্বালা ধরে যায়,—গত কয়েক বৎসরের দুর্বিসহ অভিজ্ঞতা তাঁকে এখানেও ভয় পাইয়ে দেয়।

মাঝে মাঝে মহাচীনের সীমান্ত থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা সমুদ্র পেরিয়ে সশব্দে ফেটে পড়ে ফরমোসার মাটিতে। সেই শব্দে ভয়ানক চমকে ওঠেন চিয়াং কাইকেশ। পেণ্টাগন প্রভুদের কাছে বার বার আর্জি পেশ করেন, হোয়াইট হাউস তাঁকে অভয় দেয়। সপ্তম মার্কিন নৌবহর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

মা ভৈঃ! দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুতুল সরকারকে রক্ষা করবে আমেরিকা, ফরমোসায় চিয়াং কাইশেককে আগলে রাখবে আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়াতে প্রতিক্রীয়াশীলদের সামনে মদত নিয়ে যাবে আমেরিকা, জাপানের বাণিজ্যেকে সাধ্যমত নিজের কব্জায় রাখবার দায়িত্ব পালন করবে আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, কাম্বোডিয়ায় সি. আই. এর কার্যকলাপ চালিয়ে যাবে আমেরিকা, পি এল. চারশ আশির ফলে প্রাপ্ত ভারতীয় টাকায় ভারতীয় যুব সমাজের উপর চাপিয়ে দেবে কিম্ভূত কিমাকার মার্কিন সভ্যতা!

চীন চলে এলো সাম্যবাদীদের শিবিরে। বিশ্বের বৃহত্তম গণশক্তি সাম্যবাদে দীক্ষিত হয়ে, অন্যতম আর একটি শক্তি-শালী রাষ্ট্রের পত্তন করলো। চীনের বিপ্লব মেহনতী মানুষের কাছে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মধ্যরাত্রিতে শুকতারা দেখে, গভীর সমুদ্রের নাবিক যেমন দিক নির্ণয় করতো, বর্তমান ও আগামী বিশ্বের বিপ্লবী জনগণও তেমনি চীন বিপ্লব থেকে তাদের পথের সন্ধান পাবে। কি বিপুল অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও দারিদ্র্য থেকে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে মুক্তি পেয়েছে বিশাল লাল চীন! চৈনিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক সফলতা যেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত রকমের শোষণ ব্যবস্থার অব-সানের মধ্যে দিয়ে, পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত মানুষ ও জাতির সম্পূর্ণ মুক্তি অর্জনের আর বেশী দেরী নেই।

## ॥ ছয় ॥

আমি কি বৈপ্লবিক আলোচনায় এখানেই ইতি টানবো ?

টানতে পারলে কিন্তু খুশীই হতাম। কারণ এরপর যে কথাটি আমার চিন্তার অর্গলে ঘা মারছে, তার সম্পর্কে যে মতভেদের অন্ত নেই! আমি কি শেষ পর্যন্ত চীনের সগর্ব ঘোষিত, বহু-আলোচিত, বহু বিতর্কিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে আমার সমাজতন্ত্রবাদী বন্ধুদের বিরাগ ভাজন হয়ে পড়বো ? হয়তো সে রকম সম্ভাবনা! ১৯৩৩ সালে চীন-ভারত সংঘর্ষের পর ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে দারুণ ভাঙ্গন ধরেছে। সি. পি. আই, সি. পি. আই [ এম ], নক্সালপন্থী সাম্যবাদী দল,—আদর্শের ভিন্নতায় এরা পরস্পরকে একদম সহ্য করতে পারেন না।

ব্যক্তিগত জীবনে এই তিন শিবিরেরই একাধিক সদস্য আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওদের বক্তব্য আমি শুনে যাই, তর্কে কদাচিৎ অংশ গ্রহণ করেছি। আজ আমার লেখাতে হয়তো ওঁদের মধ্যে কেউ কেউ আদর্শহীনতার গন্ধ পেয়ে যাবেন।

তবু লিখতেই হবে আমাকে।

পরস্পরের পিঠ চুলকানি আরো বদ অভ্যাস। তার চাইতে যা বলবার, অকপটে বলে ফেলাই ভালো।

লিখতে হবে তাই লিখছি। এবং খোলা মন নিয়ে লেখা উচিত। তারই চেষ্টা করবো।

প্রথমেই একটি কথা কবুল করে রাখছি, চৈনিক কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সেতুংয়ের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে আমি সর্বদাই সম্মান জানাতে প্রস্তুত!

মাও বলেছেন :

"শত পুষ্প বিকশিত হোক'—এই হচ্ছে শিল্প-কলা বিকাশের পথ। 'শত রকমের চিন্তাধারা প্রতিযোগিতায় নামুক'—এটাই হলো

বিজ্ঞান-বিকাশের পথ।…আমাদের ভুল যাতে কম হয় সেদিকেও আমাদের এই কাজের নীতি সহায়তা করবে। এমন অনেক বিষয় আছে যা আমরা বুঝিনা এবং সেই জন্য সেগুলি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে আমরা ব্যর্থ হই। কিন্তু আলোচনা, বিতর্ক ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেগুলি আমরা বুঝতে পারবো এবং কিভাবে সঠিক পদ্ধতিতে তাদের পরিচালিত করা যায়, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করবো।

ভিন্ন ভিন্ন মতের সংঘর্ষ ও বিতর্কের মধ্য দিয়েই কিন্তু প্রকৃত সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যা কিছু বিষাক্ত ও মার্কসবাদের বিরোধী সেগুলির সম্পর্কেও এই একই পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে, কারণ মার্কসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেই মার্কসবাদ বিকাশ লাভ করবে। এ হচ্ছে বিরুদ্ধবাদী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকাশ, এ হচ্ছে ডায়েলেক-টিকস্ অনুযায়ী বিকাশ।"

মানুষ কী যুগ যুগ ধরে 'সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্'-এর কথাই আলোচনা করে আসে নি? এদের বিপরীত হলো অসত্য, অশুভ ও অসুন্দর। শেষাক্ত বিষয়গুলির অবস্থান আছে বলেই প্রথমাক্ত বিষয়গুলির অস্তিত্ব সম্ভবপর। অসত্যের বিরুদ্ধেই সত্য দাঁড়িয়ে আছে।…সব সময় অসত্য ও অসুন্দর বস্তু থাকবে; সঠিক ও বেঠিক, শুভ ও অশুভ—এদের অবস্থান চিরায়ত। এমন উপমা সুগন্ধী পুষ্প ও বিষাক্ত আগাছা সম্পর্কেও সত্য। বৈসাদৃশ্য ব্যতিত বিভেদ হতে পারে না। আবার বিভেদ ও সংগ্রাম ছাড়া পূর্ণ সত্য বিকাশের ইতিহাস রচিত হতে পারে না। অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই প্রকৃত সত্য বিকাশ লাভ করে। অনুরূপ বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েই মার্কসবাদ বিকশিত হয়ে ওঠে এবং সংগ্রাম ব্যতিত এই বিকাশ সম্ভবপর নয়।

"মন খুলে বক্তব্য রাখবার' কর্মনীতিরই আমরা সমর্থক, অথচ এই নীতি আজ পর্যন্ত খুব কমই অনুসৃত হয়েছে। মন খুলে বক্তব্য রাখতে দিতে আমাদের ভীত হলে চলবে না, সমালোচনা

এবং বিষাক্ত আগাছাদের সম্পর্কেও আমাদের শঙ্কিত হলে চলবে না।

মার্কসবাদ বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এই বাদ কোন সমালোচনাকেই ভয় করে না। সমালোচনার দ্বারা মার্কসবাদকে পরাস্তও করা যায় না। কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনগণতান্ত্রিক সরকার সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য, তারা কোন সমালোচনাকেই ভয় করে না, এবং সমালোচনা দ্বারা তাদের পরাভূত করাও অসম্ভব।

সর্বদাই এমন কতকগুলি বিষয়বস্তু থাকবে যা, ভুল ও অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু তাদের ভয় করলে চলবে না। সম্প্রতি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ে কিছু ভূত ও দৈত্য-দানোর উপাখ্যান স্থান পাচ্ছে। এই সমস্ত অভিনয় দেখে কোন কোন কমরেড খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। কিন্তু এই সামান্য ঘটনায় চিন্তিত হবার কি আছে? মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই অভিনয় মঞ্চ থেকে এই সমস্ত দৈত্য-দানবের গল্পগুলি বিদায় নেবে। তখন আপনারা তা দেখতে চাইলেও দেখতে পাবেন না! যা কিছু সঠিক তাকেই আমরা উন্নত করবো এবং যা কিছু ভুল তাদেরই আমরা বিরোধিতা করবো।

আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া মতাদর্শ অবস্থান করবে; মার্কসবাদ বিরোধী মতাদর্শগুলি বিরাজ করতে থাকবে।···কারণ, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ফ্রণ্টে আমরা এখনো পরিপূর্ণ বিজয়ী হই নি। প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়াদের মধ্যে সংগ্রামে কোন্‌পক্ষ জয়ী হবে,—এ প্রশ্নের এখনো সত্যই কোন মীমাংসা হয়নি।···মতান্ধতা ও সংশোধনবাদ,—উভয়ই মার্কসবাদের বিরোধী। মার্কসবাদ নিশ্চয় এগিয়ে যাবে। ব্যবহারিক কাজের বিকাশের সাথে সাথেই মার্কসবাদেরও বিকাশ চাই। কিন্তু মার্কসবাদের মূলনীতিগুলি থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না; তা করলে অসংখ্য ভুল আমাদের ছেয়ে ফেলবে! মার্কসবাদকে অনড় কিছু একটা মনে করলে যেমন মতান্ধতা ছাড়া কিছুই

হয় না, মার্কসবাদের মূল নীতিগুলিকে অস্বীকার করলেও তা সংশোধনবাদ ছাড়া আর কিছুই হয় না। সংশোধনবাদ হচ্ছে বুর্জোয়া মতাদর্শেরই একটি রূপ। সংশোধনবাদীরা সমাজতন্ত্র আর ধনতন্ত্রের পার্থক্যকে অস্বীকার করে, তারা অস্বীকার করে প্রলেতারিয়েতদের একনায়কত্ব আর বুর্জোয়া একনায়কত্বের পার্থক্যকে।*"১৪

এমন নেতা মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে গণ-চীনে সম্প্রতি আর এক বিপ্লবের জোয়ার এসেছে। সেই বিপ্লব চরিত্রে সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং তার অভিপ্রকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষ্যকারদের বিভিন্ন মতামত।

১৯৩৬ সালের ৮ই আগস্ট পিকিং-এ অনুষ্ঠিত অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এই 'মহান প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব' সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়।

মাও সেতুং এই প্রসঙ্গে বললেন: 'একটি রাজনীতিক ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করতে হলে, সর্বাগ্রে প্রয়োজন হচ্ছে জনমত সৃষ্টি করা, মতাদর্শের ক্ষেত্রে কাজ করা। একথা বিপ্লবী ও প্রতি-বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে সমভাবে সত্য।'

চীনে যদিও বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, তবু এখনো তারা জনগণকে কলুষিত করার জন্য, তাদের মন জয় করার জন্য এবং আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার প্রচেষ্টায় শোষক শ্রেণীসমূহের পুরানো ভাবধারা, সংস্কৃতি, রীতি ও অভ্যাসগুলোকে ব্যবহার করবারই চেষ্টা করছে। জনগণ যাতে ক্রমশ এই সস্তা ও বুর্জোয়াসুলভ ভাবধারায় ধরা না দিয়ে ফেলে, তার জন্যই এই সাংস্কৃতি বিপ্লব। বিপ্লবের তাজা স্পন্দনে গণচরিত্র আরো বলিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠবে।

এই বিপ্লবকে সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌঁছে দেবার জন্য প্রয়োজন সাহস, বুকভরা অঢেল সাহস। সাহসের সঙ্গে জনগণকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। যারা ভুল করছে, তারা আত্মসমালোচনার দ্বারা

মাও সেতুংয়ের বক্তৃতা—১২ই মার্চ ১৯৫৭।১৪

ভুল সংশোধন করে সমস্ত মানসিক বোঝা ঝেড়ে ফেলে দেবে এবং যোগ দেবে এই সংগ্রামে। সঙ্গে সঙ্গে সচেতন ও কঠোর হতে হবে সেই সমস্ত পেটি বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পর্কে, যারা এই বিপ্লবীদের 'প্রতি বিপ্লবী' রূপে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করবে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, চীনের শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করা। পুরানো শিক্ষা ব্যবস্থার এবং শিক্ষাদানের পুরানো মূলনীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন এর লক্ষ্য। স্কুলগুলোর উপর থেকে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের অবসান ঘটাতে হবে। নতুন শিক্ষা হবে প্রলেতারীয় রাজনীতির বাহন। এই শিক্ষা ছাত্র সমাজকে নৈতিক দিক দিয়ে, বুদ্ধিশক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে এবং শারিরিকভাবে উন্নত করবে। শিক্ষাকে যুক্ত করা হবে উৎপাদনশীল শ্রমের সঙ্গে।

স্কুলে শিক্ষার বহর কমাতে হবে। আরো সুসংবদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাঠ্য তালিকা অল্প উন্নত করতে হবে। বিষয়বস্তু হবে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত, জটিল বিষয় বস্তুকে সরলভাবে পরিবেশন করা হবে ছাত্রমহলে। শুধু মাত্র পড়াশুনাই ছাত্রদের একমাত্র কর্তব্য নয়, পড়াশুনার সাথে সাথে তারা অংশগ্রহণ করবে কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থায়, গ্রামাঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থায় এবং সামরিক তালিম নেবে দক্ষ সৈনিকদেব কাছ থেকে।

এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একমাত্র বক্তব্য হলো মাও সেতুংয়ের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। সেই চিন্তাধারায় সর্বস্তরের পার্টি কমিটিগুলি আরো বেশি নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। চেয়ারম্যান মাও-এর রচনাবলী পড়তে ও প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হবে। তাঁর রচিত 'নয়াগণতন্ত্র' 'সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনান ফোরামে আলোচনা', 'জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্বের সঠিক পরিচালনা' 'নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন', 'পার্টি কমিটিগুলির কাজের পদ্ধতি' ইত্যাদি প্রত্যেক বিপ্লবীদের অবশ্য পাঠ্য।

আরো সমস্ত বিবিধ পরিকল্পনা ও তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করতে চলেছে।

কিন্তু এই বিপ্লবের আসল চরিত্র কি? এটা কি ক্ষমতার জন্য লড়াই? এটা কি সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের সমূলে খতম করবার এক চাল মাত্র? অথবা মাও সেতুং কি নিজের দুর্বলতা ঢেকে রাখবার জন্যই এই সমস্ত বড় বড় বুলির আশ্রয় নিচ্ছেন?

এ সবের উত্তরে বলা চলে, এটা নিঃসন্দেহে ক্ষমতার লড়াই। তবে সংকীর্ণ অর্থে এটা মাও সেতুংয়ের স্থলাভিষিক্ত কে হবেন, সেই লড়াই নয়। কোন্ শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা থাকবে, কাদের স্বার্থে এই ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে, মেহনতী জনসাধারণের স্বার্থে, না মুষ্টিমেয় বিশেষাধিকারভোগী সংখ্যালঘুদের স্বার্থে—এই ব্যাপক অর্থে এটা ক্ষমতার লড়াই! এর ফলে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বিতাড়িত করা যাবে। এই বিতাড়নের কাজ চলছে প্রকাশ্যে, গোপনে নয়। এ কাজ পরিচালিত হচ্ছে জনগণের দ্বারা, গোপনে পুলিশের দ্বারা নয়।

শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর এবং সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের পরও চীনে শ্রেণীসংগ্রাম দূর হয় নি। শোষক সম্প্রদায়ের লোকেরা তখনো প্রচ্ছন্ন ভাবে টিকে আছে। "প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেকে পাবে"—বণ্টনের এই কমিউনিস্ট নীতি তখনো প্রবর্তিত হয় নি। প্রাক্তন শোষক শ্রেণীসমূহ আবার স্বরূপ ধরতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, যারা একদিন বিপ্লব চেয়েছিল, বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম করেছিল, তাদেরও নৈতিক অবনতি ঘটতে থাকে,—সস্তা ও বুর্জোয়া মনোভাব ক্রমশই আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব চীনের গণ-মানসে এই সাধারণ ঢিলেমি ভাবটাকে বিপুল ভাবে নাড়া দিয়ে আবার সচেতন করে তুলবে। ১৯৪৮ সালের পর আর এক নতুন জেনারেশন [ Generation ]

জন্ম নিয়েছে। সেই নতুন আগন্তুকদের বিপ্লবের দ্যুতিতে দৃঢ় ও সচেতন করে তোলবার দায়িত্ব পালন করবে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

মাও সেতুং বলেছেন, শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল হলেই বিপ্লব সম্পন্ন হয় না। তাঁর বর্ণনায় এটা হলো "দশ হাজার লি রাস্তা অতিক্রম করার পথে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র!"

মেহনতী মানুষের হাতে এই রাষ্ট্রক্ষমতা অটুট রাখবার জন্য, তাকে সুদৃঢ় করবার জন্য আরো বেশী দীর্ঘস্থায়ী, আরো বেশী কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এই বিপ্লব সব রকম শোষণের অবসান ঘটাবে, যুগ যুগ ধরে শহর ও গ্রামের মধ্যে, শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য বিরাজ করছে তার অবসান করবে।

বিপ্লবের শত্রুরা কিন্তু অতি শক্তিশালী। সংগ্রাম ছাড়া তারা কোনদিন ক্ষমতা হাতছাড়া করে না। শুধু তাই নয়, একবার পরাজিত হলেও আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবার জন্য সবরকম চেষ্টাই চালিয়ে যাবে। লেনিন বলেছিলেন, "ক্ষমতাচ্যুত হবার পর বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ শক্তি দশগুণ বেড়ে যায় এবং তাদের শক্তির পিছনে থাকে অতীতের অভিজ্ঞতা, প্রচুর অর্থ এবং বৈদেশিক সাহায্য।"

চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরাট পটভূমি রচিত হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেখানে এর প্রয়োজনীয়তা কেন ঘটেছে? কারণ 'সম্মুখে বিরাট উচ্চলম্ফন "[ Great leap forward ] আন্দোলন সেখানে সফল হয়েছে, অর্থনীতিতে নতুন প্রাণ স্পন্দন শোনা যাচ্ছে। এমন অবস্থার সাথে সাথে জনগণের রাজনৈতিক চেতনাকে শাণিয়ে নেবার প্রয়োজনে এই মুহূর্তে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গুরুত্ব অপরিহার্য। চিন্তা জগতে এটি একটি বৃহত্তর উচ্চলম্ফনেরই সামিল হবে।

শুধু চীনে নয়, সাংস্কৃতিক বিপ্লব সমগ্র মানবজাতিরই সম্মুখে উন্মুক্ত করে দেবে এক নতুন দিগন্ত।"

## ॥ সাত ॥

এ যেন বিশ্বজুড়ে একটা দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্নটা বার বার মোচড় খাচ্ছে, পাঁক খেতে খেতে গ্রাস করছে পাকিস্তানকে, ইন্দোনেশিয়াকে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়াকে, জাপানকে, গহন আফ্রিকাকে, উচ্ছল লাটিন আমেরিকাকে।

আজ এই ঝড়-শ্রান্ত দিন গুলিতে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করতে পারি, নয়া সম্রাজ্যবাদের বীভৎস ব্যঙ্গ বিকৃতিকে। বীক্ষণাগারে, মরণাস্ত্র নির্মানশালায় বসে উত্তপ্ত রিপুর লোল রসনা প্রতিমুহূর্তে লালায়িত হয়ে উঠেছে! কবির ভাষায়, 'সে কেবল অন্ধ উৎসাহে ভিত্ খুঁড়ে চলছে রাজ-সম্রাজ্যের নীচের তলায় বসে, জয়স্তম্ভ গুলো টলমল করছে, সেই সঙ্গে ভেঙে পড়েছে মনুষ্যত্বের বাঁধনগুলো। এর কোন প্রতিকার আছে বলে ভেবে পাইনে। ঢালু গর্তের দিকে সেই রিপুর চলেছে ধাক্কা যে, রিপু যুগ যুগ ধরে এশিয়া ও আফ্রিকার সেই দুর্বল মহাদেশ থেকে আপন অশুচি খাদ্য যুগিয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে। তার মুরুব্বিরা ভাবতে পারেনি, একদিন এর শোধ তুলবে তাদের সুযোগ বঞ্চিত স্বগোত্রীয়রাই। মারের ঘূর্ণিপাক চলছে, অস্ত্রের পিছনে অস্ত্র চলেছে অন্তহীন গণিতের পথে, এ থামবে কোথায়? তাদের ভোজের উচ্ছিষ্টের পিচ্ছিল পথে চলেছে হানাহানি, দেখতে হয়েছে কুৎসিৎ। সংকটের দিনে এরা কিন্তু ক্ষেত্র পরিষ্কার করতে চায় না।...''*১৫

নয়া সম্রাজ্যবাদ কণ্ঠরোধ করতে চাইছে মুক্তিকামী গণ-যোদ্ধাদের।

পুঁজিবাদ মুখব্যাদন ক'রে আছে সাম্যবাদের দিকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।*১৫

সভ্যতাগর্বী শ্বেতাঙ্গরা আজও কৃষ্ণাঙ্গদের রক্ত-মাংস-হাড়-চামড়া দিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখতে চায়।

কিন্তু প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে সর্বত্র!

নয়া সম্রাজ্যবাদীরা পাততাড়ি গোটাতে শুরু করেছে।

পুঁজিবাদের উঠেছে নাভিঃশ্বাস।

কৃষ্ণাঙ্গরা আজ বুঝে নিতে এসেছে তাদের দাবীকে!···

ফ্রান্সে থাকবার সময় একটি অভিজাত হোটেলে আমি এক আফ্রিকান তনয়ার আধুনিক নৃত্যকৌশল পরখ ক'রে, একদিকে বিস্মিত, অপরদিকে বেদনাহত হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, মেয়েটির দু'চোখে অনেক বেদনার ইতিহাস জমাট বেঁধে আছে। পুরু ঠোঁটের ভাঁজে অনেক অভিমান, ওর নৃত্যের তালে তালে, মিড়-গমক-মুর্চ্ছনার প্রতিটি হিল্লোলে শুধুই প্রতিবাদ! আনুরাগ নয়, বিরাগ! পুঁজিবাদ ওকে গিলে খেয়েছে। শিখিয়েছে এমন উলঙ্গ-নৃত্য। কিন্তু মন সায় দেয় না। বেদনার উপকূলে ভেঙ্গে পড়ছে তাই ওর প্রতিটি হিল্লোলিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ! আমার মনে হচ্ছিলো, ওকে এই মুহূর্তে মুক্তি দেয়া উচিত। ও ছুটে যাক ওর সেই রহস্যময়ী দেশে। হৃদয়ের অর্ঘ তুলে নতুন নৃত্যে ওর অমেয় শক্তি পথ খুঁজে পাক। কাফ্রিনী পুনরুত্থিত বিজয় উল্লাসে নিজের দীপ্ত অধিকার ঘোষণা করুক···।

শান্তি নেই! বন্ধু, স্বস্তি নেই!

নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য এতকাল লড়াই চালাতে হয়েছে; ঘটেছে একটির পর একটি বিপ্লব। এবার সেই বিপ্লব-স্নাত মানুষ গুলি শান্তি চায়, চায় গঠন মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে, প্রতিষ্ঠিত করতে চায় শোষণ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা!

কিন্তু নয়া সম্রাজ্যবাদ তা হতে দেবে না।

জেনেভা চুক্তিকে পদদলিত ক'রে ন্যাপামের আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে ভিয়েতনামের গ্রামে-গ্রামে শহরে শহরে···রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ

দস্যুদের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা হচ্ছে···সিনাই মরুভূমিতে অনবরত পাঞ্জাকষার মদত আসছে···দক্ষিণ আফ্রিকা ও এ্যাঙ্গোলায় শ্বেতাঙ্গ দস্যুদের বীভৎস দাপাদাপি চলেছে···চোরা কারবারীদের স্বর্গভূমি হয়ে উঠেছে হংকং···তাইপেতে মার্কিনদের পোষ্যপুত্র চিয়াং কাইশেকের আজো অবস্থান,···সর্বত্র অগ্নিগর্ভ পরিবেশ।

শান্তি কোথায় ?

সৃষ্টি কোথায় বন্ধু ?

অথচ শান্তির জন্য জনতার আকুতির অন্ত নেই। সৃষ্টিশীল বিপ্লব শান্তিরই পথ রচনা করে। এই অর্থে মার্কিন জনগণের সাথে যে কোন সাম্যবাদী দেশের অধিবাসীদের কোন প্রভেদ নেই। তারা এক,—তারা শান্তিকামী! বিশ্বের এমন প্রায় প্রতিটি দেশের শান্তি কামী জনতার প্রতিনিধিরা এসে প্রথম জমায়েত হয়েছিলেন পোল্যাণ্ডের রকলো শহরে ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন পল এলুয়ার, অধ্যাপক ফ্রেডাখি, জোলিও কুরী, মাদাম আইরিণ কুরী, জে. ভি. বার্নাল প্রভৃতি। এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিপ্লবী এবং নয়া সম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট অশান্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!

এর পর আরো কুড়িটি বৎসর অতিক্রম করে গেছে।

শান্তিবাদী বিপ্লবী জনতা আরো নির্যাতন ও অবিচারের মধ্যে দিয়েও অবিচল ভাবে ইতিহাসকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে। এরই মধ্যে ঘটে গেছে কোরিয়া যুদ্ধ, চলেছে ভিয়েতনামের যুদ্ধ। জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো যুদ্ধ ও সংগ্রামের বিষাক্ত লাভা ছেয়ে ফেলেছে মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ গুলিকে!

আক্রমণকারী কে ?

অপরাধী কে বা কারা ?

নয়া সম্রাজ্যবাদীদের কূচক্রে সহজে প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্ত করা যায় না। প্রচারের মার প্যাচ, কূটনীতির কুটিল খেলায়

পৃথিবীর জনগণ অনেক সময়েই দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এই দ্বিধা সাময়িক। ইতিহাস চিনিয়ে দেয় প্রকৃত অপরাধীকে। আর গণ-বিপ্লব সরোষে সেই অপরাধীদের উৎখাত করে দেয় বিস্মৃতির অতল-গহ্বরে। অপরাধীরা জোট বাঁধছে ন্যাটোচক্রে, বার্লিনের অঙ্গছেদনে, পশ্চিম জার্মানীতে সমরবাদের পুনরাজীবনে, সেন্টো এবং সিয়াটো বন্ধনে! এদের আসল উদ্দেশ্য, সমাজতান্ত্রিক ও অসমাজতান্ত্রিক দুটি জোটে বিশ্বকে বিভক্ত ক'রে যুদ্ধের আবহাওয়া ক্রমশ উত্তপ্ত করে তোলা।

মার্কিন সরকার কোটি কোটি ডলারের স্রোত বইয়ে দিয়েছেন পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের সমরবাদকে পুনরুজ্জীবিত করতে। আবার ঠাণ্ডা যুদ্ধ চালিয়ে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সাম্যবাদী চীনকে দুর্বল করে রাখতে চাইছেন পেন্টাগনের দল! একাজে সফল হলে এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের শোষণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতো। কিন্তু তা ব্যর্থ করে দিচ্ছে বার বার এশিয়া ও আফ্রিকার সচেতন, বিপ্লবী জনতা। মিথ্যা ও বিদ্বেষে তারা আর ভুল করতে রাজি নয়! তারা জেনেছে, যুদ্ধ কত ভয়ানক! জেনেছে, যুদ্ধ পুঁজিবাদেরই সহায়ক!

কোরিয়ার যুদ্ধে বিপ্লবী জনগণেরই বিজয় সূচিত হয়েছে। ৩৮তম অক্ষরেখার ওপাশে নিজেদের বাহিনীকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে আমেরিকা। পেন্টাগনদের যুদ্ধ-রসনায় কোরিয়া লেপন করে দিয়েছে শুধুই তিক্ততা। কোরিয়ার সংগ্রামী জনগণ, লাল চীনের লক্ষ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সমরাস্ত্র বাধ্য করেছে আমেরিকাকে শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করতে।

কোরিয়া যুদ্ধ বিশ্ব ইতিহাসের একটি উচ্চলম্ফন। এই যুদ্ধের পর বিশ্ব জনমত স্বীকার করে নেয় সমাজতান্ত্রিক ও বিপ্লবী দেশ গুলির প্রচণ্ড শক্তিকে। লাল চীনের অভ্যুদয়ে এশিয়ার সম্রাজ্য-বাদ প্রচণ্ড মার খেলো। এ্যাটম ও হাইড্রোজেন দ্বারা সুসজ্জিত সাম্যবাদী রাশিয়াকে নয়া সম্রাজ্যবাদ ভীতির দৃষ্টিতে দেখছে। চীনও

নিজেকে ক্রমশ পরমানবিক সজ্জায় সজ্জিত ক'রে তুলছে। সাম্রাজ্য-বাদীদের হুঙ্কার আজকাল আর ততো সোচ্চার নয়। নিক্সন ভিয়েৎ-নামের মাটি থেকে পঁচিশ হাজার মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন! অন্তত শান্তির ভান করতেও পেণ্টাগনরা আজ বাধ্য হয়েছেন।

কোরিয়ার পর ভিয়েতনাম।

ঝড়ের কেন্দ্র ভিয়েতনাম। প্রাণ ও আদর্শের কেন্দ্র ভিয়েতনাম। এই ছোট্ট দেশের সংঘবদ্ধ সংগ্রামী জনতা কি প্রচণ্ড মারই না দিচ্ছে নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের! অনেকের অনুমান, নয়া সাম্রাজ্যবাদের পচন ধরাচ্ছে ভিয়েতনামের বীর জনগণই। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে কবর দেওয়া হয়েছিল দিয়েন বিয়েন ফুতে। এবার মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের অন্তিম লগ্ন উপস্থিত।...ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে আমেরিকা। তার বড় ভরসা, ডলারের প্রাণ-প্রাচুর্য! কিন্তু ইদানীং সেই ডলারেও কাঁপুনি লেগেছে! এ বড় ভয়ানক! White House এর সমগ্র ভিত্তিটাই যেন থর থরিয়ে কাঁপছে।

১৯৫৬ সালে মিশরে উঠলো নবজাগরণের ঝড়। বিপ্লবী নেতা কর্ণেল নাসেরের নেতৃত্বে নতুন যুগের সূচনা হলো মরুভূমির রাজ্যে। নাসের চাইছেন, মরুভূমির বুকে সুখ ও সমৃদ্ধির নন্দন-কানন প্রতিষ্ঠিত করতে। এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর টাকা,—আসোয়ান বাঁধ নির্মান করতেই হবে! পশ্চিমী ধনকুবেরদের কাছে হাত পাতলেন নাসের। কিন্তু ধনকুবেরদের বিদ্রূপের বিষাক্ত হাসি। প্রত্যাখ্যাত নাসের সিংহের মতো ফুলে উঠলেন। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সুয়েজখাল জাতীয়করণ করলেন। সচকিত বিশ্ব শুনলো, গামাল নাসের অনমনীয় দৃঢ়তায় মরুভূমির দেশকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজের অধিকার লাভে। সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে এত বড় অপমান মুখ বুজে

হজম করা সম্ভব হলো না। বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী তাড়িঘাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ে মিশরের উপর। ওদের সাথে যোগ দিলো ইস্রায়েলও। সাম্রাজ্যবাদীদের এই নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার শান্তিকামী দেশগুলি। প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, চীন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুগোশ্লাভাকিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, কিউবা ইত্যাদি। তারপর সোভিয়েট ইউনিয়ন চরম পত্র দেবার সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের শিবিরে ভয়ের ছায়া নেমে আসে। বৃটিশ ও ফরাসী হানাদাররা ফিরে এলো সুড় সুড় করে। এর পর ১৯৫৮ সালে পতন্মুখ সাম্রাজ্যবাদ আর একবার হামলাবাজি করতে এলো মধ্য প্রাচ্যে। এবারের হানাদার আমেরিকা। লক্ষ্য তার জর্ডন ও লেবানন। কিন্তু এবারের আসর তেমন জম জমাট হতে পারলো না। সূচনাতেই পৃথিবী ব্যাপী আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির চাপে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মধ্য প্রাচ্য থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।

আসলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি এখন যুদ্ধেরই পাঁয়তাড়া কষে চলেছে। যুদ্ধ তাদের ধ্যান, যুদ্ধই তাদের গণ-বিপ্লবকে রোখবার শেষ-আয়ুধ।

মানুষের শান্তি-চেতনার উপর এই যে হামলাবাজী কবি কামাখ্যা মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় তা হলো:

'অনেক সোজ্জ্বল দিন পার হয়ে মানুষের মন
রাজনীতি রণনীতি, মড়কের ভয়ে,
-- রক্তিম নদীতে স্নান, যদিও, হয়ে গেছে ঢের—
অনাবিল শান্তি খুঁজে ফেরে।
তবু আজকের পৃথিবীতে,
অমল শান্তি নেই কোন,
সুস্থির বিশ্বাসও গেছে—কেন্দ্র থেকে সরে—
স্ফটিকের মত মন সেও মেলে কি?'...

জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। আফ্রিকার একটির পর একটি দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলেছে। ১৯৬০ সালের মধ্যে পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি ছাড়া আফ্রিকার প্রায় সব ক'টি দেশই পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচনে সমর্থ হয়।

তারপর ১৯৫৯ সালে বিপ্লবীদের ঝড় আছড়ে পড়লো লাটিন আমেরিকাতেও। ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী কিউবার বিপ্লবী সন্তানরা ফিদেল ক্যাস্ত্রো ও চেগুয়েভারার নেতৃত্বে উপনিবেশিক শোষণ তন্ত্রের অবসান ঘটায়। খোদ আমেরিকার নাকের ডগায় শাণিত অস্ত্রের মতো জ্বল জ্বল করছে সমাজতান্ত্রিক কিউবা। নিরুপায় পুঁজিবাদের সমস্ত বর্বর আক্রমণকেই ব্যর্থ করে দিচ্ছে বিপ্লবী জনতা।

বিপ্লবীদের জয়যাত্রা ইতিহাসের নির্দেশ। গৃহযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে বিপ্লবী চীন আজ বিশ্বশক্তিতে পরিণত। পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আজ সমৃদ্ধির পথে আগুয়ান। সোভিয়েট ইউনিয়নের মাথা পিছু জাতীয় আয় বৃটেন ও ফ্রান্সকে অতিক্রম করে আমেরিকার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী রাশিয়া আজ সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত সামরিক জোটকে খতম করে ফেলতে সক্ষম।

এই পরিবর্তিত পরিমণ্ডলে নয়া সাম্রাজ্যবাদের শিবিরেও দারুণ ফাটল ধরেছে। অর্থনৈতিক মন্দায় ধুঁকছে বৃটেন ও ফ্রান্স,—দু' দুটো মহাযুদ্ধ ওদের পাঁজর গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। অর্থের বাজারে পশ্চিম জার্মানীর মার্ক, মার্কিন ডলারকে আর পরোয়া করে না। ১৯৫৭ সালে পশ্চিম জার্মানী ফ্রান্সসহ পাঁচটি ইউরোপীয় দেশকে বগলদাবা করে 'ইউরোপীয় সাধারণ বাজার' [ Common market in Europe ] সৃষ্টি করে। এই বাজার আমেরিকা ও বৃটেনের রপ্তানী বাজারকে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। ডলার, মার্ক, ফ্রাঙ্ক,

পাউণ্ড—এদের পারস্পরিক ঠোকা ঠুকিতে ধরা পড়ে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব।

বিপ্লবী জনগণের তাই প্রত্যাশা, সমাজতান্ত্রিক ছুনিয়ায় যেন এই মুহূর্তে ফাটল অত বিশাল আকার ধারণ না করে। সাম্রাজ্যবাদ ও ও পুঁজিবাদ মার খেলেও তাদের শক্তিকে উপেক্ষা করা যায় না। তাদের নিত্য নতুন কূট কৌশলে বিশ্ব জনমত ক্ষণে ক্ষণে বিভ্রান্তিতেই পড়ে। তাদের গুপ্তচর বাহিনীর কৌশলে ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, কঙ্গো, পাকিস্তান ইত্যাদি স্থানে প্রতিক্রীয়াশীল চক্রগুলি মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এর জবাব দেবার জন্য মেহনতী মানুষ চীন অথবা রাশিয়ার পানে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু ওরা কি আজ সত্যই পারছে নেতৃত্ব দিতে ?

এ প্রশ্নের জবাব আগামী কয়েক বৎসরের ইতিহাস দেবে।

## ॥ আট ॥

'আহা! খোকন, কত দিন দেশে যাই নি রে।'

ইজি চেয়ারে দেহ এলিয়ে আমার বাবা প্রায়ই বলতেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ দেহ, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, মুখে বলিরেখার গভীর আঁচড়; চলাফেরা করতে কষ্ট হয়! শুধু উদাস দৃষ্টিতে আকাশের পানে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই নিঃশ্বাসের গভীরতায় একই স্বপ্নের আছাড়ি পিছাড়ি, 'আহা! খোকন, কতদিন দেশে যাই নি রে!'

দেশ মানে পূর্ব বাংলা। নদীমাতৃক পূর্ববাংলা। অবিভক্ত ভারত মাতার স্নেহধন্যা সেই তনয়া। কল্লোলিত নদী-বিধৌত অনুপম, ভাস্বর, আপপ্র বৈশিষ্ট্যে চিরন্তন নদীপ্ত। বিপ্লবী পূর্ববাংলা, বিদ্রোহী পূর্ববাংলা,—পাক সরকারের অনাচার অত্যাচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে! বৃটিশের হাত থেকে দেশ মুক্তির জন্য পূর্ববাংলার আত্মত্যাগের তুলনা হয় না! আজ আবার পাকিস্তানের জঙ্গী শাসনতন্ত্র ও হাস্যকর 'মৌলিক গণতন্ত্রের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে পূর্ববাংলা। ঢাকা, বরিশাল ও চট্টগ্রামের রাজপথে জঙ্গীশাসনের অগ্নি বলয় ছুটে আসছে, বিপ্লবী সন্তানদের রক্তে চতুর্দিকে লালে লালময়।

ফ্রান্স থেকে ফিরে আসবার মাস চারেক পরেই আমার পূর্ব পাকিস্তানের বন্ধু ইমান রসুলের একটি চিঠি পেলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র সে। আইয়ুবশাহী তাকে খুঁজে বের করবার জন্য তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে পূর্ববাংলার সর্বত্র। কিন্তু ধরতে পারে নি। চে গুয়েভারার বিপ্লবী চেতনাকে বুকে চেপে ইমান রসুল স্থান থেকে স্থানান্তরে গা ঢাকা দিয়েছে। তারপর

আইয়ুবশাহী খতম হলো ;· ক্ষমতায় এলেন অপর এক জবরদস্ত জঙ্গী শাসক,—ইয়াহিয়া খান।

ছদ্মবেশ ত্যাগ করে আত্মপ্রকাশ করলে ইমান রসুল। কিন্তু বেরিয়ে এসে সে কি দেখল? তার নিজের ভাষায়ঃ

"...সব কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। কি যে ঘটে গেল, অথবা কি যে ঘটতে চলেছে ঠিক বুঝতে পারছি না! এই মুহূর্তে কি যে আমার কর্তব্য, বুঝে উঠতে পারছি না কমরেড!...বৃদ্ধ মৌলবীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন! এই কিছুদিন আগেও রাজনৈতিক ঝড়ে ওরা একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন! মোল্লাতন্ত্র না সমাজতন্ত্র—কোন দিকে দেশ ঝুঁকবে, বুঝতে না পেরে শুধুই বলছেন 'খোদা-ই হাফেজ!...খোদা-ই হাফেজ!"...

খোদা-ই হাফেজ!

কমরেড ইমান রসুলের চিঠি সেই ভাবনার সৃষ্টি করে, পাকিস্তান আজ কোন্ পথে? মাত্র কয়েকদিন আগেও ধূমায়িত অসন্তোষে থর থরিয়ে কাঁপছিল পাকিস্তান। সেই আন্দোলনের উষ্ণতায় পূর্ব পাকিস্তানের সাথে হাত মিলিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানও। বিপ্লবের জোয়ারে ঢাকা, বরিশালের সাথে করাচি ও পিণ্ডি একাকার হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এই মুহূর্তে সেই বিপ্লব যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এক সময় মনে হয়েছিল, পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শক্তি বুঝি অপ্রতিহত। আইয়ুব খান একেবারে কোণঠাসা,—দেওয়ালে পিঠ রেখেও আত্মরক্ষায় তিনি অসমর্থ। তারপর নাটকীয় ভাবে বিদায় নিলেন আইয়ুব, আর মঞ্চে আবির্ভূত হলেন আর এক জঙ্গী নায়ক ইয়াহিয়া খান। দেশজুড়ে সামরিক আইন জারী হল। সৈনিকদের সদম্ভ পেষণে স্তব্ধ হয়ে গেলো জনতার চিৎকার, গণতন্ত্রের দাবী, মোল্লাতন্ত্রের সাথে সমাজতন্ত্রের সংঘর্ষ।

জমাট বাঁধা স্তব্ধতা। যেন ঝড়ের পূর্ব সংকেত। রাজনৈতিক দলগুলি হাত গুটিয়ে বসে আছে। অথচ ওদের কিন্তু নিষিদ্ধ করে

দেওয়া হয় নি। প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতারা মুখে যেন তালা এটে বসে আছেন ; অথচ ওদের কিন্তু কারারুদ্ধ করা হয় নি। আসলে চতুর ইয়াহিয়া খানের চমৎকার সামরিক মার প্যাঁচ কাজ করছে এখানে,—প্রত্যেকের রাজনৈতিক সক্রিয়তার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছেন তিনি ! এতে কি এ কথাই প্রমাণিত হয় না যে, প্রশাসক হিসাবে ইয়াহিয়াখান আইয়ুবখানের চাইতে অনেক দক্ষ ? এবং সেই সাথে এ কথাও কি প্রতিষ্ঠিত হয় না যে, পূর্ববাংলা তথা সমগ্র পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এক নড়বড়ে ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল।

কিন্তু আইয়ুব ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে প্রভেদ সামান্যই। দু'জনই জবরদস্ত জঙ্গীকর্তা, জাতিতে পাঠান, স্বৈরাচারী, গণতন্ত্রের হত্যাকারী,—পাকিস্তানের জনগণের কাছে দু'জনই সমান। তবে কেন এমন হলো ? কেন বিপ্লবী পাকিস্তান হঠাৎ এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিলে তার প্রজ্বলিত দীপশিখা ? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজে নিতে হবে।

বিগত বিশ বৎসরের বিশ্ব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বের অধিকাংশ অনুন্নত দেশেই গণতন্ত্রের বদলে সামরিক বিভাগই রাজনীতির আসল কলকাঠি হস্তগত করে রেখেছে। পাকিস্তান এর অন্যতম। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে জঙ্গীতন্ত্র কায়েম করতে পাকিস্তানের ইতিহাস সম্পূর্ণ প্রগতি বিরোধী এবং ইতিহাস বিরোধী। পাকিস্তান নিঃসন্দেহে অনুন্নত দেশ এবং সেখানে তাই সৈন্য বাহিনীই হলো সবচেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান। পশ্চিমী কায়দা কানুন তাদেরই বেশী আয়ত্ত। তাদের চিন্তাধারাও পশ্চিমমুখী। তাই পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির পরিপূর্ণ সহানুভূতিও তারা পাচ্ছে। পাকিস্তানে প্রথম গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়চেতা গণনেতা লিয়াকৎ আলী যখন আততায়ীর গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, তখনই অনুধাবন করা গিয়েছিল যে, এ দেশে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু সমাসন্ন। ভারত-বিরোধী জিগির তুলে দেশটিতে সৈন্য-

বাহিনীর গুরুত্বকে ক্রমশই আকাশ স্পর্শী ক'রে তোলা হয়। সৈন্য বাহিনীকে মদত দিতে থাকে পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র। আমলাদের প্রথম থেকেই ধারণা ছিল, গণতন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের উন্নতি সম্ভব নয়। সামরিক শাসনই এই দেশকে সমৃদ্ধি ও শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবে। তাই লিয়াকৎ আলীর মৃত্যুর পর পাকিস্তানে যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রহসন চলছিল, তাদের পিছনে কাজ করেছিল আমলাতান্ত্রিক গণস্বার্থ বিরোধী ক্ষমতাবান লোকেরা।

একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়। তা হলো এই যে, পাকিস্তানের কী সেনা বাহিনীতে, কী আমলাতন্ত্রে পশ্চিম পাঞ্জাবীদের একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব চলছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তানরাই আজ পাকিস্তানের সমস্ত প্রশাসনিক পদগুলি অধিকার করে বসে-আছে। তাদের শিক্ষা পশ্চিমের বিশ্ব বিদ্যালয় গুলিতে এবং চরিত্রে তারা ক্ষমতা প্রিয় ও গণতন্ত্র-বিরোধী। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের ভূমিকা ছিল ঘৃণ্য, সবসময় তারা ইংরাজরাজের রাজত্ব কায়েম রাখতে অপ্রত্যক্ষ ভাবে চেষ্টা করে গেছে।

এমন সম্প্রদায়ের হাতেই বর্তমান পাকিস্তানের সমস্ত কলকাঠি। গণতান্ত্রিক মানুষের কোন ঠাঁই সেখানে নেই। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা কাতারে কাতারে আত্মাহূতী দিয়েছে, সেই বাঙ্গালী, পাখতুনী ও বালুচীদের কোন সম্মান বা ক্ষমতা দিতে পাক-সরকার আজ একান্তই অনিচ্ছুক। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে অধিকাংশই পাঠান, সেখানে বাঙ্গালী ও পাখতুনী সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।

সুতরাং, প্রথম থেকেই ক্ষমতা বেদখলের একটা ঘৃণ্য চক্রান্ত করছিল পাকিস্তানের পাঞ্জাবী মুসলমানেরা। প্রাদেশিকতা তাদের চরিত্রে অত্যন্ত প্রকট এবং সেনাবাহিনীকে নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার বানিয়ে জঙ্গীতন্ত্র কায়েম করতে তাদের মোটেই বেগ পেতে হয় নি।

এই ভাবে এলেন আইয়ুব খান।

আর্বিভূত হলেন ইয়াহিয়া খান।

এঁরা পরস্পর ভাই বেরাদার।

অনুন্নত পাকিস্তানে কিন্তু আরো একটি চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে তাদের ধর্মউন্মাদনা। মধ্যযুগীয় মোল্লাতন্ত্রের বড় ভক্ত এই দেশ! পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি শুধু ধর্মকে উপজীব্য করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করেছে। ধর্ম নিয়ে এমন রাজনৈতিক মাতামাতি সম্প্রতিক কালে আর কোন দেশে আমরা দেখতে পাই না। ধর্মীয় আবেগেই পাকিস্তানের জন্ম এবং ধর্মকে কাজে লাগিয়েই জনমতকে ঐক্যবদ্ধ করবার তার প্রয়াস। অবশ্য এতেও ব্যর্থ হলে আর একটি উপায় আছে, তা হলো "ভারত-বিরোধী জিগির আর সঙ্গে সঙ্গে কাফের নিধন যজ্ঞের আয়োজন"! বিচিত্র রাজনীতি।

কিন্তু মানুষ আজ সচেতন হতে শিখেছে। বিশ বছর ধরে পাকিস্তানের মেহনতী ও বুদ্ধিজীবী মানুষ অনেক উত্তেজক কথা শুনে আসছে, তাদের নেতাদের কাছ থেকে। ঘুরে ফিরে শুধু সেই দুটি শব্দ—'ঐসলামিক ঐক্য এবং ভারতের চক্রান্ত'। পাক-জনগণ ক্রমশ ধরতে পারছে, এ সমস্তই চাল। ধর্ম ও ভারত-চক্রান্তের মিথ্যা জাল বুনে পশু শক্তিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছে পশ্চিম পাঞ্জাবী রাজনীতি। মানুষের সামন্যতম দাবী-দাওয়া মিটাতেও তারা রাজি নয়। কোটি কোটি অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, বন্যাপীড়িত, রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত জনগণ কে শোষণ করে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে আনা হচ্ছে বিরাট বিরাট মার্কিন প্যাটন ট্যাঙ্ক, রুশ ট্যাঙ্ক, চৈনিক ট্যাঙ্ক, সেভার জেট, মিগ বিমান, দূর পাল্লার কামান, আধুনিক রকেট, প্রচুর গোলাবারুদ প্রভৃতি আধুনিক সমরাস্ত্র। সবসময় কেবল 'যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি' মনোভাব। এ যেন সেই 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এর হল্লারাজ্যের মন্ত্রীর কুচক্র; রাজাকে উত্তেজক ওষুধ খাইয়ে বিরাট এক যুদ্ধের জিগির তোলা হচ্ছে। অথচ, দেশ শুদ্ধ লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরছে! এই হচ্ছে পাকিস্তানের জঙ্গীতন্ত্রের আসল চরিত্র।

কিন্তু শোষিত জনগণকে নেতৃত্ব দেবেন কে বা কারা ?

পাকিস্তানের নেতাদের ব্যাপক গণ-আন্দোলনের বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই। আবার তাঁদের অনেকেই সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত চিন্তায় ভরপুর। ফলে পরিপূর্ণ গণইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দিতে তাঁরা অপারগ।

মেহনতী মানুষের উপর ইতিমধ্যে জাল বিছিয়ে দিয়েছে পুঁজিতন্ত্র। করাচীকে কেন্দ্র করে পুঁজিবাদীরা পাকিস্তানের জনগণকে আরো শোষণ করতে থাকে। একদিকে সামন্ততন্ত্র, অপরদিকে পুঁজিতন্ত্র, এই দুয়ের চাপে পড়ে পাক জনগণ আজ বিভ্রান্ত!

তবু সেই বিভ্রান্তি বেশ কিছুটা কাটিয়ে উঠে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুললো, পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক মানুষরা। এর প্রথম সূচনা হলো, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনে। পঞ্চাশ দশকের সে এক রক্তাক্ত অধ্যায়! বাংলা ভাষাকে বিসর্জন দিয়ে উর্দুকে চাপিয়ে দেবার হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন। পূর্ব পাকিস্তানের বিপ্লবী ছাত্ররা এগিয়ে এলেন সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে।

এই প্রথম পূর্ব পাকিস্তানের মানুষরা ধর্মের চাইতে ভাষাকেই বেশী প্রাধান্য দিলো। গুলি চললো জঙ্গী শাসকের,—বুকের রক্তে ইতিহাস রচনা করে গেল পূর্ববাংলার সংগ্রামী মানুষরা। সেই আন্দোলনের ঢেউয়ে বাঙ্গালীরা অনুধাবন করতে পারলো, পশ্চিম পাকিস্তান কী ভাবে শোষণ ও বঞ্চনা করে চলেছে তাদের। অথচ পাকিস্তানের অর্থনীতির শতকরা ষাটভাগেরও বেশী নির্ভরশীল পূর্ব বাংলার উপর। পূর্ব বাংলাকে বাদ দিলে পাকিস্তান এক কথায় অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়বে। পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত শিল্পায়নের বনিয়াদ রচনা করেছে পূর্ব বাংলা। সেই নদী-মাতৃক দেশ আজ ক্রমাগত শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে, দাবী করছে স্বায়ত্ত শাসন।

পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকের রক্তাক্ত দৃষ্টিতে বিস্ময়! 'জমানা বদল গিয়া'।

শুধু পূর্ব বাংলার বাঙ্গালী নয়, পাকিস্তানী শোষণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে পাখতুন, বালুচী ও সিন্ধিরাও। এদের কোন রাজনৈতিক অধিকার নেই, তারাও সমানে শোষিত হচ্ছে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে। পরম শ্রদ্ধেয় গণনেতা সীমান্তের গান্ধী বাদশা খান বার বার ভারত সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন, এই সমস্ত নিপীড়িত জনগণের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করতে। কিন্তু দুঃখ ও বিস্ময়ের ব্যাপার, বিদ্রোহী নাগাদের পাকিস্তান সমানে মদত দিয়ে চললেও ভারত সরকার কিন্তু বিপ্লবী বালুচী ও পাখতুনদের কোন বাস্তব সাহায্য পাঠান নি!

পাকিস্তানের রঁন্ধ্রে রঁন্ধ্রে আজ স্বাতন্ত্র্যের বীজ। তাই এই শোষণ তন্ত্র একদিন ভেঙ্গে পড়বেই। রাজনৈতিক দলগুলিকে অবৈধ ঘোষণা করে আইয়ুর নিজেকে নিরাপদ ভেবেছিলেন। কিন্তু ক্রমাগত গণ আন্দোলনের রূঢ় বাস্তবতায় তাঁর সেই স্বপ্ন চূরমার হয়ে গেছে। এমন আঘাত আসছে পাক পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধেও। পাকিস্তানে মাত্র কুড়িটি পরিবার সমগ্র দেশের অর্থনীতিকে গ্রাস করে বসে আছে। সারা পাকিস্তানের মোট শিল্প সংস্থার শতকরা সত্তর ভাগের মালিকানা তাদের দখলে। পাক জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই এরকম বৃহৎ শিল্পপতি অথবা প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী। জনজীবনে চলেছে নির্মম শোষণ। এই শোষণের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন শ্রমিক সংগঠনগুলিও শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে।

এমন একদিন নিশ্চয় আসবে যখন পাকিস্তানের সমস্ত মেহনতী মানুষরা এই ঘৃণ্য মোল্লাতন্ত্র ও জঙ্গীতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। সেদিন হয়তো আগত প্রায়। অন্তত পূর্ব বাংলার নিপীড়িত মানুষ আর এমন শোষণতন্ত্রকে বরদাস্ত করতে পারবে না।

একদিকে আমেরিকা, অপরদিকে লাল চীনের সাথে হাত মিলিয়ে পররাষ্ট্রনীতির শত ঝিলিকেও জনগণ আর ভুলবে না। আইয়ুব পাকিস্তানের গণ নেতাদের বিরুদ্ধে যতই মিথ্যা ষড়যন্ত্রের মামলা দাঁড় করান না কেন, গণ-বিপ্লবকে রোধ করবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

পাকিস্তানের জনগণ আজ বৈপ্লবিক পরিবর্তন কামনা করে,—মধ্যযুগীয় মোল্লাতন্ত্র ও অহং সর্বস্ব জঙ্গীতন্ত্র তাদের সর্বনাশ করেছে। কিন্তু সেই গণ বিপ্লবে উপযুক্ত নেতার একান্তই অভাব। ভুট্টো সাহেব চড়া গলায় সমাজতন্ত্রের কথা ঘোষণা করলেও তাঁর চরিত্রে সমাজতান্ত্রিক ভাবটা খুবই কম। আবার মৌলানা ভাসানী মূলত ময়মনসিং, পাবনা, দিনাজপুর ও রাজশাহীর কৃষকদের নিয়েই আন্দালনে নেমেছেন। পাকিস্তানের অন্যান্যস্থানে তাঁর সমর্থন অত্যন্ত ক্ষীণ'—সমগ্র পাকিস্তানের জনতাকে নেতৃত্ব দেবার মতো ব্যক্তি তিনি নন। ভুট্টো ও ভাসানী,—দুজনেই 'পিকিংপন্থী' বলে পরিচিতি। এঁদের দু'জনের মধ্যে রয়েছেন আর একজন জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা—শেখ মুজিবর রহমান। মুজিবর রহমান কিন্তু পিকিংএর দিকে তাকিয়ে নেই; বরং তিনি ভাসানী ও ভুট্টোর পিকিং প্রসস্তির তীব্র সমালোচক। তাঁর লক্ষ্য, পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। এছাড়া রাজনীতির মাঠে নেমে পড়েছেন আরো অনেক কাঁচা-পাকা খেলোয়াড়, যেমন, মৌলানা মওদুদি, চৌধুরী মহম্মদ আলী, আসগর খান, পাখতুন নেতা ওয়ালী খান ইত্যাদি। এঁদের কেউ পশ্চিমীভাবে ভাবিত, আবার কেউ পিকিংএর আদর্শে বিশ্বাসী।

এত নেতা! এত মত! নানা পথে বিভক্ত হয়ে আন্দোলন গুলি তাই বুঝি এই মুহূর্তে একত্রে দানা বাঁধতে পারছে না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সামগ্রিক ভাবে শোষণতন্ত্রের অবসানেই পাকিস্তানের প্রকৃত বিপ্লব সফল হতে পারে। সমাজতন্ত্রের কথা উঠলেই যে সমস্ত আপাত আইয়ুব-বিরোধী মোল্লাতন্ত্রী পশ্চিম মুখী নেতা

ক্ষেপে ওঠেন, পাক জনগণের উচিত তাঁদের নেতৃত্বকে অস্বীকার করা। এমনকি, ভাসানী 'ঐস্‌লামিক সমাজতন্ত্রের' নামে যে নতুন পাচনটি তৈরী করেছেন, তাও সচেতন পাক জনগণ গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ, মোল্লাতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র,—দুয়ের সহ-অবস্থান একই কাঠামোতে সম্ভবপর নয়। এ এক ধরণের মিশ্রণ ভাঁওতা মাত্র।

মুজিবর ভাসানীকে সহ্য করতে পারেন না। আবার ভুট্টো মুজিবরের দাবী পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত শাসনকে স্বীকার করে নিতে পারেন না। এরা সকলে পরস্পর বিরোধী। ক্ষমতার লোভে দক্ষিণ পন্থীরা আইয়ুব বিরোধী আর আদর্শের কারণে বাম পন্থীরা আইয়ুব শাহীর অবসান কামনা করেছেন।

চারধার থেকে ক্রমাগত আক্রান্ত হয়ে, আইয়ুব আপোষের অন্তিম প্রয়াসও পেয়েছিলেন। কিন্তু আপোষ করবেন কার সাথে? বিরোধী নেতারা যে সকলে পরস্পর বিরোধী! এমন অভাবনীয় অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে ক্লান্ত আইয়ুব বিদায় নিলেন।

আর পাদপ্রদীপের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন অপর এক জঙ্গী নায়ক ইয়াহিয়া খান। পাকিস্তানের গণ-বিপ্লব তাই আজ এখনো অসমাপ্ত এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে গুমরে মরছে। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে, গণরোষ একদিন পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবেই। সমগ্র পাকিস্তান জুড়ে সাম্যজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগুন জ্বলবে দাউ দাউ করে,—ভেঙ্গে পড়বে এতদিনকার শোষণ, জঙ্গীতন্ত্র এবং মধ্যযুগীয় মোল্লাতন্ত্র। আমরা সেই চূড়ান্ত লগ্নের প্রতীক্ষায় আছি।

॥ নয় ॥

—কে তুমি ?

—আমি মোসাদেক।

—কি চাও তুমি ?

—আমি নই, আমরা। "আমরা চাই আমাদের তেল।... আমাদের তেল নিয়ে তোমাদের এই ঘৃণ্য রাজনীতি ও প্রভুত্ব আমরা আর বরদাস্ত করবো না।"

পারস্য উপসাগরের সন্তান, ইরাণী গণনেতা বীর মোসাদেক একদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে 'আমাদের তেল নিয়ে তোমাদের এই ঘৃণ্য রাজনীতি ও প্রভুত্ব আমরা আর বরদাস্ত করবো না।'

মোসাদেকের সেই বজ্রনিনাদে কেঁপে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদীদের শিবির, উচ্ছল হয়ে উঠেছিল গে অব্ পারসিয়া, অভিনন্দন জানিয়েছিল এশিয়া ও আমেরিকার সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলি।

কিন্তু মোসাদেক সফল হন নি।

সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে হাত মিলিয়েছিল ইরাণী আমলাতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্র। তাই ক্ষমতাচ্যুত হলেন মোসাদেক। আজো কারাগারে পচে মরছেন তিনি।...

তেল নিয়ে রাজনীতি। ঘৃণ্য রাজনীতি। অনগ্রসর পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণ আজো শেষ হয় নি। অথচ, মধ্য প্রাচ্যের অপরাপর স্থানে বিপ্লবী জনগণ দ্রুত মুছে ফেলেছে সাম্রাজ্যবাদীদের শেষ চিহ্নগুলি। চল্লিশ দশকেই মরুভূমির বুকে মার খেতে থাকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক আধিপত্য। ১৯৫৬ সালে মধ্যপ্রাচ্যের তরুণ দিবাকর আবদেল গামাল নাসের

ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শেষ জমিদারী সুয়েজখাল জাতীয় করণ করে নেন। বৃটেনের কাঠেরপুতুল গ্লাব পাশা জর্ডান থেকে বিতাড়িত হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদীরা আর এক দফা মার খেলো মধ্যপ্রাচ্যে। ১৯৫৮ সালে ইরাকী বিপ্লব নয়া সাম্রাজ্যবাদের 'বাগদাদ চুক্তি'কে আঘাত হানে। মধ্যযুগীয় আবহাওয়ায় লালিত পালিত সৌদি আরবও আজকাল আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে তেমন তোয়াজ করছে না।

একমাত্র দক্ষিণ আরব ও পারস্য উপসাগরে এখনো সাম্রাজ্য বাদীরা তাদের ভেল্কি দেখিয়ে চলেছে। তাদের 'তৈল রাজনীতি' এখনো এখানে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। এর অবসানের জন্য দরকার বৃহৎ গণ-বিপ্লব এবং মোসাদেকের মতো একাধিক নেতার অভ্যুত্থান।

মধ্যপ্রাচ্যের অগ্নিগোলকে আশ্চর্য সাহসী দেশ ক্ষুদ্র ইয়েমেন। ১৯৫৮ সালে বৃটিশ ভ্রূকুটিকে তুচ্ছজ্ঞান করে, সৌদি আরবকে পরোয়া না করে ইয়েমেনের বিপ্লবী জনগণ তাদের প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে। ইয়েমেনের আকাশে বৃটিশ বোমারু বিমানগুলি চক্কর খেতে থাকে, বোমার ঘায়ে প্রাণ হারায় ইয়েমেনের মেহনতী মানুষরা। তবু আজাদী ইয়েমেন অর্ধমৃত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সেলাম জানায় নি। তারা তাদের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছে,—রাজা ইমাম গদি চ্যুত হ'য়ে প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছেন। রাজতন্ত্রের এমন অপমৃত্যু দেখে সৌদি আরবের রাজা ফয়জল ও তাঁর মোল্লাতন্ত্রী সভাসদ্‌রা আর নিজেদের ভীতিকে চেপে রাখতে পারেন নি। চারদিক থেকে তাই শত্রুর বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে ক্ষুদ্র ইয়েমেন। রাজা ফয়জল আবার ইমামকে তাঁর সিংহাসনে স্থাপন করবার আপ্রাণ প্রয়াস পাচ্ছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার অন্তিমলগ্নে ক্রমশই বর্বর হয়ে উঠছে এবং এই দু'জনের পিছনে সমানে মদত দিয়ে চলেছে মার্কিন প্রভুরা!

অবশ্য ইয়েমেন একক নয়।

তার সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন মিশরের শ্রেষ্ঠ নেতা কর্ণেল নাসের এবং কমিউনিষ্ট রাশিয়া। ইয়েমেনের গণ-বিপ্লবকে রক্ষা করবার একটা নৈতিক দায়িত্বকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না।

বৃটেন খুব ভয় পাচ্ছে।

পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুয়ায়ী ১৯৫৯ সালের মধ্যে পারস্য উপসাগর থেকে পাততাড়ি গুটাতে হবে তাকে। এ সময় যদি জাতীয়তাবাদী আরবরা পশ্চিমী তৈল স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করতে এগিয়ে আসে? যদি মোসাদেকের মতো শত শত বিপ্লবীকে লেলিয়ে দেয় মিশর ও সোভিয়েট রাশিয়া? তখন পশুরাজের কি হবে?

সেই বিপদের আশঙ্কায় বৃটেন বন্ধু পাকড়িয়েছে সৌদি আরবকে। রক্ষণশীল মোল্লাতন্ত্রী দেশ,—এর রাজা ফয়জল ভয়ানক চতুর এবং ইঙ্গ-মার্কিন ডলার পাউণ্ডের বড় ভক্ত। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিশালতা হারুণ-অল-রসিদের প্রাচুর্যতাকে মনে করিয়ে দেয়। রাজধানী রিয়াধ যেন উপকথার ঝলমলে বাগদাদের মতো। ইরাণের শাহেরের সাথে হাত মিলিয়েছেন ফয়জল। এই বিংশ শতকের শেষার্ধে রাজতন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আবার রাজতন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্রকে বজায় রাখতে হলে মেনে নিতে হবে বৃটিশ ও মার্কিন আব্দার গুলিকে। ওদের তৈল-স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে নিজেদের অস্তিত্ব রাখবার জন্যই। বিচিত্র রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি জট পাকাচ্ছে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে। তেলকে কেন্দ্র করে এখানে পুঁজিবাদের বিরাট পসার, গড়ে উঠেছে সুসজ্জিত নগরী, ক্রমবর্ধমান শ্রমিকসম্প্রদায় নিপীড়িত, লাঞ্ছিত। বুদ্ধিজীবীরা ক্রমশই এগিয়ে আসছেন। সম্পূর্ণ ধনতান্ত্রিক পরিমণ্ডল। কিন্তু শাসনযন্ত্র যাদেব হাতে তারা হলেন চরিত্রে রাজতন্ত্রী, চিন্তাধারায় মধ্যযুগীয়, একেবারে অচলিষ্ণু। শেখ-সম্প্রদায়

ছাড়া অপর কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না।

কিন্তু এমন অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না।

'এ্যয়সা জামানা নেহি রহে গা!'

মোল্লাতন্ত্রের কপালে এর মধ্যেই বলিরেখার কুঞ্চন ফুটে উঠছে। ইরাণ আস্তে আস্তে সরে আসছে সৌদি আরবের কাছ থেকে, সামান্য সামান্য ইঙ্গিত দিচ্ছে তার তৈল ভাণ্ডার জাতীয়করণের। উভয় দেশের নিপীড়িত জনতাও সংঘবদ্ধ হতে শিখেছে বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে। সোভিয়েট রাশিয়া, মিশর ও সিরিয়া প্রগতিবাদের দ্রুত প্রসার ঘটাচ্ছে এদের মধ্যে।

দুশ্চিন্তাগ্রস্থ রাজা ফয়জল।

আতঙ্কিত সাম্রাজ্যবাদ।

সমগ্র পারস্য উপসাগর জুড়ে একখণ্ড মেঘ ক্রমশই জমাট বাঁধছে। অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুতের লেলিহান ঝলকে, মেঘের গর্জনে একটি ধ্বনিই যেন বার বার শোনা যায়:

—"আমি নই, আমরা! আমরা চাই আমাদের তেল।...আমাদের তেল নিয়ে তোমাদের এই ঘৃণ্য রাজনীতি আর প্রভুত্ব আমরা আর বরদাস্ত করবো না!"

## ॥ দশ ॥

এন. ভি এফ।

জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। স্বর্গত ডাক্তার বিধান রায়ের সৃষ্টি। কিন্তু কী দুর্দ্দশা ওদের! মাস খানেক আগে বর্ধমানের জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অসমর্থিত ইউনিয়নের সভাপতি স্বপন সেনগুপ্তের সাথে হঠাৎ আলাপ হলো। শিক্ষিত ছেলে; পয়সার অভাবে বি. কম পরীক্ষার 'ফি' জমা দিতে পারে নি। তারপর চাকুরির সন্ধানে হণ্যে হ'য়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। কোথাও কাজ না পেয়ে এন. ভি, এফ্ ট্রেনিং নিয়েছিল হালি শহরে ১৯৬৪ সালে। তারপর এই চার বছর ধরে চলছে তার বিচিত্র চাকুরি জীবন,—মাঝে মাঝে চাকুরি খতম হয়ে গেছে; আবার যোগাড় করে নিয়েছে।

স্বপন সেনগুপ্তের ভাষায়, '···আমাদের কথা কেউ ভাবে না। গত বিশ বৎসর ধরে অনলস ভাবে দেশ সেবা করেও এ পর্যন্ত সরকারী কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি আমরা পাই নি। প্রায় কুড়ি বৎসর আগে আমাদের দৈনিক মজুরি ছিল সাড়ে তিন টাকা; আজ এই অনটনের যুগেও আমাদের বেতন এক পয়সাও বাড়ে নি।···তাছাড়া আমরা একটানা কাজ পাই না, প্রায়ই ছাঁটাই হয়ে বাড়ীতে গিয়ে বসে থাকি। অথচ দেখুন, আমরা কী না করছি অথবা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের দিয়ে কি না করাচ্ছে! কোথাও দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধলে আমাদেরই সেখানে প্রথমে ঠেলে পাঠানো হয়; কোন শহরে ধাঙ্গড় ধর্মঘট হলে আমরা সেই শহরের আবর্জনা মুক্ত করি। অথচ আমাদের জীবনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা নেই। আমরা চব্বিশ ঘণ্টা কাজে বহাল থাকি, কিন্তু পুলিশদের মতো কোনও ব্যারাক আমরা পাই না।···'

সত্য সেলুকাস বিচিত্র এই দেশ! স্মরণ করিয়ে দেয় কবি দ্বিজেন্দ্র লালকে।

মানুষের এত বড় অপমান, যুবশক্তির এমন অপচয় বিশ্বের অন্য কোথাও হয় কি? ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে বিশ বৎসরের উপর। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এ দেশের সাধারণ মানুষের কতটুকু উন্নতি হয়েছে? ধনতান্ত্রিক বিপ্লবও দেশকে একটা স্তর পর্যন্ত উন্নত করে তুলতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে তাও হয়নি। অথচ কত অল্প সময়ের মধ্যে জাপানের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশ তার অশিক্ষিত জনসাধারণকে নিয়ে কত সমুন্নত পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পেরেছিল।

সত্যি, জাপানের অত্যাশ্চর্য উন্নতিকে বিপ্লব বলেই আখ্যাত করা যায়। এবং বিপ্লবের আলোচনায় বসে সূর্যোদয়ের দেশকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না।

পৃথিবীর মানচিত্রে পূর্ব গোলার্ধে জাপান; জাপানীরা গর্বের সাথে বলে 'নিপ্পন' অর্থাৎ সূর্যোদয়ের দেশ। হোক্কাইড, হনসু, শিকোকু ও কিউস্যু—এই চারটি প্রধান দ্বীপ নিয়েই জাপানের ভৌগলিক অবস্থান। এ ছাড়াও আছে কয়েক হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ,—চারদিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়ানো। বিমানে জাপানের উপর দিয়ে উড়ে গেলে, চোখের সামনে শুধুই ভাসবে সবুজ সমতল ভূমি এবং সুসজ্জিত পর্বতশ্রেণী। চোখে পড়বে জাপানীদের প্রেরণার উৎস ফুঁজি আগ্নেয়গিরি। ঘুমিয়ে আছে আজ আড়াই শত বৎসরের উপর। শেষ অগ্নুৎপাত ঘটেছিল সেই ১৭০৭ সালে।

জনবহুলতার দিক দিয়ে ক্ষুদ্র জাপান আজ সপ্তম স্থান অধিকার করেছে,—চীন, ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া এবং পাকিস্তানের পরেই তার স্থান। জন বসতির ঘনত্ব হিসাবে জাপানের স্থান শীর্ষে। এই ঘনত্ব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। ১৯৬৪ সালের মে মাসের পরিসংখ্যান অনুসারে জাপানের সাতটি বৃহত্তম নগরের জনসংখ্যা নিম্নরূপ:

(১) টৌকিও······১০,৫১৩০০০ (২) ওসাকা······৩,২০৩,০০০
(৩) নেগোয়া······-,৯০৩,০০০ (৪) ইয়োকোহামা···১,৬৩৯,০০০

(৫) কিয়োতো……১,৩৩৩,০০০  (৬) কোরে…… ১,১৯২,০০০

(৭) ফিতাকিউস্যু……১,০৫৪,০০০ *১৬

এত বিশাল জনসমুদ্র, অপর্যাপ্ত কর্ষণযোগ্য জমি নিয়েও জাপান আজ সমস্ত রকম অর্থনৈতিক দাসত্বের নির্ভরতার হাত থেকে মুক্ত। গত বিশ্বযুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েও জাপান আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে সমুন্নত নবীনের মিলন ঘটেছে জাপানে। চেরী প্রস্ফুটিত যৌবন এখানে যেন চিরায়ত। কিমনোর কিংখাবে জাপানী কন্যার সযত্ন চা পরিবেশন মনকে দোলা দেয়; আবার স্কার্ট পরিহিতা আধুনিকা জাপানী তরুণীর বৈদ্যুতিক কম্পিউটারে কাজ এবং ট্রানজিষ্টর তৈরীর দক্ষতা,—আমাদের বিস্ময়ের পরিধিকে বিস্তৃত করে।

এই উন্নতি অত্যাশ্চর্য! এমন নীরব বিপ্লবের জুড়ি এশিয়ার ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই।

জাপানীরা ইয়ামাতো গোষ্ঠীর লোক বলেই ঐতিহাসিকদের ধারণা। শুধুমাত্র চীন ও কোরিয়ার সাথে জাপানের যোগাযোগ ছিল। চীনা লিপিই জাপানীরা গ্রহণ করে। চীন থেকেই কনফুসীয় ভাবধারা ও বৌদ্ধধর্ম জাপানে বিস্তারিত হয়েছিল।

মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে জাপানে রাজার চাইতে সামরিক শাসনকর্তা বা সোগুনদেরই প্রাধান্য ছিল বেশী। সোগুনদের এই দাপট প্রায় সাত শত বৎসর ধরে চলে। ১৫৯০ সালে জাপানে বিভিন্ন সামরিক কর্তাদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করে ক্ষমতায় এলেন হিদেয়োশি তোয়োতামি নামে এক বিরল সামরিক প্রতিভার অধিকারী জাপানী সেনানায়ক। হিদেয়োশির পর ক্ষমতায় আসেন ইয়েসাস্যু। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে আত্মরক্ষার্থে অনেকগুলি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মান করেন। তাঁর সময় থেকেই জাপান ক্রমশই বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিদেশীদের আর তারা পছন্দ করতো না। অবশ্য, ইতিমধ্যেই পর্তু-

জাপানী পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রদত্ত হিসাব ১৯৭৫ *১৬

গীজ ব্যবসায়ীরা জাপানের মাটিতে পা রেখেছে, সেণ্ট জেভিয়েরের নেতৃত্বে একদল জেস্যুইট মিশনারী খৃষ্টের সুসমাচার প্রচার করতে শুরু করেছে, কিন্তু তারা জাপানীদের মনে কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। জাপ সরকার জাপানে মিশনারীদের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে দেন। সমস্ত মিশনারী ও ইউরোপীয় বণিকদের পাততাড়ি গোটাতে হলো নিপ্পনের মাটি থেকে। শুধুমাত্র ওলান্দাজ ও চীনা বণিকরা নাগাসাকি বন্দরে ঢোকবার ও অবস্থানের অনুমতি পেয়েছিল।

এমন বিচ্ছিন্নতা বর্তমান যুগ সহ্য করে না। সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টির হাত থেকে আত্মগোপন করতে পারলো না জাপান। ১৮৫৩ সালে মার্কিন নৌ সেনাপতি কমোডোর ম্যাথুসি. পেরী চারখানি জাহাজ নিয়ে টোকিও উপসাগরে প্রবেশ করেন। সেই চারখানি যুদ্ধ জাহাজকে দেখেই জাপ সরকারের মুখ শুকিয়ে যায়। পেরী জাপ সরকারকে বাধ্য করলেন তাদের বন্দরগুলিকে মার্কিন জাহাজগুলির জন্য উন্মুক্ত করে দিতে।

আমেরিকার দৃষ্টান্তে উল্লসিত সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া, গ্রেটবৃটেন ও নেদারল্যাণ্ডও ঝাঁপিয়ে পড়ে জাপানের উপর; আদায় করে নেয় নানা অর্থনৈতিক সুবিধা। আসে ফরাসীরাও,—জাপানীদের ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙতে এলো সবাই।

বিদেশীদের এই হামলাবাজীতে জাপানীরা বুঝতে পারলো, সামন্ততন্ত্র দেশকে আর যথার্থ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম নয়। সামন্তরাও বুঝলেন, দেশের যথার্থ মঙ্গলের জন্যই এবার তাঁদের সরে দাঁড়াতে হবে। ১৮৬৭ সালে তাই পতন ঘটলো সোগুন তোকুগাওয়ার। পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলো রাজতন্ত্র। সম্রাট পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করলেন। আরম্ভ হলো মেইজি শাসন [ ১৮৬৮ ] ও মেইজি নেতৃত্বে বিরাট বিপ্লব!

হ্যাঁ, বিপ্লবই। তবে অতীত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন না হয়ে। রাজতন্ত্র বা সিণ্টোইজম্ অতীত জাপানের পরিচায়ক। আবার শিল্প, কৃষি ও শিক্ষা ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতি সম্পূর্ণ আধুনিক। জাপানের

অর্গল খুলে গেলো। গল্ গল্ করে বাতাস এলো পশ্চিম কোণ থেকে।

পশ্চিমকে সাদরে আহ্বান জানালো কিশোর জাপান। কারণ, সে বুঝতে পেরেছিল পশ্চিমী সভ্যতাকে গ্রহণ করতে না পারলে, সে কোন দিন তার যৌবনকে লাভ করতে পারবে না। বিশ্বের সমস্ত প্রধান সংবিধানকে অনুসরণ করে রচিত হলো নতুন জাপানী সংবিধান। মেইজির নির্দেশে এই সংবিধান রচনায় আপ্রাণ প্রয়াস পান কাউণ্ট হ'তো। সম্রাটকে শীর্ষে রেখে এক সংবিধানিক সরকার গঠন করলো জাপান। নতুন সংবিধান অনুযায়ী জাপ সম্রাট তাঁর নীতি পরিচালনা করবেন দুটি উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী: (1) The council of Ministers এবং (2) The Privy council. জাপানী বিধান সভাতেও [ Diet ] চিরাচরিত দুটি কক্ষের অবস্থান রইলো, উর্ধ্বতন কক্ষ [ Upper House ] এবং নিম্নতন কক্ষ [ Lower House ]।

অবশ্য, বর্তমানে এই সংবিধানেরও যথেষ্ট সংস্কার করা হয়েছে। নতুন সংবিধানের সাথে মেইজি বিপ্লবরে সংবিধানের পার্থক্য অনেক খানি। বর্তমান জাপানী সংবিধান সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছে:

'সম্রাট হলেন জনগণের ঐক্যের এবং রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক; আর জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। জাপান যুদ্ধ দ্বারা কোন মীমাংসায় আর বিশ্বাসী নয়। কোন রকম ভীতি প্রদর্শন বা শক্তির অহমিকাকে জাপান স্বীকার করে না।'...

এখন জাপানে সম্রাটের বদলে মন্ত্রীসভাই শাসন ক্ষমতার অধিকারী। সামগ্রিক ভাবে মন্ত্রীসভা আবার ডায়েটের কাছে দায়ী।......

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন প্রাণের সাড়া জাগালেন সম্রাট মেইজি। অদ্ভুত আত্মনির্ভর হয়ে উঠলো জাপানের সামরিক বাহিনী। জার্মান বাহিনীর আদর্শে সংগঠিত করা হলো এর স্থল

বাহিনীকে ; আর বিশাল নৌবহর গড়ে উঠলো বৃটিশ নৌ-মডেলকে সামনে রেখে। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী চেতনাও সাথে সাথে আগুন ছড়িয়ে দিতে থাকে জাপানীদের রক্তে। পশ্চিমীদের ধীরে ধীরে নিজের বাহুবলে মাতৃভূমি থেকে সরিয়ে ফেলে সে। তার শক্তির পরিচয়ে চমৎকৃত গ্রেট বৃটেন সন্ধির পত্র হাতে এগিয়ে আসে। জাপান বুঝলো, বাহুবলই বড় বল। শক্তির উন্মাদনায় তাই সে একদিন তার ধারালো দাঁত বসিয়ে দিলো চীনের বুকে। দু'দুটো বৃহৎ যুদ্ধে বিধ্বস্ত করে দেয় চৈনিক প্রতিরক্ষা শক্তিকে। তারপর কোরিয়া ও মঞ্চুরিয়া নিয়ে লড়াই বাঁধলো রাশিয়ার সাথে [ ১৯০৪—৫ ]।

এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশ জাপান শোচনীয় ভাবে পারজিত করলো ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ শক্তি রাশিয়াকে! বিরাট বিস্ময়! মুক্তি-কামী এশিয়ার প্রেরণা স্থল হলো জাপান! সাফল্যের পর সাফল্য! যুদ্ধের উন্মাদনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে নাম লিখিয়েছিল জাপান। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষচুক্তির অন্যতম শরিক হিসাবে তীব্র আক্রমণ চালালো মিত্র পক্ষীয় দেশগুলির উপর,—জাপ বাহিনীর আক্রমণে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ বিধ্বস্ত হলো, সিঙ্গাপুরের পতন ঘটলো, পদানত হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ব্রহ্ম।

এরপর সেই করুণ ইতিকথা। বর্তমান সভ্যতার সেই অভিশাপ! দুটো অ্যাটম-বোমা দু'কোটি জনগণ সহ নাগাসিকি ও হিরোশিমাকে মুছে দিয়ে গেলো পৃথিবীর বুক থেকে।

সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা জাপান কোনদিন ভুলতে পারবেনা। তাই আজকের জাপান এত যুদ্ধ বিরোধী! জাপানী জনগণ সর্ববিধ উপায়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে চায়।···

মেইজি জাপ প্রতিভাদের বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে প্রেরণ ক'রে তাঁদের আরো সুশিক্ষিত করে তোলেন। এই প্রতিভারাই গড়ে তুলেছিলেন তরুণ জাপানকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে জাপান

উন্নতির চরম শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু সর্বগ্রাসী যুদ্ধ তার একটি শিল্পকেও অক্ষত রাখেনি। লক্ষ লক্ষ জাপানী তরুণ প্রাণ হারিয়েছে, দেশে দেখা দিয়েছে দারুণ অনটন ও দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। এক সময় মনে হয়েছিল, জাপান বুঝি আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে যুদ্ধোত্তর জাপান আবার তার হৃত সমৃদ্ধি ফিরে পেয়েছে। এই পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস মেইজী বিপ্লবের চেয়ে কোন অংশে কম বিস্ময়কর নয়। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, জাপানে উন্নতির হার বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় অনেক ক্ষিপ্র হলেও পৃথিবীর শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলির তুলনায় এখানে দ্রব্যমূল্যের মান বারবারই একটা স্থিতাবস্থাতেই রয়েছে। ভারতবর্ষে যে সমস্ত অর্থনীতিবিদ প্রায়ই জোর গলার বলেন, এদেশের দ্রব্য-মূল্যের ক্রমবৃদ্ধি অর্থ নৈতিক উন্নতিরই স্বাক্ষর, তাঁরা নিশ্চয় জাপানের কথা চিন্তা করলে লজ্জা পাবেন। ১৯৭০ সালের মধ্যে জাপানের জাতীয় আয় দ্বিগুণ হবে বলেই বিশ্বাস। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কখনোই দেড়গুণ বা দ্বিগুণ হবেনা। লোকের আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি,—উভয়ই সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলেছে এখানে!

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে জাপানীদের আজ কোন তুলনা হয় না। জাপানীরা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী সামুদ্রিক মাছ সংগ্রহ করে থাকে। ১৯৩৩ সালে তিমি এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী বাদ দিয়েই ৬,৬৯৭,০০০ মেট্রিক টন ধরেছে জাপানী মৎস ব্যবসায়ীরা গভীর সমুদ্র থেকে।

ধান চাষের ক্ষেত্রেও জাপানীরা বিপ্লব এনেছে। জাপানী প্রথাই কৃষি নির্ভর দেশগুলিকে নতুন পথের সন্ধান দিতে সক্ষম।

শান্তিপূর্ণ ভাবে সৃষ্টি মূলক কাজে আণবিক শক্তিকে কাজে লাগাতে জাপান আজ ভারতের মতোই ক্রমশ সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে। টোকিও থেকে প্রায় ৭০ মাইল দূরে পাইন-আচ্ছাদিত সমুদ্রোপকূলের গ্রাম টোকাইমুরাতে জাপানের আণবিক

শক্তি উন্নয়নের কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে এখানে চারটি রিয়েক্টার চালু হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, খাদ্য সংরক্ষণ এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে আনবিক শক্তিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন জাপ পরমাণু বিজ্ঞানীরা।

ধণতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিবর্ধিত হয়েও জাপান আজও সমুন্নত ও সুখী একটি দেশ। প্রাচুর্যের সাথে বিনয়ী মননশীলতা এদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাই বলে কি, জাপ জনগণের ভিতর কোন অসন্তোষ নেই? নিশ্চয় আছে। সচেতন জাপ যুবশক্তি আজ নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসছে। এই যুবশক্তি ঘৃণা করে মার্কিন প্রভুত্বকে এবং জাপ-সরকারের ক্রমাগত দক্ষিণ-ঘেঁষা নীতি তাদের একদম পছন্দ নয়। তাই প্রায়ই প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে দেশের যুব সমাজ। সরকারের দমননীতিও চলছে সামনে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতেই হবে একদিন জাপ সরকারকে। পরোক্ষভাবে নয়া সম্রাজ্যবাদকে মদত দিয়ে জাপান কখনো গা বাচিয়ে চলতে পারবে না। আগুন জ্বলে উঠবে তার নিজের বুকেই। ভিয়েতনামের রণাঙ্গনে নিযুক্ত মার্কিন বোমারু বিমান ও যুদ্ধ জাহাজ গুলিকে আশ্রয় দিয়ে জাপ সরকার নিজের হীনমন্যতারই পরিচয় দিচ্ছেন! আশা করা যায়, প্রেসিডেন্ট সাতো ভুল বুঝতে পারবেন। বিশ্বের পরিবর্তিত অবস্থায় এমন আগুন নিয়ে খেলা জাপানের মতো চোট খাওয়া দেশের বোধ-হয় শোভা পায় না।

## ॥ এগারো ॥

আজ ১৫ই জুন।

গতকাল বিকেলে ফ্রান্স থেকে চিঠি পেয়েছি।

একমুঠো আনন্দ ছড়িয়ে দিয়েছে সেই চিঠি। তুঁলোর চিঠি! আমার তুঁলো! চিঠি ভর্তি শুধুই দেশের কথা,—ফ্রান্সের কথা। নির্বাচনের ঝড়ো বাতাস বইছে সে দেশে। কিন্তু ফরাসী কমিউনিস্টরা খুবই উদাসীন এই নির্বাচন সম্পর্কে, ভোট-যুদ্ধে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কোন স্বপ্ন আর তারা দেখতে রাজি নয়।

ফ্রান্সের সচেতন মানুষরা তাকিয়ে আছে প্যারিসের শান্তি-আলোচনা বৈঠকের দিকে। বৈঠকে কি কোন মীমাংসার সূত্র আবিষ্কৃত হবে? প্রতিষ্ঠিত হবে ভিয়েতনামে স্থায়ী শান্তি?··· পেণ্টাগনদের সুর নরম হতে শুরু করেছে। বিপ্লবী সরকার সত্য সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে। সাগ্রহে সেই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, মিশর ও সিরিয়া। ছয় লক্ষ মার্কিন ফৌজের মধ্যে প্রথম দফায় পঁচিশ হাজারকে ভিয়েতনামের বুক থেকে সরিয়ে এনেছেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন। আরো সরিয়ে আনবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন

এ সমস্ত কি শান্তির পূর্বভাষ? বিশ্বাস করতেও সন্দেহ জাগে। জেনাভার শর্ত গুলি মেনে নিলেই কি প্রকৃত শান্তির পথ খুলে যেত না? ভিয়েতনামের শান্তি ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব দেওয়া হোক ভিয়েতনামের সংগ্রামী মানুষদেরই হাতে!

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছোট দেশ ভিয়েতনাম। তিন কোটির কিছু বেশী তার লোকসংখ্যা। উত্তরে লাল চীন, দক্ষিণ ও পূর্বে সমুদ্র এবং পশ্চিমে লাওস ও কম্বোডিয়া। নিজের বিপ্লব গৌরবে ভিয়েতনাম আজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পুরাতন ও নয়া সম্রাজ্যবাদের

কবর খুড়েছে এ দেশের মেহনতী জনতা। জঘণ্য হিংস্রতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য পাশবিকতার বিরুদ্ধে, মানবিকতার স্বপক্ষে বিশ্ব ইতিহাসে ভিয়েতনাম আজ একটী অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। মুক্তিকামী মানুষের সম্মুখে এ দেশ তুলে ধরেছে বিপ্লব ও সংগ্রামের আলোক বার্তিকা।

ফারাসী সাম্রাজ্যে ইন্দোচীনের একটি দেশ ভিয়েতনাম। অপর দুটো দেশ হলো লাওস, ও কম্বোডিয়া।

১৮৫৯ সালে ফারাসী সম্রাজ্যবাদীরা সায়গন শহর অধিকার করে নেয়। সায়গনকে কেন্দ্র করে ১৮৬৭ সালের মধ্যে সমগ্র ইন্দোচীন তাদের দখলে আসে। এই বিরাট ভূ-ভাগ শাসন করতেন একজন ফরাসী-জেনারেল। তাঁর আবাস ছিল উত্তর ভিয়েতনামের হ্যানয় শহরে।

ভিয়েতনামের গোলা ভরা ধান, আখ, ভুট্টা, কফি, চা, তামাক ও রেশম নিজেদের জাহাজে তুলে ক্রমশ স্ফীত হতে থাকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ। ভিয়েতনামের লোহা, কয়লা, ফসফেট, টিন, ম্যাংগানিজের জোরে বিশ্ব-বাজারে ফরাসী দাপট তখন তুঙ্গীতে। অবিশ্বাস্য মুনাফায় তাদের লোভ ও বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাদেরই পদলেহনকারী ভিয়েতনামী সামন্তরা জাঁকিয়ে বসে মেকং নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে। প্রচণ্ড ভূমিক্ষুধা তাদের,—অধিকাংশ কৃষকরাই তাই ভূমিহীন, শুধুমাত্র ক্ষেত-মজুর। খাজনার হার অত্যন্ত বেশী। মহাজনরা দাদনের জাল পেতে বসে আছেন,—ধরা তাতে দিতেই হবে। সীমাহীন দারিদ্র্যে ধুঁকছে একটি দেশ।

এমন ভিয়েতনামে গণ-বিপ্লবকে বাস্তবরূপ দিতে ১৯৩০ সালে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হলো। প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দিল ইয়েনবাই প্রদেশে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব অবশ্য দিয়েছিল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দল কোকদান দাং। ফলে এই বিদ্রোহ সর্বস্তরে পৌঁছতে পারেনি এবং সাম্রাজ্যবাদীরা সহজেই সেই আগুন নিভিয়ে দেয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীদের বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় এবার এগিয়ে এলো সর্বহারাদের দল। কমিউনিস্ট পার্টি এদের নিয়ে ন্‌ঘে আন ও হা তিন নামে দুটি প্রদেশে বিদ্রোহী সরকার প্রতিষ্ঠিত করে। সেই থেকে চলছে ভিয়েতনামের গণ-যুদ্ধ,—একটার পর একটা।

নঘে আন ও হা তিনের অভিযানে এগিয়ে এলো ফরাসী বাহিনী, বর্বরচিত আক্রমণে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো ঐ দুটি প্রদেশের গ্রামের পর গ্রাম, বিমান থেকে সমানে বোমা বর্ষিত হতে থাকে, নিরস্ত্র চাষী ও শ্রমিকদের উপর মেশিনগানের গুলি চালিয়ে সাময়িক ভাবে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ তার প্রভুত্বকে বজায় রাখলো।

প্রারম্ভিক এই ব্যর্থতার পর কমিউনিস্ট পার্টি তার কার্যধারা পাল্টে ফেলে। এবারে ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনেই তারা বেশী করে অংশ নিতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে তারা ফ্রান্[illegible] ফ্রন্ট সরকারকে পর্যন্ত সমর্থন জানায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যলগ্নে ফ্রান্স তথা [illegible]র থরিয়ে কাঁপতে থাকে। নাৎসী-আক্রমণের ভয়াব[illegible] ফ্রান্স তার অস্তিত্ব রক্ষার্থেই ক্রমশ অসমর্থ হয়ে পড়ে। মেগালোম্যা-নিয়াক ফ্যুরার এদলভ হিটলার 'ভার্সাই-এর অপমানের চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ১৯৪০ সালের শুরুতেই বন্যার জলের মতো নাৎসী বাহিনী ঢুকে পড়লো ফ্রান্সের অভ্যন্তরে, চূর্ণ করে দিলো ফরাসী প্রতিরোধ ব্যবস্থা, তাদের পদানত হলো প্যারিস, নাৎসীদের প্রচণ্ড মার খেয়ে দানর্কিক থেকে পলায়নরত মিত্রপক্ষ— ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট সরকার নাৎসী-নায়কের সামনে ভেঙ্গে পড়ে। ফরাসীরা নিজেদের স্বাধীনতা টুকুও খুইয়ে বসেছে।

এখন ইন্দোচীনের দখল নেবে কে? এর উত্তর দিতে এগিয়ে এলো জাপ বাহিনী! ঝড়ের ক্ষিপ্রতা নিয়ে তারা ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া দখল করে নেয়। স্থানীয় ফরাসী সরকার তড়ি ঘড়ি জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে হাত মেলান। শুরু হয় জাপ-ফরাসী

তাণ্ডব নৃত্য। ভিয়েতনামের যুবকদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করাতে থাকেন জাপ সমরকর্তারা; আর ভিয়েতনামের যুবতীদের উপর চলে নিয়মিত ধর্ষণ।

মানুষ এমন অবস্থা বেশী দিন সহ্য করতে পারে না। ভিয়েত-নামীদেরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। বিক্ষিপ্ত ভাবে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে লাংসন, কোচিন-চীন ইত্যাদি প্রদেশে। জাপানী ও ফরাসীরা ভয়াবহ বীভৎসতার সাথে এই সমস্ত বিদ্রোহ দমন করে। হাজার হাজার মেহনতী মানুষের মৃতদেহে পাহাড় জমে ওঠে, বুক ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সমগ্র ভিয়েতনাম। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ও নেমে আসছে; ভিয়েতনামের শস্যভাণ্ডার লুট করেছে জাপানী ও ফরা[illegible] কৃষকদের চালায় আগুন লাগিয়ে গেছে, ভেঙ্গে [illegible]াঙ্গলকে, হত্যা করেছে তাদের গৃহ পালিত পশু

এ[illegible]ই ঐতিহাসিক মুহূর্তে কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সর্ব স্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে, রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানালো [ মে মাস, ১৯৪১ ]। ভিয়েতনামের শ্রমিক, কৃষক, পেটি-বুর্জোয়া, বুর্জোয়া এমনকি দেশ প্রেমিক জমিদাররা পর্যন্ত সাড়া দিলো এই আহ্বানে। এদের নিয়ে গঠিত হলো একটি মস্ত ফ্রন্ট; ভিয়েতনামী ভাষায় তার নাম হলো 'ভিয়েতনাম দক লাপ দং মিন্' [ League for the Independence of Vietnam], সংক্ষেপে 'ভিয়েতমিন্'! হো চিন মিন সভাপতি নির্বাচিত হলেন এই সংগঠনের।

১৯৪৪ সালের মধ্যে ভিয়েতনামের শ্রদ্ধেয় নেতা ভো নগুয়েন গিয়াপ প্রথম সুসংবদ্ধ গণ-ফৌজ গঠন করে ফেললেন। এই গণ-ফৌজের চমৎকৃত আক্রমণে উত্তর ভিয়েতনামের দু'টি প্রদেশ থেকে জাপ--ফরাসী দালালরা বিদায় নিতে বাধ্য হয়। দশ বছর বাদে এই গণমুক্তি বাহিনীই ফরাসী সম্রাজ্যবাদকে এই শতাব্দীর চূড়ান্ততম আঘাত হেনেছিল।

ভো নগুয়েন গিয়াপ স্বয়ং এই গণ-যুদ্ধ সম্পর্কে বলেছেন,

'......আমরা দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের জন্য আহ্বান জানিয়েছি। কারণ, এখানে লড়াই চালাবার এটাই সঠিক কৌশল। দীর্ঘস্থায়ী এই গণযুদ্ধের কালে আমরা শত্রুদের অবস্থা বুঝতে পারবো এবং যুদ্ধের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী নিজেদের সংগঠিত করতে পারবো। অর্থনৈতিক অনুন্নত একটি ঔপনিবেশিক দেশে মুক্তি সংগ্রামের জন্য আমরা গণযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলাম,—রণকৌশলের দিক দিয়ে এটাই সঠিক পথ।

...আমরা একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী শত্রুর সাথে লড়াই করে চলেছি। কাজেই এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করাই আমাদের উদ্দেশ্য।... ধীরে ধীরে শক্তি সংগ্রহ করে আমরা শক্তির ভারসাম্য আমাদের দিকে সংহত করে তুলে চূড়ান্ত জয়লাভের পথে এগিয়ে গেছি।...'*১৭

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম পর্ব। হিটলারী সূর্য নোনা সাগরে ডুবে যাচ্ছে। জাপানীরাও বুঝলো, তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। যাবার আগে ইন্দোচীনের বুকে এক চাল চালতে চাইলো তারা। কিছু তাঁবেদারি লোক নিয়ে জাপ সম্রাট একটি তথা কথিত 'স্বাধীন সরকার' স্থাপন করতে চাইলেন ভিয়েতনামের বুকে। কিন্তু সম্রাট বাও-দাইয়ের সেই হঠকারিতার সামিল হতে রাজি ছিলনা ভিয়েতমিন্। ..দেশে এ সময় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অত বড় দুর্ভিক্ষ আর দেখা যায় নি। জাপানী ও ফরাসী সম্রাজ্যবাদীরা এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী। তারা ভিয়েতনামের সমস্ত শস্য নষ্ট করে দিয়েছিল, চাষীদের বাধা দিয়েছে চাষ-বাসে। প্রায় বিশ লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষে মারা যায়।

হো-চিন মিন্ জমিদার ও সরকারের শস্য ভাণ্ডার দখল করতে আহ্বান জানালেন। বুভুক্ষু জনতার সেই উত্তাল তরঙ্গ ঝাঁপিয়ে

জনযুদ্ধ ও গণফৌজ : ভো নগুয়েন গিয়াপ।*১৭

পড়লো দেশের প্রতিটি মজুতদারের উপর,—সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডল ভেঙ্গে তচনছ হয়ে গেলো !

মুক্তি বাহিনী ইতিমধ্যে হুয়ে শহর দখল করে নিয়েছে। ২৫শে আগস্ট সায়গনও তাদের করায়ত্ত হয়। ২৬শে আগস্ট বা ও দাই সিংহাসন ত্যাগ করে ভিয়েতনামের প্রজাতন্ত্রের প্রতি নিজের সমর্থন ঘোষণা করলেন।

২রা সেপ্টেম্বর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দিপনার মধ্য দিয়ে হ্যানয়ে হো-চিন-মিন্ দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। ভিয়েতনামের প্রতিটি বাড়িতে প্রজাতন্ত্রের সোনালী তারকা খচিত রক্ত পতাকা বিপ্লবের বিজয়বার্তা ঘোষণা করতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ। আবার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গুলি নিজেদের হৃত উপনিবেশ গুলি ফিরে পেতে চাইলো। ব্রিটিশ সরকার মদত দিলেন ফরাসী সরকারকে,—আবার দখল করে নাও ইন্দোচীন।

ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ গুলিই ফরাসীদের নামিয়ে দেয় ভিয়েতনামের উপকূলে। ১৯৪৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর সায়গন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আবার দখল করে নেয়। তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে ব্রিটিশের শক্তিশালী গুর্খা রেজিমেণ্ট। এমন কি, পরাজিত জাপানী সৈনিকরাও ইঙ্গ-ফরাসী আহ্বানে গণতান্ত্রিক মানুষ গুলিকে ঠেঙাতে আবার ধেয়ে আসে ইন্দোচীনে। সম্রাজ্যবাদের চরিত্রে এরা সবাই এক,—ব্রিটিশ, ফরাসী, জাপানী,— কোন প্রভেদ নেই ! জাপ সেনাপতি মিউমাটা ফরাসী ও ইংরাজদের আহ্বানে এগিয়ে এলেন ভিয়েতনামকে শায়েস্তা করতে।

প্রেসিডেণ্ট হো চিন মিন যুদ্ধ এড়াবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস পেলেন। কিন্তু মদগর্বী সম্রাজ্যবাদ চূড়ান্ত মার না খেলে কখনো আপোষে আসে না।

ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ গুলি হাইফং বন্দরের উপর সমানে গোলা

বর্ষণ করতে শুরু করে, অতর্কিত আক্রমণে হ্যানয়ের কয়েকহাজার নিরস্ত্র ভিয়েতনামীকে ফরাসীরা হত্যা করে বসে।

আরম্ভ হলো প্রচণ্ড সংঘর্ষ। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সাথে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ। দীর্ঘ নয় বৎসর এর স্থায়িত্ব। ২০শে ডিসেম্বর হো চিন মিন সমগ্র জাতিকে এই মুক্তি যুদ্ধে নেমে আসতে আহ্বান জানালেন। যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র,—উত্তর থেকে দক্ষিণে ; শহর থেকে দূর দূর গ্রামাঞ্চলেও।

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল। কয়েক লক্ষ সুশিক্ষিত যুদ্ধঅভিজ্ঞ সৈন্য তাদের ছিল, ছিল অঢেল আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র, শত শত বিমান, পর্যাপ্ত হেলিকপটার, বৃটিশ ও মার্কিন সর্বাধুনিক ট্যাঙ্ক এবং আমেরিকার ডলারের স্রোত। অপর পক্ষে, ভিয়েতমিনদের প্রায় কিছুই ছিল না। তারা প্রায় নিঃস্ব জনতা। হো চিন মিন দেশ গঠনের তখনো কোন সুযোগই পান নি,—ভিয়েতনামে আধুনিক শিল্প কারখানা বিশেষ গড়ে উঠেনি। আধুনিক সমরাস্ত্র তাদের যথেষ্ট নেই, অভাব আছে শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরের। কিন্তু যা ছিল, তা হলো বুক ভরা অসীম সাহসের বিস্তার, জন্মভূমির প্রতি প্রাণঢালা ভালবাসা এবং আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা। ভিয়েতনামই প্রথম প্রমাণ করল যে, একটি ছোট অনুন্নত দেশেরও জনতা তাদের সম্মিলিত মুক্তি সংগ্রামে বিশ্বের যে কোন আদর্শহীন বৃহৎ সম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাজিত করতে পারে। তাই দীর্ঘ ন'বছর লড়াইয়ের পর ১৯৫৫ সালের ৭ই মে দিয়েন বুয়েন ফু'র ঐতিহাসিক যুদ্ধে ফরাসী বাহিনী ভিয়েতনামের গণফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সে এক অভূতপূর্ব ঘটনা!

সে ইতিহাসের এক নতুন শিক্ষা!

ফরাসীরা দাঁত দিয়ে জুতো কামড়ে ভিয়েতনামের মাটি ছেড়ে পালালো। কিন্তু রেখে গেলো আর একটি দীর্ঘ আলম্বিত ছায়া,—

নয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। পুরনো সম্রাজ্যবাদ সরে গিয়ে শূন্য স্থান পূরণে আহ্বান জানালো আরো শক্তিশালী নয়া সম্রাজ্যবাদকে! পুরনো বোতলে নতুন লেবেল এঁটে আসরে নেমে পড়লেন পেন্টাগনেরা।

মার্কিন সরকার প্রথম থেকেই ফরাসী সরকারকে চাপ দিচ্ছিলেন,—চূড়ান্ত ভাবে সরে আসবার আগে তাঁরা যেন দক্ষিণ ভিয়েতনামে কোন এক গণ-সংযোগহীন প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে গদিতে বসিয়ে আসেন! ভিয়েতনামের তিন কোটি জনতার মধ্য থেকে কি একজন চিয়াং কাইশেককে খুঁজে বের করা যাবে না?

হ্যাঁ ভিয়েতনামের চিয়াং কাইশেককে অবশেষে খুঁজে বের করা হলো। তিনি হলেন বাও দাই। ফরাসী সরকার তাকে বসিয়ে এলেন সায়গনে। সাম্রাজ্যবাদী শিবির তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিল, বাওদাই সরকারই হলেন ভিয়েতনামের প্রকৃত 'গণতান্ত্রিক সরকার' এবং এই সরকারকে স্বীকার করে নিচ্ছে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড ইত্যাদি।

১৯৫০ সালেই ফরাসী বাহিনীর স্থান গ্রহণ করতে থাকে মার্কিন সৈন্যরা। আসতে শুরু করে ভাড়াটে জার্মান ও অস্ট্রিয়ান সৈন্য যারা কয়েক বৎসর আগে হিটলারের বাহিনীতে কাজ করেছে।

১৯৫৩ সালে মার্কিন জেনারেলরা এসে ফরাসী জেনারেলদের সাথে একটি সামরিক চুক্তি করেন। এই চুক্তিটিই Operation Vulture নামে কুখ্যাত। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এরপর থেকে ফরাসীদের সাহায্যের নামে ফিলিপাইন থেকে রোজ দঙ্গল দঙ্গল মার্কিন বিমান ভিয়েতনামে এসে বোমাবর্ষণ শুরু করে।

গণমুক্তি ফৌজকে রোখবার জন্য প্রেসিডেণ্ট আইজেন হাওয়ার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকেও এগিয়ে আসতে আহ্বান জানালেন। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ফষ্টার জন ডালেস চিৎকার করে বললেন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গণতন্ত্র রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনে মার্কিন

সরকার কমিউনিষ্ট হানাদারদের রুখবেনই! এমনকি, ডালেস ভিয়েতনামের রণাঙ্গনে ও দক্ষিণ চীনে এটম বোমা নিক্ষেপের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় ফ্রান্স ও বৃটেন এতে সায় দিতে পারে নি।* ১৮

ভিয়েতনাম থেকে ফরাসীরা যখন একেবারে বিদায় নিতে প্রস্তুত, ঠিক তখনই ভিয়েতনামে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক জেনেভা সম্মেলন বসলো। ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েত-নাম রাষ্ট্র, ফ্রান্স, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং বৃটেন এই আলোচনা সভায় যোগ দেয়। সম্মেলনে সাম্রাজ্য-বাদীরা দাবী জানালো, ভিয়েতনামকে উত্তর দক্ষিণ এই দুই অংশে বিভক্ত করা হোক। কিন্তু এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করে প্রজাতান্ত্রিক ভিয়েতনামের সুপরিচিত প্রতিনিধি ফাম ভান দং তার জ্বালাময়ী ভাষণে বললেন, ভিয়েতনামের কোন বিভক্তিকরণ ভিয়েতনামবাসী মেনে নেবে না। তারা তাদের মাতৃভূমির অখণ্ডতা রাখতে বুকের রক্তে টং কিং উপসাগর লাল করে ছাড়বে। চৈনিক প্রতিনিধি চৌ-এন-লাই, রুশিয়ার প্রতিনিধি এবং প্যাথেট লাওয়ের প্রতিনিধিরা উঠে দাঁড়িয়ে একে একে পূর্ণ সমর্থন জানালেন ভানদংয়ের বক্তব্যকে।

অনেক আলোচনা বিবেচনার পর জেনেভা সম্মেলনে স্থির হলো, ১৭তম অক্ষরেখা ধরে সামরিক গুরুত্ব অনুযায়ী একটি অস্থায়ী সীমা-রেখা Provisional military demarcation line টানা হবে। এর উত্তরে থাকবে ভিয়েতনামের গণমুক্তি ফৌজ এবং দক্ষিণে সমবেত থাকবে ফরাসীও মার্কিন সৈন্যরা। তারপর দু' বছরের মধ্যে ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ নির্বাচন। সেই

বৃটিশ সংবাদপত্র International Affairs এ অধ্যাপক জিওফ্রে ওয়ার্নার এই ঘৃণ্য মার্কিন চক্রান্ত প্রকাশ করে দিয়েছেন, এপ্রিল সংখ্যা, ১৯৫৫ *১৮

নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে সার্বভৌম সরকার। একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন এই নির্বাচন পরিচালনা করবেন।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রায় দেড়লক্ষ গরিলা সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে উত্তর ভিয়েতনামে চলে আসে। তারা আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তকে বিশ্বাস করেছিল। কারণ, মার্কিন প্রতিনিধি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর দেশ জেনেভা চুক্তিকে ভঙ্গ করবে না।

কিন্তু নয়া সাম্রাজ্যবাদ বড় ভয়ানক চিজ। মার্কিন সরকার জানতেন, নির্বাচন মানেই গণতান্ত্রিক ভিয়েতনামের জয় এবং সাথে সাথে 'মুক্ত এশিয়ার চাবি কাঠিটি [ মার্কিনদের কাছে মুক্ত এশিয়া মানে ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যাণ্ড ] তার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। প্রজাতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম নিঃসন্দেহে সাম্য বাদীদের দলগত শক্তি বৃদ্ধি করবে। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না।

মার্কিন সরকার আরো জানেন, যদি ভিয়েতনাম একবার কমিউনিষ্ট হয়ে যায়, তবে লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া ও কম্বোডিয়াও সাম্যবাদীদের শিবিরে একদিন যোগ দিয়ে বসবে। তারপর ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানও এই পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে। সাম্রাজ্যবাদের সেই ভয়ঙ্কর দিনটিকে মার্কিন সরকার কিছুতেই আসতে দেবেন না।

সাম্রাজ্যবাদের সেই অনিবার্য পরিণতির বিরুদ্ধে ৮ই সেপ্টেম্বর মার্কিন সরকার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা বা Seato নামে একটি সামরিক জোট গঠন করে। এর সদস্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড ও পাকিস্তান।

ঠিক এই সময় মার্কিন ফরাসী শক্তিজোট দিয়েম নামে এক ব্যক্তিকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের গদিতে এনে বসান। দিয়েমের জীবনী ও সামগ্রিক কার্যকলাপ অত্যন্ত ঘৃণ্য। দিয়েম দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে ফরাসী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। তারপর জাপানীরা

ইন্দোচীন অধিকার করলে দিয়েম জাপানীদের শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হন এবং জাপ গুপ্তচর বাহিনীতে যোগ দেন। প্রকাশ্যে অন্যভাব দেখিয়ে তিনি এ সময় একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের গোপন উদ্দেশ্য ছিল, বিপ্লবীদের হত্যা করা। দিয়েম বহু দেশ প্রেমিক বিপ্লবীকে এ ভাবে হত্যা করেন!

১৯৪৫ সালে বিপ্লবীরা এই বিশ্বাসঘাতককে গ্রেপ্তার করে। দিয়েম রাষ্ট্রপতি হো-চিন মিনের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চান। হো চিন মিন তাঁকে মুক্তি দেন।

মুক্তি পেয়েই দিয়েম একদিন সোজা পাড়ি জমালেন তাঁর মার্কিন মুরুব্বিদের দেশে। উপস্থিত হলেন নিউজার্সিতে। পেন্টাগনেরা তাঁর আদর-যত্নের ত্রুটি রাখলে না; কারণ জেনেভা চুক্তি বানচাল করে দিতে দিয়েমের মতো সাক্ষী গোপালের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এখন দিয়েম বসলেন দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রধানমন্ত্রীত্বের গদিতে। ঢালাও মার্কিন সাহায্য আসতে লাগলো। আরামে-বিলাসে-বৈভবে গা ভাসিয়ে দিলেন দিয়েম। ইতি মধ্যে ভিয়েতনামের রঙ্গমঞ্চ থেকে ধীরে ধীরে ফরাসীরা সরে পড়েছে এবং তাদের স্থান নিয়েছে মার্কিন সৈন্যরা। অক্টোবর মাসে দিয়েম রাজা বাও দাইকে সিংহাসন চ্যুত করলেন এবং তাঁর নতুন রাষ্ট্রের নামকরণ করলেন 'ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র'। তিনিই হলেন এই নতুন রাজ্যের সর্বেসর্বা,—রাষ্ট্রপতি!

উত্তর ভিয়েতনাম ব্যাপার-স্যাপার দেখে হতচকিত। এত বড় আন্তর্জাতিক হঠকারিতার কথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। প্রেসিডেন্ট হো চিন মিন জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী ভোট দাবী করে দিয়েমকে দুটি চিঠি লেখেন। কিন্তু দিয়েম তাঁর মার্কিন প্রভুর নির্দেশে অস্বীকার করলেন সেই অন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তকে।

পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার তাঁর স্মৃতি কথায় স্বীকার করে গেছেন, এ ছাড়া অন্য উপায় তাঁদের ছিল না, কারণ, ভোট গ্রহণ করা হলে অন্তত শতকরা আশিটি ভোট পেতেন প্রেসিডেন্ট হো চিন মিন। সম্রাজ্যবাদীদের এত বড় পরাজয় স্বীকার করে নেবার মানসিকতা White House এর ছিল না।

ঝাঁকে ঝাঁকে মার্কিন সৈনিক ও অফিসারেরা দক্ষিণ ভিয়েতনামে এসে আসর জমান। মার্কিনদের তালিমে দিয়েম প্রায় দুইলক্ষ সৈন্য নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তুললেন। প্রথম ক্ষেপেই প্রায় তিনশো পঞ্চাশ কোটি টাকার সামরিক উপকরণ এসে পৌঁছলো দিয়েম সরকারের কাছে।

মার্কিনী সামরিক সাহায্য ও পরামর্শদাতা দল দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে, মার্কিন অপারেশন্স মিশন এ দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক দায় দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং মিচিগ্যান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে এগিয়ে এলো স্থানীয় শাসক ও পুলিশ বিভাগ। এক কথায় দক্ষিণ ভিয়েতনাম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি মার্কিন কলোনীতে রূপান্তরিত হলো। আনন্দে উল্লাসে দিয়েম ফুলে ফেঁপে উঠলেন।

স্পষ্টবাদী ইংরাজ সংবাদিক ডেভিড হোথাম তাই যথার্থই মন্তব্য করলেন,

"দক্ষিণ ভিয়েতনাম আজ বিশ্বের সবচেয়ে পরাধীন দেশগুলির অন্যতম!"

দিয়েম রাষ্ট্রপতি। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা প্রাসাদের বাইরে বেশী দূর প্রসারিত নয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মেহনতী মানুষ এমন বিশ্বাস-ঘাতকতা বরদাস্ত করতে রাজী নয়। অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েও এখানকার গ্রামগুলি জনযুদ্ধের এক একটি শক্ত ঘাঁটি হয়ে ওঠে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের তিনটি শক্তিশালী সশস্ত্র ধর্মসম্প্রদায় বিন খুয়েন, হোয়া হাও ও কাউ দাই দিয়েম-কর্তৃত্ব মানতে রাজি হলো না। তাই দিয়েমের প্রথম কাজ হলো এই তিনটি সম্প্রদায়কে

সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলা। এবং ছলে বলে কৌশলে দিয়েম তাতে সমর্থ হন।

এরপর শুরু হলো সাধারণের উপর অত্যাচার। চললো গ্রামে গ্রামে নির্বিচারে হত্যা ও লুণ্ঠন। সামান্য সন্দেহ ভাজন লোক হলেই ঠেলে পাঠানো হলো দিয়েম সরকারের নরক সাদৃশ্য কারাগারে। কৃষকদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে বড় বড় জমিদারদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন দিয়েম।

ভিয়েতনামের সংগ্রামী মানুষ কিছু দিনের মধ্যেই এই বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠে এবং মাথা তুলে দাঁড়ায় দিয়েম-মার্কিন চক্রের বিরুদ্ধে। ক্রমশ বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে সর্বত্র। অসংখ্য, সভা, মিছিল, পিকেটিং করে জনগণ বিক্ষোভ জানাতে থাকে। নির্বাচনের ভিত্তিতে দুই ভিয়েতনামের একত্রী করণের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেন প্রতিটি মুক্তিকামী ভিয়েতনামী। সাথে সাথে জনতার কণ্ঠরোধ করবার জন্য দিয়েমের দমন নীতি চরম বর্বরতা অবলম্বন করেছে, বীভৎস থেকে বীভৎসতর হয়ে উঠেছে তাঁদের অত্যাচার। রাইফেলের বাট দিয়ে হত্যা করা হয়েছে বহু মেহনতী চাষীকে, বেয়নেটের খোঁচায় ক্ষত বিক্ষত শ্রমিকের দেহ লুটিয়ে পড়েছে প্রকাশ্য রাজপথে, বিদ্রোহিনী ভিয়েতনামী নারীকে ধরে এনে ডজন ডজন মার্কিন সৈন্য তাকে ধর্ষণ করেছে, তার যোনিতে প্রবেশ করিয়েছে বিষাক্ত সাঁপের বাচ্চা,—এত বড় জঘণ্য অপরাধ নাৎসীরাও নিশ্চয় করে নি।

দিয়েমের বিরাট বিরাট 'বন্দী শিবির' মানুষে ভর্তি হয়ে যায়। বিচারের প্রহসনে শত শত নর-নারীকে হত্যা করা হতে থাকে। এমনকি, এক ধরণের গিলোটিন এনে সংগ্রামী মানুষের মাথা কাটা শুরু হয়। সে এক নরকীয় বীভৎস দৃশ্য! দিয়েম উন্মাদ রোবস্-পীয়রের ইতিহাসকেও ম্লান ক'রে দিলেন।

দলে দলে সৈন্যদের বিভক্ত করে দিয়েম সংগ্রামী গ্রামগুলিকে ধ্বংস করতে এগিয়ে এলেন। এক একটি আক্রমণে দশ থেকে

পনের হাজার সৈন্য অংশ গ্রহণ করতো। এদের পিছন পিছন আসতো আরো হাজার হাজার আধা সামরিক নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশ গোয়েন্দাদের দল। কামান, যুদ্ধজাহাজ, হেলিকপটার, স্যাভার জেট—ইত্যাদি সমস্ত অস্ত্রই ব্যবহার করা হতো এই বর্বর অভিযান গুলিতে। ন্যাপামের আগুনে ঝলসে গেছে শত শত মানুষ, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে গ্রামের পর গ্রাম। তবু ভিয়েতনাম দাঁড়িয়ে রইলো! ন্যাপাম দগ্ধ মানুষগুলি তবু অপরাজেয় রয়ে গেলো। কবি বন্ধু সুমিত চক্রবর্তীর ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়:

"ন্যাপাম-বারুদ ঝলসানো মুখ তুলে
পুরা প্রাক্তন ইতিহাসটুকু ভুলে
নবজন্মের স্পন্দিত দ্বার খোলে
একটি গন্ধরাজ।
ঈশাণ কোণেতে শকুনির সন্ত্রাসে
নৈমিত্তিক বিপন্নতার পাশে
লালসা-ধোঁয়ায়, রক্ত আবিরে হাসে
একটি গন্ধরাজ।......

সাম্রাজ্যবাদীদের হিসেবেই ধরা পড়েছে, ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার মার্কিন-সহযোগিতায় দক্ষিণ ভিয়েতনামেই এক লক্ষ ষাট হাজার জনকে হত্যা করেছে, ছ'লক্ষ আশি হাজার জনকে করেছে বিকলাঙ্গ এবং চার লক্ষের উপর মানুষকে পচিয়ে মারছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের কারাগার গুলিতে।

এ পর্যন্ত ভিয়েতনামী জনতা দিয়েম-মার্কিন চক্রের কাছে মারই খেয়ে এসেছে। এবার পাল্টা মার দিতে লাগলো তারা। পাহাড়ী উপজাতি থেকে শুরু করে সমতলের শহরেও গ্রামবাসীরাও প্রত্যাঘাত দিতে আরম্ভ করে।

বিভিন্ন ইউনিটে ইউনিটে গড়ে উঠলো সশস্ত্র গণ প্রতিরোধ বাহিনী। পুরাতন ও আধুনিক,—দু'ধরণের অস্ত্রেই তারা সজ্জিত। স্থানে স্থানে কৃষকদের বিদ্রোহ, শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ আক্রমণ,—

ভিয়েতনামী জনতার প্রত্যাঘাত দেবার শক্তি দেখে কম্পিত দিয়েম। সমানে মর্কিন কামান, ট্যাঙ্ক, বিমান প্রভৃতির ব্যবহার করেও গণ-বিদ্রোহকে দমন করা যাচ্ছে না।...শত্রুর ঘাঁটির খুব কাছাকাছি, এমনকি শত্রুর শিবিরেও বিপ্লবীরা অতর্কিত আক্রমণ করে বসেছে। ভিয়েতনামের বৈশিষ্ট্য হলো, এদেশের মেহনতী কৃষক ও শ্রমিকরা বুর্জোয়াদের অপেক্ষা অনেক বেশী সচেতন এবং তারা প্রত্যেকেই চূড়ান্ত আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত।

দিয়েম সরকারের বিপদ ঘনিয়ে আসে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও। ১৯৬০ সালের ১২ই নভেম্বর কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার দিয়েমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। অবশ্য তাঁদের এই অভ্যুত্থান দমিত হলো।

১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মাঝা মাঝি সময়ের মধ্যে ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধ চতুর্দিকে ব্যাপকতা লাভ করে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের অসংখ্য গ্রামে এরই মধ্যে দিয়েমী শাসনের অবসান ঘটেছে। এমন কি দিয়মের বহু সৈন্য তাদের অস্ত্র নিয়ে দলে দলে মুক্তি বাহিনীতে এসে নাম লেখাতে থাকে।

দিয়েমের পতন অনিবার্য হয়ে উঠছে দেখে মার্কিন সরকার মরিয়া হয়ে আরো সর্বাত্মক যুদ্ধে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। তাঁদের নতুন পরিকল্পনার নাম হলো 'স্টেলি-টেলর পরিকল্পনা'। এতে তিনটি সিদ্ধান্ত ছিল :

(১) ১৮ মাসের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের খতম করতে হবে।

(২) উত্তর ভিয়েতনামে গোপনে গুপ্তচর ও সৈন্যদের পাঠিয়ে ওখানে অন্তর্ঘাত মূলক কার্যকলাপ চালানো হবে; এবং ভবিষ্যতে ব্যাপক ভাবে সামরিক অভিযান চালাতে হবে হ্যানয়কে লক্ষ্য করে।

(৩) দক্ষিণ ভিয়েতনামকে সমস্ত দিক থেকে শক্তিশালী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গড়ে তুলে কমিউনিস্ট প্রভাবকে দূর করতে হবে।

দিয়েমের সৈন্যসংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি করা হলো। এদের পরিচালনার দায়িত্ব নিলো মার্কিন সমর দপ্তর 'মিলিটারি এণ্ড কমাণ্ড'।...বিশাল সাঁজোয়া বাহিনী তাদের বর্বর অভিযানে গ্রামের পর গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করে তোলে। কিন্তু ভিয়েতমিন্‌দের কাবু করা গেলো না। বরং দিনের পর দিন ভিয়েতকঙদের আক্রমণে অবিশ্বাস্য ক্ষয় ক্ষতি হতে থাকে পেণ্টাগনদের।

ভিয়েতনামীদের বিক্ষিপ্ত অথচ সুসংবদ্ধ চোরা গোপ্তা আক্রমণে সাম্রাজ্যবাদীরা দিনের পর দিন আতঙ্ক গ্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারীতে আপ বাকে বিরাট মার্কিন শিবিরকে আক্রমণ করলো মাত্র দুইশত জন মুক্তিসেনানী। তাদের আক্রমণে দুই হাজার মার্কিন সৈন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের অনেকেই ভিয়েতনামীদের গুলিতে প্রাণ হারায়, অবশিষ্টরা পালিয়ে বাঁচে। বহু হেলিকপটার, জেটবিমান, কনভয় ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বিনষ্ট হয় মুক্তিকামীদের বেপরোয়া আক্রমণে।

শত্রুকে এমন নির্মম আঘাত হানতে থাকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সর্বত্র। মার্কিন সরকার বিরক্ত হয়ে উঠলেন দিয়েমের উপর। তাঁদের ধারণা হলো, দিয়েমকে পদচ্যুত করলে অবস্থা পরিবর্তিত হতে পারে। ইতিমধ্যে দিয়েমের ধর্মান্ধতার জন্য দেশের সমস্ত বৌদ্ধরা দিয়েমের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন। ব্যাপক বৌদ্ধ বিক্ষোভে দক্ষিণ ভিয়েতনাম দোল খেতে থাকে। একাধিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতি দেন।

মার্কিন সরকারের নির্দেশেই ১৯৬৩ সালের ১লা নভেম্বর কয়েক জন সামরিক অফিসার দিয়েমকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেন। দিয়েম ও তাঁর এক ভাই নিহত হন।

এরপর দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনীতিমঞ্চে ঘন ঘন নেতা-পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বহু তাঁবেদার সরকারের পতন ও উত্থান হয়। জনগণের মুক্তি যুদ্ধ আরো তীব্র ও দুর্বার হয়ে আসে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের গ্রামের পর গ্রাম তখন মার্কিন শাসন মুক্ত; মার্কিন

রাষ্ট্রদূত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক সময় নায়ক ম্যাক্সওয়েল টেলর ভিয়েতমিন্দের সাফল্যে পাগলের মতো দাপাদাপি করছেন—আরো সৈন্য পাঠাও, পাঠাও আরো রসদ, যুদ্ধট্যাঙ্ক, জঙ্গীবিমান, যুদ্ধ জাহাজ·· ।

মুক্ত এলাকা গুলিতে নতুন জীবনের স্পন্দন শ্রুত হয়। দ্রুত শোষণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটে সেখানে। স্থাপিত হয় হাঁসপাতাল, বিদ্যালয়, ঔষধের কারখানা, ছাপাখানা ইত্যাদি। ছোট ছোট কারখানাও মাটির নীচে স্থাপিত হলো। মাথার উপর শত্রুর বিমান চক্কর মারে, বোমা ফেলে, আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিক। গণশক্তি আবার সেই ক্ষতি দ্রুত পূরণ করে আরো সামনের দিকে এগিয়ে চলে জোর কদমে।

একদিকে মুক্ত অঞ্চলে শোষণমুক্ত, অত্যাচার মুক্ত, নতুন প্রাণ শক্তির আবির্ভাব, অন্যদিকে মার্কিন তাঁবেদারদের এলাকায় দুর্নীতি, ধর্ষণ, অত্যাচার ও অনটনের দুর্বিষহ রাজত্ব। মার্কিন সৈন্যদের কল্যাণে দ্রব্য মূল্য সেখানে দিন দ্বিন আকাশস্পর্শী—সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার একেবারে বাইরে। তার উপর আছে, জোর করে ধরে ধরে সৈন্যবাহিনীতে লোক ঢুকানো।

১৯৬৪ সাল।

মুক্তি যোদ্ধারা এবার দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গন শহর পর্যন্ত এসে পৌঁছে গেছে। যখন তখন প্রচণ্ড আক্রমণে ধ্বসে পড়ছে বিরাট বিরাট অট্টালিকা, দাউ দাউ আগুন জ্বলছে মার্কিন রাজপুরুষদের আবাসে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে মার্কিন সৈন্যদের মধ্যেও। ওরা আর কাউকে বিশ্বাস করে না, প্রকাশ্যে পথে-ঘাটে বের হয় না। অধিকাংশ সময়ই নিজেদের সুরক্ষিত ব্যারাকে অবস্থান করে। হাজার হাজার গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে গরিলাদের সন্ধানে। কিন্তু ব্যর্থ। সমস্তই ব্যর্থ।

মে মাসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রচণ্ড মার খেলো। সায়গন নদী ধরে এগিয়ে আসছিল পনেরো হাজার টনের একটি বিশাল মার্কিন

বিমানবাহী জাহাজ। অতর্কিত আক্রমণে পনেরটি বিমান সহ সেই জাহাজটিকে সায়গন নদীতে ডুবিয়ে দেয় মুক্তি যোদ্ধারা।

গরিলারা মার্টার, দূর পাল্লার কামান, বাজুকা ইত্যাদি দিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে প্রতিটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে। তারা বিয়েন হোয়া ঘাঁটিটিকে প্রায় বিধ্বস্ত করে ফেলে। যখন তখন চোরাগোপ্তা আক্রমণ তো লেগেই আছে।

এমন কি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের জীবনও আর নিরাপদ ছিল না।

ক্ষিপ্ত যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করলো, উত্তর ভিয়েতনামকে শায়েস্তা করতে না পারলে এই সমস্ত 'দস্যুদের হামলাবাজী' বন্ধ করা যাবে না। অতএব শুরু হলো এ যুগের বীভৎসতম বিমান আক্রমণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মোট নিক্ষিপ্ত বোমার চাইতেও কয়েক গুণ বেশী টনের বোমা মার্কিন সরকার এ পর্যন্ত উত্তর ভিয়েতনামের উপর নিক্ষেপ করেছেন। প্রেসিডেণ্ট হো-চিন-মিন জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন, এই কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি হবার জন্য। এতটুকু ভীত বা চঞ্চল তারা নয়। তারা জানে, চূড়ান্ত জয়ের পথে এটাই শেষ বাধা।

মার্কিন বোমারু বিমান গুলি বোমা নিক্ষেপ করছে উত্তর ভিয়েত-নামের শিল্প, সেতু, স্কুল-কলেজ, হাঁসপাতাল ইত্যাদি সমস্ত লক্ষ্য বস্তুতে। টন্‌কিন উপসাগর ছেয়ে ফেলেছে মার্কিন সপ্তম নৌবহর। সেখান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারুগুলি ছুটে আসছে, আসছে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও থাইল্যাণ্ডের বিমান ঘাঁটিগুলি থেকে। লক্ষ লক্ষ টন টি. এন. টি. ন্যাপাম ও গ্যাস বোমা এসে ফেটে পড়ছে সাম্যবাদী উত্তর ভিয়েতনামের বুকের উপর। বিমান থেকে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে তীব্র রাসায়নিক বিষ।

মার্কিন সৈন্য সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ছয় লক্ষতে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া আছে পেণ্টাগনদের তাঁবেদার অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের প্রায় আশি হাজার ভাড়াটিয়া সৈন্য।

তবু সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজয় সুনিশ্চিত। হাজার হাজার মার্কিন যুবক প্রাণ হারাচ্ছে ভিয়েতনামের রণাঙ্গনে, শত শত কোটি কোটি

ডলার ব্যায়িত হচ্ছে এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধে, দেশে দেখা দিচ্ছে মুদ্রা-স্ফীতি। সঞ্চিত ডলারে ঘাটতি পড়েছে, সমগ্র আমেরিকা জুড়ে বুদ্ধি-জীবীরা প্রচণ্ড যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন, একের পর এক তাজা প্রাণ আত্মাহুতি দিয়ে White House-কে সংযত হতে বলছে।

ক্লান্ত, ক্ষুব্ধ জনসন তাই একদিন উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণের আদেশ ফিরিয়ে নিলেন। ঘোষণা করলেন, তিনি আর মার্কিন প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়াবেন না।

শান্তির জন্য মার্কিন, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, উত্তর ভিয়েতনাম ও মুক্তি যোদ্ধাদের আলোচনা সভা বসলো ফ্রান্সে।...নতুন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নিক্সন ধীরে ধীরে মার্কিন সৈন্যদের ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছেন। 'অবশ্য না আঁচালে বিশ্বাস নেই; সাম্রাজ্যবাদীদের সহজে শিক্ষা হয় না।'

এরই মধ্যে আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি কামীরা নিজেরাই একটি স্বতন্ত্র সরকার গঠন করে ফেলেছে। সম্ভবত এর জন্য সায়গনের বর্তমান থিউ সরকার ও প্রেসিডেণ্ট নিক্সনও প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা হকচকিয়ে গেছেন বলে মনে হয়। নতুন বিপ্লবী সরকার দ্রুত নিজেদের শক্তিশালী করে নিচ্ছেন দক্ষিণ ভিয়েতনামে। অনেক আগে থেকেই গঠন মূলক কাজের মাধ্যমে মুক্তি যোদ্ধারা তাঁদের সরকারের বনিয়াদকে দৃঢ় করবার চেষ্টা করে আসছেন। আজ তাঁরা বিশ্ববাসীকে চমক দিয়ে ঘোষণা করেছেন, আর তাঁদের একটি বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহী দল বলে ভাবলে ভুল করা হবে। সায়গনের প্রকৃত জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁদের দ্বারা। নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন সোভিয়েট রাশিয়া, লাল চীন, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, মিশর, সিরিয়া ইত্যাদি দেশগুলিও।

মার্কিন সরকার ও থিউ সরকারের পক্ষে এই বিপ্লবী সরকারকে অস্বীকার করা সহজ হবে না। কারণ, প্রকৃত প্রস্তাবে এই সরকারই

দক্ষিণ ভিয়েতনামের অধিকাংশ স্থান নিজেদের কব্জায় এনে ফেলেছেন।

তাই প্যারিসের শান্তি বৈঠকের চরিত্র পাল্টে গেছে। তুলো লিখেছে, "…মার্কিন সরকার প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছেন।…নতুন সরকারই যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রকৃত গণ-সমর্থিত সরকার, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এই সরকারের অধীনে রয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ১২৭১টি গ্রাম, ১২৪টি ক্যান্টনমেণ্ট এবং সায়গন সহ দক্ষিণ ভিয়েত-নামের নব কয়টি বড় বড় শহর ও নগর।…"

ভিয়েতনাম যুদ্ধে বিপ্লবীদের বিজয় আজ ঐতিহাসিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু এই বৃহৎ গণ-বিপ্লবে ভারত সরকারের ভূমিকা কী? জেনেভা চুক্তিগুলিকে যথাযথ প্রতিপালিত করবার তদারিক ছিল ভারত সরকারের উপর। কিন্তু ভারতবর্ষ বোধ হয় তার দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত সচেষ্টতা দেখাতে পারে নি।

"U. S. News and World Reports" নামক একটি মার্কিন সংবাদ পত্র ১৯৫৫ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রকাশ করে দেয়, ভারত সরকার ভিয়েতনাম রণাঙ্গনে পরোক্ষ ভাবে মার্কিন পক্ষকে সাহায্য করে চলেছে। ভারত থেকে প্রচুর কাপড়, ট্রাক ও ইস্পাত যাচ্ছে মার্কিনদের শক্তিশালী করতে।

১৯৫৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর 'New York Times' পত্রিকায় মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি হিউবার্ট হামফ্রে ঘোষণা করলেন, "দক্ষিণ ভিয়েতনামে দাঁড়িয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয় উপলব্ধি করছে, অবশেষে ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে এশীয় রাষ্ট্র জোট গঠন ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিজমের প্রসার রোধ করা সম্ভব নয়!"

[ All though remaining in South Vietnam, the United States must realise that in the long run there is no real defence against Communism in South-East

Asia without an Asian coalition of Powers with India as its main force. ]

ভিয়েতনামে প্রচণ্ড মার খেয়ে নয়া সাম্রাজ্যবাদ হয়তো শেষ থাবা বসাতে পারে ভারতবর্ষের উর্বর জমিতে। ক্রমাগত চৈনিক-ভীতির প্রচার কি সেই পরিণতির কথাই জানিয়ে দিচ্ছে ?

কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণও ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠছে। তাদের মধ্যেও বৈপ্লবিক চেতনা দ্রুত প্রসারিত! প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীরাও এ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে! দিল্লীর দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা এ সত্যটুকু জেনে রাখবেন!

## ॥ বারো ॥

১লা মে।

মে দিবস!

অফিস-কোর্ট কল-কারখানা সমস্ত বন্ধ। মেহনতী মানুষদের ছুটি দিয়েছেন আজ যুক্তফ্রন্ট সরকার। শ্রমিকদের এই ঐতিহাসিক বিধানকে এর আগে কোন রকম সম্মান জানাননি পূর্ববর্তী কংগ্রেস রাজ। এটা ওদের দীনতা ও হীনমন্যতা।

বিকেলে একটি স্থানীয় সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। বর্ধমানের চিড়াকলগুলির বহু শ্রমিক সেখানে উপস্থিত ছিল। লাল পতাকা ও ফেষ্টুন তাদের হাতে। কয়লা ঠেলা ও ইস্পাত ভাঙ্গা হাত—আজ অধিকার পেতে চায়!···যারা বলেন, সর্বসাধারণ রাজনীতি বোঝে না এবং হুজুগে নাচে—তাঁদের চিন্তাশক্তিতে যথেষ্ট দীনতা আছে বলে আমি মনে করি।

কাজের ঘণ্টা কমাবার আন্দোলনের সাথেই মে দিবসের ইতিকথা জড়িত আছে। এই আন্দোলন সর্ব প্রথম দানা বাধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে—সেখানকার শ্রমিকরাই সর্ব প্রথম দাবী জানিয়েছিল কাজের সময় কমাবার।

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা শোষণের কোন সীমা নির্দিষ্ট করতে রাজি হয় না। তীব্র সংগ্রারের মধ্য দিয়েই শ্রমিকদের আদায় করে নিতে হয় তাদের নায্য দাবীকে।

শিল্প বিপ্লবের প্রথম স্তরে শ্রমিকদের কোন বিশ্রাম ছিল না; অমানুষিক কাজের চাপে পিষ্ট তাদের জীবনী শক্তি অকালে ঝরে যেত। 'সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত' এই ছিল তখনকার দিনের কাজের ঘণ্টা।

১৮৩৪ সালে ন্যূইয়র্কে একটি রুটির কারখানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট

করে। ওদের দাবী ও অবস্থা প্রতিফলিত হলো Working men's Advocate পত্রিকায়:

"প্রাচীন মিশরীয় ক্রীতদাস প্রথার চাইতেও ভয়াবহ শোষণের মধ্যে এই রুটি কারখানার শ্রমিকরা বছরের পর বছর পরিশ্রম করে চলেছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো থেকে কুড়ি ঘণ্টাই তাদের এখানে খাটতে হয়!"

মার্কিন শ্রমিকদের বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠন 'National Labour Union' তার সংবিধানে প্রথমেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল:

"এই দেশের শ্রমজীবী মানুষদের পুঁজিবাদীদের দাসত্বের হাত থেকে মুক্ত করবার প্রধান উপায় হলো, আইন করে রাজ্যের সর্বত্র দৈনিক আট ঘণ্টার বেশী খাটানো নিষিদ্ধ করে দেওয়া।...এই মহান লক্ষ্য পূর্ণ করবার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!"

ন্যাশানাল লেবর ইউনিয়নের ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে ১৮৬৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভা 'দৈনিক আট ঘণ্টা শ্রমের' দাবী স্বীকার করে নেন। সে সময়ের শ্রমিক-আন্দোলনের সবচেয়ে বড় নেতা ছিলেন বোস্টনের এক শ্রমিক ইরা স্টুয়ার্ড।

এই প্রসঙ্গে বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণীয় যে, ধনিকতন্ত্রী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বপ্রথম পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের কথা ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, National Labour Union মার্কিন দেশে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে নি। এর নেতা সিলভিসের আকস্মিক মৃত্যুতে এই বৃহৎ সংগঠনটিরও অপমৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুতে মার্কিন দেশের শ্রমিক আন্দোলন কয়েক শত বৎসর পিছিয়ে গেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সম্মেলন তাই শোক প্রস্তাবে বলেছিল,

"আমাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো সিলভিসের উপর। বিপুল কর্ম-দক্ষতা ছাড়াও, শ্রমিক-বাহিনীর সেনা নায়ক হিসাবে

তাঁর ছিল দীর্ঘ দশ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।—সেই সিলভিস আর নেই!"......

মার্কিন দেশে শ্রমিক নিপীড়ন ও আট ঘণ্টা কাজের আন্দোলন সম্পর্কে কার্ল মার্কস তাঁর "ক্যাপিটাল" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বললেন:

"আমেরিকায় দীর্ঘদিন ধরে ক্রীতদাস প্রথা প্রবর্তিত ছিল। সেই ক্রীতদাসত্বের ফলে মার্কিন প্রজাতন্ত্রের একটি অংশ বিকলাঙ্গ হ'য়ে থাকায় এত দিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃত আন্দোলন জড়ত্বে ভুগছিল। কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক যেখানে ক্রীতদাস, শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকও সেখানে মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে পারেন না। ক্রীতদাসত্বের সমাধির উপরই তাই নব-জীবনের অভ্যুদয় ঘটছে। গৃহ যুদ্ধের প্রথম অবদান হল দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের আন্দোলন,—দুর্বার গতিতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত, নিউ ইংল্যাণ্ড থেকে ক্যালিফার্নিয়া অবধি।"

প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সম্মেলনে ১লা মে দিনটিকে শ্রমিকদের দাবী আদায়ের সংগ্রামী দিন হিসাবে ঘোষণা করা হয় ১৮২৯ সালে।

ইতিমধ্যে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে চলেছে ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট। প্রতিটি শ্রমিক ইউনিয়ন দিনের পর দিন শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। এদের সদস্য সংখ্যাও অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত ইউনিয়ন গুলির মধ্যে "Nights of Labour" সর্বাধিক শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যাই ছিল সাত লক্ষের উপর।

ধর্মঘটের দাবানল সবচেয়ে বেশী প্রসার লাভ করেছিল শিকাগো শহরে। শিকাগোর দৃষ্টান্তে আন্দোলনে যোগ দিল ন্যু ইয়র্ক, বাল-টিমোর, ওয়াশিংটন, মিলওয়াকী, সিনসিন্নাটি, সেণ্টলুই, পিটস্‌বুর্গ, ডেট্রয় এবং অন্যান্য শিল্পসমৃদ্ধ স্থান গুলি।

১লা মের ডাকে শিকাগোতে হাজার হাজার শ্রমিক কারখানার চত্বর ত্যাগ করে নেমে আসে মুক্ত আকাশের নীচে। এত বড় শ্রেণী-সংহতি এর আগে অন্য কোন আন্দোলনে দেখা যায় নি। প্রত্যেকের মুখে সেই এক শ্লোগানঃ "এমন ভাবে শোষণ করা চলবে না! দৈনিক আট ঘণ্টার বেশী শ্রম আমরা দেবো না!"

পুঁজিবাদীরাও অবশ্য বসে নেই। তাদের অভিব্যক্তি গুলি ক্রমশঃ জঙ্গী ও হিংস্র হয়ে ওঠে! তারা শ্রমিকদের খুনে হাত রাঙাতে বদ্ধ পরিকর হলো।

শ্রমিক-মালিক এই বিরোধ ভয়াবহ রক্তাক্ত পরিণতি লাভ করে ৩রা মে। ঐ দিন ম্যাক-কর্মিক রিপার কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিক-দের এক সভায় একদল পুলিশ হিংস্র জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের এলোপাথাড়ি গুলিতে ছ'জন শ্রমিকের প্রাণহীন বুলেট বিদ্ধ রক্তভেজা দেহটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, কয়েক শত আহত শ্রমিক যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে!

এই বর্বরচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়লো আমেরিকার শ্রমজীবী মানুষরা। তার পরদিনই ৪ঠা মে হে-মার্কেট স্কোয়ারে একটি শ্রমিক সভায় আবার শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এবার কিন্তু শ্রমিকরা মুখ বুজে মার হজম করে নি। তাদের পাল্টা আক্রমণে একজন সার্জেন্ট সহ সাতজন পুলিশ প্রাণ হারায়; চার জান শ্রমিকও প্রাণ দিলো পুলিশের গুলিতে। কত শত জন যে আহত হলো তার ইয়ত্তা নেই। হে-মার্কেটে রক্তের বান ডেকেছে যেন।

শুরু হলো ব্যাপক ধড় পাকড়। ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন সাইজ, ফিসার, পার্সন্স্, এঙ্গেলস ইত্যাদি মার্কিন শ্রমিক বন্ধুরা।

কিন্তু রক্ত চক্ষু দেখিয়ে ও রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়া গেলো না। বরং ঐ ১লা মের দাবী ক্রমশই একটি আন্তর্জাতিক দাবী রূপে স্বীকৃতি পেলো।

১৮৮০ সালের ১লা মে কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার রচনার চতুর্থ সংস্করণে মে দিবস সম্পর্কে এঙ্গেলস্ লিখছেন :

"এই কথা গুলি আমি যখন লিখছি ঠিক তখনই ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী তাদের সামর্থ্যকে সংহত করছে। ইতিহাসে এই প্রথম শ্রমিক শ্রেণী একটি সেনাদল হিসাবে, একই পতাকাতলে, একটি মাত্র আদর্শের জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। তাদের দাবী হলো কাজের সময়কে দৈনিক আট ঘণ্টাতে সীমাবদ্ধ করা।......আজ আমরা যে অবস্থা দেখছি তাতে দেশের সমস্ত পুঁজিবাদী ও জমিদারেরা উপলব্ধি করতে পারবেন, সমস্ত দেশের শ্রমিকরা আজ সত্যি সত্যিই ঐক্যবদ্ধ। হায়, এমন দিনে যদি মার্কস আমার পাশে দাঁড়িয়ে এমন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে পারতেন!"

১৯০০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত অন্তর্জাতিক কংগ্রেসে আবার মে দিবসের দাবীটি গৃহীত হয়।...এই ভাবে "পয়লা মে লাল দিনে পরিণত হল ; বছরের পর বছর পয়লা মে ঘুরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী শঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগল।

রুশ বিপ্লব শ্রমিকদেরই বিপ্লব। তাই মে দিবস রাশিয়ার শ্রমিকদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক শপথ। বিপ্লবের অনেক আগেই লেনিন মে দিবসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক ইশ্‌তেহার রচনা করেন। এই ইশ্‌তেহার রাশিয়ার সমস্ত শ্রমজীবী মানুষদের হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। এই ইশ্‌তেহারটি রুশ শ্রমিকদের বিপ্লবের পথে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

লেনিনের মে দিবসের বাণীতে বর্নিত আছে।

"...কলকারখানার গুমোট পরিবেশকে পিছনে রেখে লাল নিশান উড়িয়ে সংগীতের তালে তালে তাঁরা মার্চ করছেন শহরের বড় বড় সড়কে। মালিকরা তাই উপলব্ধি করতে পারছেন শ্রমিকদের ক্রম বর্ধমান শক্তিকে। শ্রমিকরা বিরাট বিরাট গণ-সমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন শোষণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। সেই সমাবেশে ভবিষ্যতের সংগ্রামী

কর্মসূচীও রাখা হচ্ছে সবার সামনে। মালিকরা ১লা মে কাজ না করার দরুণ শ্রমিকদের উপর কোন রকম জরিমানা চাপিয়ে দিতে সাহস পান না ; কারণ ধর্মঘটের ভয় আছে। এই ১লা মে শ্রমিকরা আবার মালিকদের স্মরণ করিয়ে দেন তাঁদের দাবী : আট ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা আমোদ প্রমোদ, আট ঘণ্টা বিশ্রাম এটা আজ সর্বদেশের সমস্ত শ্রমিকদের দাবী।"

মে দিবস রাশিয়ার বিপ্লবী জনতা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রতি বৎসর উদ্‌যাপন করে থাকেন। লেনিন ছয় মাস আগে থেকেই এই দিনটি স্মরণীয় করে রাখবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পেতেন। তিনি বলতেন, মে দিবস হলো শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগতি ও সমাজ-তন্ত্রের জন্য সরাসরি সংগ্রাম !

মে দিবসে মেহনতী মানুষদের মুখ্য দাবী হলো :

(ক) বিশ্বের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য।

(খ) সর্বজনীন ভোটাধিকার।

(গ) সম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণের অবসান।

(ঘ) মিছিল ও শ্লোগান দেবার অধিকার।

(ঙ) রাজবন্দীদের মুক্তি।

(চ) শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন গুলির সরকারী স্বীকৃতি পাবার অধিকার।

মে দিবসই রুশ বিপ্লবের প্রাণ। মে দিবসই আগামী দিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গুলির পথ নির্দেশক তারকা।

মে দিবসে শ্রমিকরা তাদের দাবী পূরণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে, নতুন প্রাণ শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সার্থক আন্দোলন গড়ে তোলেন শ্রমিক সম্প্রদায়। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত প্রতিটি মে দিবসে শ্রমিকদের প্রতিজ্ঞা ছিল, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। বাস্তবিক পক্ষে, ফ্যাসিদের পরাজয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা এই শ্রমিক শ্রেণীর। নৈতিক বলে বলীয়ান শ্রমজীবী মানুষই এ যুগের

ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নায়ক। শোষণ ও পীড়ন মুক্ত সমাজতন্ত্রী দুনিয়া প্রতিষ্ঠানে তাদের সংগ্রাম ছেদহীন। সেই সংগ্রামের প্রেরণার উৎস যে দিবস,—যে দিবস বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষদের একই সূত্রে আবদ্ধ রেখেছে, একই সংহতি ও আদর্শে উদ্দীপ্ত করে রাখবে চিরদিন!

## ॥ তেরো ॥

"Why should you not give a note on Indonesia?"
—জাকার্তা প্রত্যাগত ডঃ বসুমল্লিক আমাকে বললেন।

হিরণ্ময় বসুমল্লিক। শুভ্র কেশ, তীক্ষ্ণ নাসা, আজো ঋজু দেহ—ডঃ বসুমল্লিক সত্যই সৌম্যদর্শন। জীবনের পঁচিশটা বৎসর জাকার্তায় কাটিয়ে এসেছেন। সংশ্লিষ্ট ছিলেন জাকার্তার সরকারী হাসপাতালের সাথে। প্রত্যক্ষ করেছেন, সাম্রাজ্যবাদীরা কী ভাবে শোষণ করছিল ইন্দোনেশিয়াকে, কেমন করে সেই শোষিত জনতা বিপ্লবী হয়ে উঠলো প্রেসিডেণ্ট সোয়াকর্নের নেতৃত্বে। তারপর স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ায় সোয়াকর্নের একটির পর একটি ভুল এবং তার ফলেই তাঁর পতন ও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টির অপমৃত্যু।

বাটাভিয়া প্রাসাদে সোয়াকর্নের আর স্থান নেই। প্রায় নির্বাসিত তিনি আজ। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টির আজ প্রায় অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। নীতির মারাত্মক ভুলে তারা আজ সখাত সলিলে। বিপ্লব কখনো চাপিয়ে দেয়া যায় না, আমদানী করা যায় না,—জনগণকে আগে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ও শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হয়। ক্রমাগত চীন থেকে উৎসাহ পেয়ে হঠাৎ বিপ্লব করতে গিয়েছিল ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। তাই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও দক্ষিণ পন্থী সামরিক বাহিনী তাদের নির্মম ভাবে পদতল পিষ্ট করেছে। কমিউনিস্টদের বিপ্লব গণ-বিপ্লবে পরিণত হতে পারলো না। প্রায় ছয় লক্ষ কমিউনিস্ট কর্মীকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হলো। আগামী দিনের বিপ্লবী জনতা এই দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারেন। বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবার আগেই আসরে নেমে পড়াটা আত্মহত্যার সামিল।

জেনারেল সুহার্ত সাম্যবাদীদের বিপ্লবকে জঙ্গী বুটে পেষণ করে

ক্ষমতায় আসীন। সোয়াকর্ন আজ একক, বিষণ্ণ, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কায় শঙ্কিত।

অথচ একদিন এই সোয়াকর্ন ইন্দোনেশীয় বিপ্লবী জনতাকে অপূর্ব নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ডঃ হিরণ্ময় বসু মল্লিকের দাবী, বিপ্লবের রূপরেখায় সেই ইতিহাসকেও স্থান দেয়া উচিত।

ইন্দোনেশিয়ার অতীত ইতিহাস বহ্নিমান আগ্নেয়গিরির মতো,—তার অগ্নিস্রাব সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। এক সময় এ দেশের আয়তন ছিল বিশাল—ফরমোসা থেকে মাদাগাস্কার পর্যন্ত দ্বীপগুলি ছিল তার। এখন অবশ্য এর বিস্তৃতি অনেক সীমাবদ্ধ—সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস ইত্যাদি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নিয়েই আধুনিক ইন্দোনেশিয়া। এখানকার লোকেরা তাদের জন্মভূমিকে গর্বের সাথে বলে রত্নদ্বীপ। পৃথিবীতে এমন সুন্দর ও ঐশ্বর্যশালী দ্বীপময় দেশ আর দ্বিতীয়টি নেই!

জাভাই ইন্দোনেশিয়ার প্রাণ কেন্দ্র। জাভাই দেশের অর্থ-নৈতিক মূল বনিয়াদ রচনা করে আছে। অবশ্য সুমাত্রার তৈল সম্ভারও উপেক্ষণীয় নয়।

বর্তমান শতকের চল্লিশ দশক অবধি ইন্দোনেশিয়ায় কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যা ছিল না। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান এখানে। বালি দ্বীপে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য। অন্য সমস্ত দ্বীপে ইসলাম ধর্মেরই প্রভাবই বেশী। ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় দশটি প্রাদেশিক ভাষা চালু আছে। তবে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে Laag Malieisch ভাষা।

জাভা দ্বীপই সবচেয়ে বিস্তৃত—জনবসতির ঘনত্ব এখানে সর্বাধিক [ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫২০·৬৩ জন ]। তারপরই বালি দ্বীপ। ডাচরা ইন্দোনেশিয়া অধিকার করে নেবার পর জাভাকে প্রায় একটি সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করে। এখানকার উৎপাদিত প্রচুর রবার, চিনি, সিংকোনা, পেট্রোলিয়াম, ম্যাংগানিজ ও

টিন নিয়ে ওলন্দাজরা বিশ্ব বাজারে বেশ আসর জমিয়ে বসেছিল। তার উপর আছে মসলা—এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গের শান্ত কুঞ্জ। এই মসলার লোভেই প্রথমে পর্তুগীজ ও পরে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ওলন্দাজরা এখানে আস্তানা গেড়ে বসে।

ইন্দোনেশিয়া তার জাতীয় আন্দোলনে সবচেয়ে বেশী প্রেরণা পেয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের কাছ থেকে। ভারতের গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথকে ইন্দোনেশীয় জনগণ শ্রদ্ধা করেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন বিপ্লবী ইন্দোনেশিয়ায় একটি 'শিক্ষা আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন জাভাতে। বর্তমান জাভার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র এটি। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সংগীত, নৃত্য-কলা চর্চা, সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষার আকর্ষণীয় বিদ্যাপীঠ এটি।

আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার গণ-বিপ্লবে একজন শিক্ষাব্রতীর নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। তিনি হলেন কী হাজদার। ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী তিনি প্রচার করতে থাকেন। ১৯১৩ সালে ডাচ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেন এবং তাঁকে ইন্দোনেশিয়া ত্যাগে বাধ্য করান। হাজদার হল্যাণ্ডে গিয়ে তাঁর কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁর আদর্শে সংগঠিত 'আমন শিষ্য'রা ইন্দোনেশিয়ার সংগ্রামে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ইন্দোনেশিয়ায় পরে লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে কী হাজদার এর শিক্ষামন্ত্রীর পদটি গ্রহণ করেন।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রাকৃতিক দান অফুরন্ত বলা চলে। বিশ্বের প্রয়োজনীয় মসলার বিরানব্বুই ভাগই সে যোগায়। সিংকোনা যোগায় শতকরা নব্বই ভাগ। অকসাইট এ্যালুমিনিয়াম ও লোহার ভাণ্ডারও অফুরন্ত। বিশ্বের শতকরা ৭৭ ভাগ ক্যাপক, ১৯ ভাগ চা, ২৯ ভাগ কোকো, ২০ ভাগ টিন, ৩১ ভাগ নারিকেল শাঁস, ৫ ভাগ চিনি ও ২৫ ভাগ পেট্রোলিয়মের যোগান দিচ্ছে এই দ্বীপময় দেশ।

কিন্তু এত সমৃদ্ধির রাজত্বে বাস করেও ইন্দোনেশিয়ার জনগণ কোনদিন প্রাচুর্য ও শান্তির সন্ধান পায় নি। ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শোষণ করেছে চূড়ান্ত, আবার সোয়াকর্নের খামখেয়ালিতে তারা বছরের পর বছর নিপীড়িত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণে ইন্দোনেশিয়ার জনগণের দুর্দশার অন্ত ছিল না। ডাচরা শ্রমিক ও চাষীদের দৈনিক মজুরী দিত তিন আনা থেকে ছয় আনা মাত্র। এমন নিম্নহারে মজুরি বিশ্বের আর কোথাও দেওয়া হয় কিনা জানা নেই। দেশের রাজস্বের শতকরা তিন ভাগেরও কম জাতির স্বাস্থ্যের জন্য ব্যায়িত হত। সাত কোটী লোকের জন্য পাঁচশ হাসপাতালে ছিল মাত্র তেষট্টি হাজার বেড। প্রতি ষোল হাজার ইন্দোনেশিয়ানদের জন্য থাকতেন একজন করে ডাক্তার। এখানে শিশু মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ২১ জন!

ওলন্দাজদের বেনিয়া নীতির শোষণ যন্ত্র মানবতাকে হত্যা করেছে ইন্দোনেশিয়ার মাটিতে। কোণঠাসা আইনের কবলে পড়ে পড়ে কেবলই মার খেয়েছে দেশের লোকেরা। সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর শান্তির ও প্রগতির বিরুদ্ধে চিরকাল চক্রান্ত করে এসেছে। সর্বত্র অর্থনৈতিক সাম্য ও রাজনৈতিক সমতার বিরুদ্ধে সে একটা প্রচণ্ড দুষ্টগ্রহ। বর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের নোংরামিতে সে ভরপুর; এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার বিরুদ্ধে তাদের অত্যাচার ও চক্রান্ত মানুষের ইতিহাসে কতকগুলি মসীলিপ্ত অধ্যায়।

কিন্তু আজকের যুগে এটা প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ ও দাম্ভিকতার অবসান ঘটবেই! কৃষ্ণ ও পীত মানব গোষ্ঠী শ্বেত দস্যুদের ক্ষমা করবে না!

এশিয়ার বুকে ইউরোপের ও আমেরিকার এতকাল প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন যে দুঃশাসন চলে এসেছে, তার দায়িত্ব সাম্রাজ্যবাদীরা অস্বীকার করতে পারবে না। এরভয়াবহ ফলশ্রুতির জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীন দেশের বিপ্লবী জনতা আজ

তাই ইউরোপীয় ও মার্কিন সততায় খুবই সংশয়ী। সাম্রাজ্যবাদীরাই যে দু' দুটো মহাযুদ্ধের জন্য দায়ী, এ কথা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কাজেই ওদের শান্তির মহড়া সম্পূর্ণ ভুয়ো বলেই মুক্তিকামী জনতার বিশ্বাস। রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজীতে তারা প্রত্যেকেই এক একটি হিটল্যার। ওদের তথা কথিত গণতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে ফ্র্যাংকেন্স্টাইনের আবির্ভাবের গুপ্ত বীজ। তাই সমাজতান্ত্রিক-শিবিরে ফাটল সংগ্রামী মানুষদের কাছে অভিশাপ বলে মনে হয়। যে সময় ক্ষুদ্র ভিয়েতনাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রক্তে স্নান করছে, যে সময় জাপ-মার্কিন চক্রান্তের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে নেমেছেন জাপানী ছাত্র সমাজ, যে সময় পুঁজিবাদী ভারতবর্ষেও জনতার দাবীতে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে সমাজতান্ত্রিক দলগুলি যূথবদ্ধ হতে শিখেছে, যে সময় বিশ্বের অধিকাংশ জনতা সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী, যে সময় সি আই. এ. এর চক্রান্তে মুক্তিকামী এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার একাধিক দেশ বিপন্ন, সে সময় সাম্যবাদীদের এই পারস্পরিক হানাহানি সত্যই ভয়াবহ। চিন্তার জগতে এঁরা কি কোন সমতল ভূমি খুঁজে পাচ্ছেন না? না কি এঁদের মধ্যে সেই ক্ষমতার লিপ্সা ও নেতৃত্বের লোভ গুলিয়ে গুলিয়ে উঠছে? তাই যদি হয়, তবে প্রকৃত সাম্যবাদী বিপ্লব আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নি বলেই ধরে নিতে হবে···।

ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ানদের সর্ববিধ আন্দোলনকে কণ্ঠরোধ করবার জন্য প্রথম থেকেই খুব সচেষ্ট ছিল। ডাচ গোয়েন্দা বিভাগ ছিল ব্যাপক ও সদা জাগ্রত। অবাধে গুলি চালানো ও গ্রেপ্তারের পূর্ণ অধিকার ছিল প্রতিটি ডাচ গোয়েন্দার। দেশ প্রেমিকদের তারা খুঁজে বেড়াতো বিভিন্ন সভা সমিতিতে, কারখানায়, লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে। যাকেই তারা অপরাধী মনে করতো, তাকেই হয় মৃত্যুদণ্ড না হয় নির্বাসন মাথা পেতে নিতে হতো। এর জন্য কোন বিচারের প্রয়োজন ছিল না।

আইনের কাছে কোন সমতা ও নিরপেক্ষতা প্রত্যাশা করা ছিল

বাতুলতা মাত্র। ইউরোপীয়ানদের জন্য এক রকম আইন, আর সাধারণ ইন্দোনেশিয়ানদের জন্য অন্য রকম আইন চালু ছিল।

ইন্দোনেশিয়ার বন্দী শিবির স্থাপিত হয়েছিল নিউগিনির ডেলো নদীর উজান মুখে তানামারায় ও তানাদিতে। এদের ব্যবস্থা Concentration camp এর চাইতেও ভয়াবহ। বাস্তিলের মতো তারা বীভৎস। এখানে যে সমস্ত রাজনৈতিক বীরেরা বন্দী হতেন, তাঁরা প্রায় আর ফিরে আসতেন না। হয় পাগল হয়ে যেতেন, না হয় দুরারোগ্য ব্যাধিতে চির জন্মের মতো প্রাণ শক্তি হারাতেন। এই দুটি বন্দী শিবিরের দুর্দশা দেখে সোয়েকর্ন চোখের জল ধরে রাখতে পারেন নি একসময়। আবেগে বলে উঠেছিলেন, 'এমন শাসনে বেঁচে থাকার চাইতে নরকে যাওয়া ভালো।'

এই তো হলো সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন অভিপ্রকাশ।

সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি আমলাতন্ত্র ও ধনতন্ত্র পাশাপাশি চলেছে। স্বল্প সংখ্যক তথা কথিত শিক্ষিত নরনারী শাসক বর্গের সাথে বিভীষণী সম্প্রীতি স্থাপন করে আরামে বিলাসে দিন কাটাচ্ছেন। আর দেশের কোটি কোটি সর্বহারার দল প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত।

এমন দুর্দশাগ্রস্ত ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম মুক্তির কথা শোনালেন একজন অবসর ভোগী সরকারী ডাক্তার,—ডঃ সুটোমো। ডঃ সুটোমো স্বপ্ন দেখালেন, ইন্দোনেশিয়া একদিন স্বাধীন হবে! কিন্তু সেই স্বাধীনতার যোদ্ধারা এখনো তৈরী হয় নি। আগে অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে জাতীয় চেতনাকে শাণিয়ে নিতে হবে। এই শাণিত গণমানস তখন সহজেই স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে।

ডঃ সুটোমোর নেতৃত্বেই ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম গণজাগরণের সূত্রপাত। প্রতিষ্ঠিত হলো ১৯০৮ সালে প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন —'Boedi Octomo'। বোয়েডী অটোমো রাজনৈতিক ভূমিকায় অনেকটা ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের মতো। কংগ্রেসেরই মতো

এর প্রারম্ভিক দায়িত্ব ছিল, মধ্যবিত্তদের হয়ে বক্তব্য রাখা। এই দল দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রচলনের দাবী জানায়।

১৯১০ সালে গঠিত হলো আর একটি রাজনৈতিক দল,—শারেকাত-ই-ইসলাম [ Sarekat-i-Islam ]। চরিত্রে এই দলটি ভারতীয় মুসলীম লীগের সাথে তুলনীয়। দেশাত্মবোধ ও ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা—এই ছিল তাদের শ্লোগান।

ডাচ সরকার দুটি দলেরই কর্মীদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করেন। ডাচদের অত্যাচার যত বেড়ে যায়, মুক্তিকামীদের আন্দোলন ততোই জোরদার হয়ে ওঠে।

এমন সময় এলো রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সেই বিপ্লবের ঢেউ এসে নতুন স্পন্দন তুলে যায় ইন্দোনেশিয়ার পিছিয়ে পড়া অবরুদ্ধ মানুষগুলির প্রাণে।

১৯১৭ সালে শারেকাত-ই-ইসলাম সর্বপ্রথম সাহস ভরে ঘোষণা করলো: "আমরা ডাচদের শৃঙ্খল চূর্ণ করতে চাই। চাই আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা!"

শ্রমিক সংগঠনগুলিও ক্রমশ সংঘবদ্ধ হতে থাকে। মার্কসবাদে দীক্ষিত হয় হাজার হাজার নর-নারী। যুগকে ধরতে পেরে তারা সংগ্রামমুখী হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। বিদেশী শোষণের প্রধান স্থান চিনির কারখানা গুলিতে ধর্মঘট চলতে থাকে দিনের পর দিন।

১৯২০ সালের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ শ্রমিকরা সাম্রাজ্যবাদকে আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। সাম্রাজ্য-বাদীরাও দিনের পর দিন এই আন্দোলন দমনে শ্বাপদের মতো খল ও হিংস্র হয়ে ওঠে। শ্রমিক নেতাদের ধরে ধরে প্রচণ্ড মার দেওয়া হয়—মারের চোটে চিরজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যায়, গুলিতে প্রাণ দিলে কত, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলো হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষ! মিটিং, শোভাযাত্রা ও পিকেটিং-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হলো।

১৯২৬ সালের নভেম্বরে জাভা ও সুমত্রার অধিবাসীরা সমস্ত বিদেশী দ্রব্য বয়কট করে সাম্রাজ্যবাদীদের আর এক দফা আঘাত হানে। নিউগিনির কুখ্যাত জেলগুলিতে আর তিল ধারনের স্থান রইলো না। আরো নতুন বন্দী শিবির গড়তে হলো বিপ্লবীদের আটকে রাখবার জন্য। মৃত্যুদণ্ডও হয়ে গেল কয়েকজন শহীদের।

সারা দেশ জুড়ে চলেছে খণ্ডযুদ্ধ ও একটানা ধর্মঘট। কমিউনিষ্টরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে বিপ্লবের বাণী প্রচার করে ফিরছে। ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপে দ্বীপে চললো গরিলা যুদ্ধ।

১৯২৭ সাল এর সংগ্রামী দিনগুলিতে ইন্দোনেশিয়ায় আর একটি রাজনৈতিক দল জন্ম নিলো। নাম 'জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশিয়া সংসদ'। এঁর নেতা রূপে আবির্ভূত হলেন দু'জন শিক্ষিত তরুণ—ডঃ সোয়াকর্ন ও মহম্মদ হাতা। এই দু'জনের উপর বিষদৃষ্টিতে তাকালো ডাচরা—দু'জনকেই নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হলো। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে বিপ্লবী সোয়াকর্নকে দূরে সরিয়ে রাখা ডাচ সরকারকে ক্ষমতা ছিল না। সোয়াকর্নকে বলা হতো 'জাভারি গান্ধী।' তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতায় বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ যেন বার বার বিচ্ছুরিত হয়েছে। ঘন ঘন কারারুদ্ধ করা হয় তাঁকে, অকথ্য অত্যাচার চলে তাঁর শরীরের উপর। কিন্তু ইস্পাতের মতো অনমনীয় সোয়াকর্ন—অসাধারণ কর্মশক্তি ও প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা ইন্দোনেশিয়ার শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন তিনি। ডঃ মহম্মদ হাতা ছিলেন তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ইন্দোনেশিয়ার অপর বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে ডঃ আমীর সরি-ফুদ্দিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডঃ আমীর সরিফুদ্দিন ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য এবং তিনি সর্বহারাদের বিপ্লবী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

এই সমস্ত নেতাদের আবির্ভাবে দেশের গণদেবতা জেগে উঠলেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের আজাদী সংগ্রাম নতুন যুগের সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যলগ্নে ইন্দোনেশিয়া আর এক বীভৎস অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। পার্লহারবারকে খতম করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দিকে তার ধারালো নখ বসাতে এগিয়ে এলো জাপানী সাম্রাজ্যবাদ। ডাচদের এমন ক্ষমতা ছিল না যে, জাপানীদের হাত থেকে তাদের সাধের সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে।

ইন্দোনেশিয়ার বুকে দাঁত বসালো জাপ সাম্রাজ্যবাদীরা। চরিত্রে তারা ওলন্দাজদের চেয়েও বর্বর। শুরু হলো ব্যাপক হত্যা, ষড়যন্ত্র, আত্মসমর্পণ, নারী-ধর্ষণ, লুণ্ঠন ইত্যাদি সমস্ত নারকীয় কার্যকলাপ।

জাপানী দস্যুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন কমিউনিষ্ট নেতা ডঃ আমীব সরিফুদ্দিন। জাপানী শিবিরের উপর চোরা-গোপ্তা আক্রমণের জন্য তিনি একটি গরিলা বাহিনী গঠন করলেন। দুঃসাহসিক সমস্ত অভিযানে বিব্রত করে রাখলেন জাপানীদের। কিন্তু ইতিহাসের দুর্ভাগ্য, ১৯৪৩ সালে জাপানীরা তাকে ও তাঁর চুয়ান্ন জন সংগীকে ধরে ফেলে। অমানুষিক অত্যাচার হয় আমীর সরিফুদ্দিনের দেহ ও মনের উপর। কুখ্যাত জাপানী শাস্তি 'জল চিকিৎসাও' চালানো হয় তাঁর উপর। ১৯৪৫ সালের ১লা অক্টোবর যখন তিনি ছাড়া পেলেন, তখন তাঁর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, একটানা অত্যাচারের সাক্ষী তার ক্ষত বিক্ষত দেহ!

জাপানীদের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ানদের সাহসিকতায় উদ্ভাসিত বিপ্লবকে দেখে London Times মন্তব্য করে, "ইন্দোনেশিয়া একজনও কুইসলিংয়ের জন্ম দেয় নি!"

তারপর ১৯৫৫ সালে হিরোশিমা ও নাগাসিকাতে এ্যাটম বোমা ফাটলো। মানব সভ্যতা লজ্জায় মুখ ঢাকলো। কেঁদে উঠলো আগামী বংশধরের দল। রুধিরাপ্লুত জাপান হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ে,—আর উঠে দাঁড়াবার শক্তি তার নেই!

আনন্দে উল্লাসে উদ্দাম হয়ে উঠলো ইন্দোনেশিয়া।

তার দুই শত্রু ডাচ ও জাপানীরা আজ সরে দাঁড়িয়েছে। এই স্বাধীনতা ঘোষণার স্ুবর্ণ সুযোগ।

জাকর্তায় স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হলো।

স্বাধীনতার পতাকা উড়লো প্রতিটি উঁচু প্রাকারে, ঘোষিত হলো, "ইন্দোনেশিয়ায় সরকার জনগণের স্বাধীন সরকার।"

"স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতির জন্মগত অধিকার! পর রাষ্ট্রের অধীনতা মানেই মানবতাকে বিসর্জন দেওয়া। এই পরাধীনতা দূর করতেই হবে!"

কিন্তু সংগ্রামের তখনো অনেক বাকি।

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে সেখানে ডাচদের কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠায় এবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। বৃটিশ ও ডাচ সৈন্যরা নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে স্বাধীনতার আক্রান্ত যোদ্ধাদের! ডঃ সোয়াকর্ন তাঁর তীক্ষ্ণ ভাষণে সাম্রাজ্যবাদের এই কলংকিত চরিত্র তুলে ধরেন সমগ্র বিশ্বের সামনে।

বৃটিশের এই নোংরা অভিযানে পরিচালিত হয়েছিল হাজার হাজার গুর্খা, জাপানী ও ডাচ সৈন্যরা।

কিন্তু গরিলা বাহিনীর আশ্চর্য গণ-যুদ্ধে প্রতিহত হলো সেই সম্রাজ্যবাদী অভিযান। ইন্দোনেশিয়ানরা একটির পর একটি ঘাঁটি অধিকার করে নেয়,—বৃটিশ সেনাদের পর্যুদস্ত করে একটির পর একটি দ্বীপ তারা আবার অধিকার করে নেয়।

এই ভাবে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আজাদী ইন্দোনেশিয়ার জন্ম হয়েছে। প্রেসিডেন্ট সোয়াকর্ন দীপ্ত ভঙ্গিমায় সাম্রাজ্যবাদীদের জানিয়ে দিলেন :

"হামলাবাজী করতে এলে চূড়ান্ত মার খেয়ে যাবে তোমরা! আমাদের প্রতিরোধ শক্তির কোন সীমা নেই!…"

আজ এই গৌরবময় ইতিহাসের সাথে বর্তমানের তুলনা করলে বেদনাহত হতে হয়। বিপ্লবী ইন্দোনেশিয়াকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে

পারেন নি প্রেসিডেন্ট সোয়ার্কর্ন। ক্ষমতার আসনে বসেই আস্তে আস্তে মরচে ধরিয়েছেন তাঁর এতকালের সংগ্রামী চেতনাতে। বিলাসে-নারীতে মেতে উঠেছেন মধ্যযুগীয় কোন উচ্ছৃঙ্খল রাজার মতোই। ইন্দোনেশিয়ান জনগণের মুখের দিকে তাকান নি! সেই অপরাধ ইতিহাস ক্ষমা করবে কেন?

ভুল করেছে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিও। দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ব্যাপকতা না বুঝেই হঠাৎ বিপ্লবের নেশায় মেতে উঠতে গিয়েছিল তারা। সি. আই. এর কার্যকলাপ, দক্ষিণ পন্থীদের শক্তি, জনগণের অজ্ঞানতা,—এ সমস্ত সম্পর্কে যথাযথ চিন্তা না করেই বিপ্লব আমদানী করতে গিয়েছিল তারা। তাই এই ভুলের খেসারৎ দিতে হলো অতি মর্মান্তিক ভাবে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কমিউনিষ্ট পার্টির অপমৃত্যু ঘটলো, ছ'লক্ষের উপর কমিউনিষ্ট সদস্য প্রাণ হারালো জঙ্গী দাপটের মুখে। বিশ্ব-সাম্যবাদী আন্দোলনে এত বড় সর্বনাশ সামলে উঠতে বহু বৎসর সময় লাগবে। যারা ক্ষেত্র প্রস্তুত না রেখেই টাটকা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন, ইন্দোনেশিয়া থেকে তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

## ॥ চৌদ্দ ॥

ক্ষিপ্র ও বেগচঞ্চল বিকাশের যুগ দ্রুত এগিয়ে চলেছে, ধরতে পারছি না অনেক সময়। তীব্র সংঘাতের মুখে পড়ে হকচকিয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারছি না তাতে কোন্ সৃষ্টির গান লেখা আছে!

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বত্রই আমূল রূপান্তর ঘটছে, সামান্য ভুল করলেই বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবো। এমন এক সন্ধিক্ষণ বিংশ শতাব্দী। চিন্তায় মরচে ধরলে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার রূপ কখনো দৃষ্টিতে ধরা দেবে না। এমন এক শঙ্কাকুল ভাবনায় দুলতে দুলতে বিপ্লবের রূপরেখা আঁকতে বসছি আমি।

বিপ্লব ও বৈপ্লবিক চরিত্রগুলি আঁকতে গিয়ে ১৯২১ সালের সেই বুদ্ধি দীপ্ত মানুষটিকে মনে পড়ে যাচ্ছে। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার Freedom Houseএ একটি আন্তর্জাতিক সভায় একজন বক্তা জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সকলকে চমকে দিয়েছিলেন। সুপুরুষ, দীর্ঘকায় বক্তার আবেগের অনুরণন বহুক্ষণ আমাদের মনে দোলা দিয়ে যাচ্ছিলো।

বক্তৃতার সমাপ্তিতে সকলের মনে এক প্রশ্ন: উনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? বিশ্ব রাজনীতিতে ওঁর ভূমিকা কী? ভারতবর্ষের প্রতি ওঁর এই মমত্বের কারণ?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়েছিলেম এর কয়েক মাসের মধ্যেই। উনি ছিলেন বিপ্লবী পেরুর বিপ্লবী নায়ক ভিক্টর হায়া দে লা তোরে। সেদিন Freedom Houseএ বসে চিনতে পারেনি, কয়েক মাস বাদে তাঁরই পরিচয় পেলাম বিভিন্ন সংবাদ পত্রের শিরোনামায়।

পেরুভিয়েনদের সবচেয়ে প্রিয় নেতা হায়া তোরে বারাবরই

ভারতবর্ষকে তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছেন। একাধিকবার তিনি কলকাতায় এসে সাধারণের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন।

১৯২৭ সাল।

পেরুর সরকার খুঁজে বেড়াচ্ছেন ভিক্টর হায়া দে লা তোরে কে। তোরেও গা ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করছেন স্থান থেকে স্থানান্তরে। ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত হলেন বাংলা তথা বিশ্বের অন্যতম চিন্তানায়ক এম. এন. রায়ের কাছে। এম. এন. রায়ের কাছেই হায়া তোরে রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করেন। এর বহু বৎসর পর আবার একবার বার্লিনে গুরু শিষ্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এম. এন. রায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় হায়া তোরে ভারতবর্ষকেও ভালবেসে ফেলেছেন।

হায়া তোরে পেরুতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত যোদ্ধা!

কিন্তু মার্কসবাদের অন্ধ অনুরাগী তিনি নন। তাঁকে সমাজতন্ত্রী বলা যায়, কিন্তু পুরা কমিউনিষ্ট বলা যায় না।

১৯৩১ সালে নির্বাচনে হায়া তোরে গণভোটে পেরুর প্রেসিডেন্ট রূপে নির্বাচিত হন। কিন্তু দক্ষিণ পন্থীরা অত সহজে একজন সমাজতান্ত্রিকের হাতে দেশকে তুলে দিতে রাজি হলো না। ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাবে প্রভাবিত পেরুর সেনাদল কোন দিনই এই লোকটিকে সহ্য করতে পারে না। তাই ক্ষমতায় বসবার আগেই হায়া তোরে দেখলেন, তিনি শত্রুদের দ্বারা অবরুদ্ধ। জঙ্গী নায়করা তাঁর ঘরের সমস্ত আসবাব পত্র তছ নছ করে দেন। তারপর শিকল দিয়ে বেধে টানতে টানতে নিয়ে চললেন পেরুর সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতাকে। এই বর্বরচিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রতিটি সংবেদন শীল ও প্রগতিবাদী মানুষ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। রোমা রোঁলা, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ একে বিশ্ব সভ্যতার এক গ্লানি বলে চিহ্নিত করেছেন।

হায়া তোরে সম্রাজ্যবাদের প্রথম শ্রেণীর শত্রু। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের 'Pan American' মতবাদকে তিনি ঘৃণা করেন। জনগণের

প্রতি তাঁর আস্থা গভীর ; তাই গণ সমর্থনের জোরেই গদিতে বসতে চান, বেয়নেটের হুমকি দিয়ে নয়। তাই কিউবার নেতা কাস্ত্রোর সঙ্গে তাঁর মতের অমিল অনেক।

হায়া তোরে উন্নত দক্ষিণ-আমেরিকার স্বপ্ন দেখেন। জাগ্রত জনগণ সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত হবে। সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি ও শিল্পে নতুন যুগ আসবে। বিদেশী মূলধন লগ্নী হবে বটে, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে একমাত্র দেশের সরকারের। এত কালের অবহেলিত, অত্যাচারিত ও দরিদ্র পেরুবাসীকে তিনি অর্থনৈতিক দাসত্বের হাত থেকে মুক্তির পথে পরিচালিত করবেন।

'মনরো নীতি' কে হায়া তোরে সম্রাজ্যবাদের মার্কিন ভাষ্য বলে মনে করবেন। পানামা খালকে তিনি শুধু মাত্র মার্কিন কর্তৃত্বে রাখবার ঘোরে বিরোধী। ঐ খালে সম-অধিকার দিতে হবে দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিটি দেশের। দক্ষিণ-আমেরিকার বিচ্ছিন্ন দেশ গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী ফেডারেশন তৈরী করতে চান হায়া তোরে।

মার্কিন সরকার তোরেকে তাই সহ্য করতে পারেন না।

দেশের সেনাবাহিনীও হায়া তোরের কর্তৃত্বে থাকতে রাজি নয়। যতবার তোরে নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন, ততোবারই সেনাবাহিনী বন্দুক উঁচিয়ে ধেয়ে এসেছে। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বহুবার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়েছে তোরের পার্টি "আপরা"র সাথে পেরুর দক্ষিণ পন্থী সেনাবাহিনীর। কত হাজার হাজার লোক যে এ পর্যন্ত এই সমস্ত রাজনৈতিক দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। হায়া তোরের বহু সমর্থককে দেশ ত্যাগ করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে আত্মরক্ষার তাগিদে। বহু সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী বছরের পর বছর প্রবাসী থেকেছেন।

১৯৫০ সালে সেনাবাহিনীর গুপ্তঘাতকের দল তোরেকে হত্যা করবার জন্য ব্যাপক অভিযানে নেমে পড়ে। বিপন্ন তোরে তখন

বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন লিমার কলম্বিয়া দূতাবাসে। আসলে মার্কিন দুষ্টচক্র কিছুতেই হায়া তোরের মতো একজন মানুষকে পেরুর শাসনভার গ্রহণ করতে দেবে না।

নৌ-সেনাদের বিদ্রোহী হতে উস্কানি দেবার অভিযোগে তোরের 'আপারা' পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচনে বার বার জয়লাভ করেও তোরে তাই এখনো ক্ষমতায় বসতে পারেন নি। আশ্চর্য ঝঞ্ঝাময় জীবন পেরুর এই বিপ্লবীর। বছরের পর বছর তাঁকে শুধু আত্মগোপন করেই থাকতে হচ্ছে। শুধু নিজের দেশেই যে তাঁর ঠাঁই নেই তা নয়, তাঁকে বিতাড়িত করা হয়েছে পানামা, গুয়াতেমালা, সুইজারল্যাণ্ড থেকেও। অধ্যাপক লাস্কির অর্থ-নীতিতে কৃতি ছাত্র তিনি। ২৫ বছর বয়স থেকেই তাঁর এই দুর্দ্ধর্ষ রাজনৈতিক জীবনীর শুরু। আজো ইস্পাতের মতো অনমনীয়, হায়া তোরে,—জনগণের উপর তাঁর আস্থা গভীর। তিনি বিশ্বাস করেন, দক্ষিণ আমেরিকার গণ-মুক্তি একদিন ঘটবেই!

## ॥ পনেরো ॥

মহান অক্টোবর বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা এর আগে আমরা আলোচনা করেছি। এখন আমাদের পর্যালোচনা করে দেখা উচিত, সেই মহান বিপ্লব কী ফলশ্রুতি রেখে গেলো সোভিয়েট রাশিয়ার বুকে ?

'মানুষের কল্যাণ ও আনন্দের জন্যই সবকিছু'—রুশ সরকার এই নীতিকে বাস্তবায়িত করেছেন বললে, অন্যায় হবে না। রাশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রগতিও কিন্তু অতীত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। 'নবীন সমাজমাত্রকে নতুন করে তার সংস্কৃতি গড়তে বা একেবারে শূন্য থেকে শুরু করতে হয় না, বরং পূর্ববর্তী সমাজ গুলিতে যে সব যথার্থ সাংস্কৃতিক সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তারই সে উত্তরাধিকারী এবং তারই সাহায্য সে গ্রহণ করে, অতীতের কীর্তিগুলিকে সে যাচাই ও বিকশিত করে তোলে নিজের মতো করে, তার নবোদ্ভূত সামাজিক স্বার্থ অনুযায়ী !'*১৯

সত্যদ্রষ্টা মার্কিন সাংবাদিক জন গ্রান্থারের রচনাতে রাশিয়ার বিস্ময়কর প্রগতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অক্টোবর বিপ্লব যখন জয়লাভ করেছিল, তখন রাশিয়াতে অতি মুষ্টিমেয় শিল্পী ও বিজ্ঞানী ছিলেন। বিপ্লবীদের না ছিল প্রাগঢ় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, না ছিল ব্যাপক সংস্কৃতি মূলক দৃষ্টিভঙ্গী,—নতুন সামাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলবার মতো কোন অভিজ্ঞতাই তাদের ছিল না।

সেই প্রাথমিক স্তরে বোগদানভের মতো কোন কোন পেটি বুর্জোয়া তাত্বিক বোঝাতে চেষ্টা করলেন, এখন সর্বহারাদের নিজেদের মতো ক'রে গড়ে নিতে হবে—সমস্ত পূর্ববর্তী সংস্কৃতিকে বর্জন করতেই হবে, কারণ সে সংস্কৃতি শোষক শ্রেণীর তৈরী।

ভি আই. লেনিন কিন্তু অন্য মত পোষণ করেন। তাঁর মতে

---

সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও নব ব্যক্তিত্বগঠনের শিক্ষা—এম. আইয়োভচুক।*১৯

সংস্কৃতির মূল্যায়নে কঠোর হলে চলবে না। পর্যুদস্ত বুর্জোয়ারা এমন সমস্ত মূল্যবান ও প্রগতিশীল উপাদান রেখে গেছেন, যাকে গ্রহণ না করলে সাম্যবাদীরাও ইতিহাসে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবেন না।

"রাষ্ট্র শক্তি আমরা গড়তে পারব না যদি বুদ্ধিজীবী সমাজের মতো ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে আমরা কাজে না লাগাতে পারি।" [ লেনিন রচনা সংগ্রহ, ৩৭শ খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা ]।

কাজেই আত্মিক জীবনের সুশিক্ষিত নবরূপায়নে সোভিয়েট রাশিয়া যদি বুর্জোয়াদের কিছু ভালো অবদানকেও কাজে লাগাতে চায়, তবে তাকে অমন গালাগাল দেবার কী আছে? মার্কসইজম্ তো আর একটা আবদ্ধ জলাশয়ের মতো নয়! বরং সে নদীর মতো গতিশীল ও প্রয়োজন অনুসারে দিক পরিবর্তন কারী। কাজেই মতান্ধতাতে ভুগলে বিপ্লবেরই পরিপন্থী হয়ে যেতে হয়, বিপ্লবের সার্বিক ফলশ্রুতি থেকে সর্বসাধারণকে বিচ্যুত করা হবে সেখানে।

তবে খেয়াল রাখতে হবে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাংস্কৃতিক বিপ্লব গোড়ার থেকেই যেন সমাজতান্ত্রিক চরিত্র বজায় রাখতে পারে! এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আসল লক্ষ্য হবে, জাতীয় জীবনে শোষক-দের আধিপত্য দূরীকরণ, অসাম্য ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিলুপ্তি করণ, সর্ব সাধারণকে সর্ববিধ কুসংস্কার থেকে মুক্ত রাখা এবং এক যৌথ সমাজের আদর্শে তাদের শিক্ষিত করে তোলা।

সশস্ত্র প্রতিবিপ্লব ও বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার কালেই বিপ্লবী রাশিয়া তার সাংস্কৃতিক অভিযানও শুরু করে দিয়েছিল। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণী ব্যবস্থার বিলোপ, গ্রন্থাগার, ছাপাখানা, মিউজিয়ম, থিয়েটার ইত্যাদি সমস্তই জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া,—প্রভৃতি গঠন মূলক কাজে লেনিনের তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল।

বিপ্লবউত্তর বিশাল সোভিয়েট রাশিয়ার তো সমস্যার অন্ত ছিল

না। পঞ্চাশ বছর আগে জনশিক্ষার মানে সোভিয়েট রাশিয়ার স্থান ছিল সর্ব নিম্নে। অবশ্য বড় বড় লেখক ও দার্শনিকের অভাব ছিল না। লামোনসভ, টলস্তয়, পবলভ, গোর্কি, চেখভ, পুস্কিন প্রভৃতির আক্লান্ত লেখনী জাতিগঠনে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের অক্ষর জ্ঞান ও সংস্কৃতির বোধ কম থাকায় তারা সেই সমস্ত রচনা দ্বারা পরিপুর্ণ প্রভাবিত হতে পারে নি। দেশের তিন-চতুর্থাংশ মানুষই ছিল নিরক্ষর। পঞ্চাশটিরও বেশি উপজাতির কোন নিজস্ব লিখিত ভাষা ছিল না।

কাজেই সংস্কৃতির অবগাহনে জাতিকে বিশুদ্ধ করবার কাজটি ছিল অত্যন্ত দুরূহ। প্রচণ্ড অর্থনৈতিক ও টেকনিকাল অনগ্রসরতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রয়োজন ছিল অসীম ধৈর্য, সঠিক পথে পদচারণা ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থ-নীতিকে পুনর্গঠিত করা।

ভাবতে আশ্চর্য বোধহয়, কী ভাবে বিপ্লবী রাশিয়া সেই কবন্ধ যুগের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে!

আজকের রাশিয়ার সমস্ত মানুষই অক্ষর জ্ঞানের অধিকারী। ১৯৬০ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে ছাপা বইয়েয় সংখ্যাই হল একশত চব্বিশ কোটি—উননব্বুইটি ভাষায় রচিত। দেশে সিনেমা হলের সংখ্যা বর্তমানে এক লক্ষ তিন হাজার।

মহাকাশ বিষয়ক গবেষণা, ও বিজ্ঞানের সর্ববিভাগে সোভিয়েট কীর্তি আজ বিশ্বজন স্বীকৃত। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিটি উপজাতি আজ নিজেদের অতীত সংস্কৃতির মূল ধারাকে বজায় রেখেই সমুন্নত। প্রতিটি ভাষা শিল্প ও সাহিত্যের উপযোগী এবং প্রতিটি ভাষাতেই বিজ্ঞান চর্চা হয় সেখানে,—'পরিভাষা'র সমস্যা মোটেই দেখা দেয় নি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাব ঘটেছে প্রধানত শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্য থেকেই। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এটাও একটি মস্ত সাফল্য।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বুদ্ধিজীবীরা বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল, জ্ঞান এবং উৎপাদনের অভিজ্ঞতাকে একচেটে করে রাখেন না,—সে-সব তাঁরা বিলিয়ে দেন শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে।

মানসিক শ্রম যাঁরা করেন এবং কায়িক পরিশ্রম যাঁরা করেন,—তাঁদের উভয়ের মধ্যে আয়ের তেমন তফাৎ এ দেশে নেই। উভয়েই সমমর্যাদার অধিকারী। কাজেই ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার মানসিক চাপ এদেশের শ্রমজীবী মানুষদের ওপর নেই। নিজ নিজ কাজে তারা ভেতর থেকেই আনন্দ ও উৎসাহ পায়। যাঁরা বলে থাকেন, সমাজতান্ত্রিক দেশে শ্রমজীবী মানুষ ক্রমশ কলের পুতুলে পরিণত হয়, সোভিয়েট দেশ তাঁদের বক্তব্যের মূর্ত প্রতিবাদ! শ্রমিকদের জীবনে যথেষ্ট বিশ্রাম, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে; অনেকে আবার আসর জমান বিবিধ গঠন মূলক কাজেই,—হয়তো নিজেদের ট্রেড ইউনিয়নে কিছুক্ষণ স্বেচ্ছায় কাজ করে আসেন!

রাশিয়ার প্রতিটি বৃহদায়তন কারখানা শুধু টেকনিকাল অগ্রগতির নয়, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিরও প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক বৃহৎ কারখানাতেই রয়েছে গণনাট্য, থিয়েটার, অপেরা ও ব্যালে স্টেজ, চিত্র শিল্পের সুসজ্জিত স্টুডিও, সৌখীন ফিল্ম স্টুডিও, সিমফনিক অর্কেষ্ট্রা, সিনেমা হল ইত্যাদি।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে জীবনের আনন্দকে পরিপূর্ণ উপভোগের সুযোগ পাচ্ছেন রুশ শ্রমিকরা। মানসিক অবসাদ তাদের আসে না, সুগঠিত স্বাস্থ্যে কর্ম-উজ্জ্বল তাদের জীবন!

দৈহিকের সঙ্গে মানষিক শ্রমকে মেলাতে পারলে মানুষের ব্যক্তিত্ব অনেক প্রখর হয়ে ওঠে, তাঁর কর্মক্ষমতা বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। রুশ জনগণ এই সম্পদের অধিকারী।

সামাজিক ভোগ তহবিল [ Social Consumption Funds ] গঠন করে রাশিয়ায় সাধারণ মেহনতী মানুষরাই আজকাল বহু অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বোর্ডিং ও অনেক শিশু রক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে।

পাশ্চাত্য দেশের বুর্জোয়া লেখকরা প্রায়ই বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র শুধু রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও প্রযুক্ত বিদ্যাকেই পুনর্গঠিত করতে পারে কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে তা বাধা দেয়। অথচ, আসল ঘটনা তার ঠিক উল্টো। মানুষের ব্যক্তিত্বকে পেষণ করে কখনো কোন দেশ সার্থক প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে নি। নীতিবোধহীন, চেতনাহীন মানুষ কি কখনো প্রযুক্ত বিদ্যায় চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করতে পারে? বরং পুঁজিবাদী দেশে শ্রম আবশ্যিক ও প্রাণান্তদের! কোন শ্রমজীবী মানুষই এখানে শোষণের বাইরে নয়। ক্রমাগত মানসিক ও আর্থিক চাপে সে বিভ্রান্ত, তার ব্যক্তিত্বকে পদে পদে লাঞ্ছিত করা হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশে শ্রমজীবীমানুষরাই তো সমস্ত ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ কর্তা। শ্রম দানকে তারা মনে করে সম্মানের ব্যাপার, জাতিকে সমৃদ্ধ করার পবিত্র কর্তব্য! সেখানে ব্যক্তিত্বহানীর কোন প্রশ্নই উঠে না।

বিপ্লবস্নাত দেশগুলি সম্পর্কে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি যাই রটাক না কেন, আসল সত্য কখনো চাপা থাকে না। আমরা জানি, 'হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ সোভিয়েট তরুণ-তরুণী বড় বড় শহর, সুবিন্যস্ত বাসস্থান, পারিবারিক স্বচ্ছন্দ্য ছেড়ে কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বানে দেশের উত্তর ও পূর্ব দিকের বিরল বসতি অঞ্চল, অহল্যা ভূমি ও নতুন প্রকল্পগুলিতে গিয়েছে শিল্প কারখানা গড়তে বা কৃষির প্রসার ঘটাতে।'

আর আমরা সে সময় ধনতান্ত্রিক দেশ গুলির অনুকরণে শোষণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দিনের পর দিন শক্তিশালী করে তুলছি। উপর তলার লোকেরা Capital Express এ চাপছেন, নিয়ন শোভিত সোফায় দেহ এলিয়ে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন আর নীচে সার সার এগিয়ে চলেছে বুভুক্ষের দল,—পেট সার, রুগ্ন, স্বপ্ন প্রিয় জাতি। সত্যিকারের সমাজতন্ত্র কি এখনো কয়েক যুগ বা কয়েক শতাব্দী দূরে?

## ॥ ষোল ॥

পেতলের মতো পীতবর্ণের আকাশ। প্রচণ্ড রৌদ্রের দাবদাহ!

এখন যাবো কোথায় বেড়াতে? এটা কি বেড়াবার সময়? কিন্তু হাতে যে অখণ্ড অবসর। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি। দীর্ঘ এক মাসের ছুটি। ইচ্ছা আছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলির অর্গলে আবার ঘা মেরে দেখবো। হয়তো ওদের কারুর কাছ থেকে সাড়া পেয়ে যেতে পারি।

মনে পড়ছে, সেই স্কুল জীবনে প্রায়ই অমন পীতবর্ণের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। উদাস মনে তখন একটি মাত্র স্বপ্নের আলপনা! কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে গেলে হয় না? মধুপুর, তোপচাচি, দীঘা এমন কি দুর্গাপুরকেও ভাবতে পারতাম না। আরো কাছে—পাণ্ডুয়া, মুরারীপুর অথবা শক্তিগড়। কাছে পিঠের স্থান—এক বেলায় এক চক্কর খেয়ে চুপচাপ আবার ফিরে আসা। সাধারণ পরিকল্পনা। স্বল্পায়াসে তবু এর উষ্ণতাটুকু রোজ রোজ স্বপ্নের মত জ্বল জ্বল করছিল। এই শহরে প্রাত্যাহিকতা বড় এক ঘেয়ে, বাড়ীতে বড়দের ব্যবহার নিতান্ত কর্কশ, রাস্তা ঘাটে বাধার বিকট প্রাচীর! এর হাত থেকে একটু পরিত্রাণ চাই।

ছোট বেলাকার সেই স্বপ্নালু দিনগুলিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি আজ।...কিন্তু স্মৃতি তাড়া করে ফেরে। মনে পড়ে যায়, ফ্রান্সের কথা। প্রবাসী জীবনে সেই মধুর সামুদ্রিক ঝড়ো হাওয়া।

সামুদ্রিক বেলাভূমিতে গা হাত পা এলিয়ে বসে ছিলাম আমরা দু'জনে। তুলো ও আমি।

সামনেই সমুদ্র।

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছি। সেই মুহূর্তে হতাশায় কেমন যেন ভেঙ্গে পড়েছে তুলো। আপন মনে জপ করছে ফাউষ্টের বেদনাতুর সংলাপ ঃ

"Comfort and quiet—no, no, none of these for me,—I ask them not, I seek them not."

ভাবলেষ হীন অবয়ব ওর। পিছনের পৃথিবীর রঙটা যে ঠিক তখন কি তা আমরা জানবার চেষ্টা করতাম না। ঢেউ দেখছি আর গুণছি। এক, দুই, তিন···ষাট সত্তর। দিন কেটে যাচ্ছে নদীর তির্যক গতিতে। আর আমরা যেন সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে উন্মুখ।

দাঁতে দাঁত চাপ দিলো তুলো। বোধ হয় ওর গ্লানীময় অতীতটাকে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসায় গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে। সমুদ্রের ফেনিল অধরে থুথু ছিটিয়ে বলে উঠলো, "লোকটাকে আর একবার দেখা পেলে আমি খুন করে ফেলবো। কুত্তা! ডালকুত্তা লেলিয়ে দেবো ওর পিছনে! উঃ!···।"

সাত বছর আগের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা আজো তাড়িয়ে বেড়ায় তুলোকে। তার উঠতি যৌবনকে বিষাক্ত করে গেছে সেই ভণ্ড মার্কিন প্রেমিক।···অন্ধকারে ওর পাশে অসহায়ের মতো বসেছিলো কিশোরী তুলো। হ্যাঁ, ওর স্কার্ট সামলে বসেছিল ট্যাক্সির ভিতর। বিরাট ট্যাক্সি। হঠাৎ বৃষ্টি এলো ঝাপিয়ে। ভিতরের লাইটটা নিভিয়ে দিলো আমেরিকান। মুখের চুরুটটাই শুধু রক্ত চক্ষুর মতো দগ দগ করছে। বাকিটা অন্ধকার। ভয়ানক অন্ধকার। ঝম ঝম ঝম ঝম সেই ঐক্যতানে আচ্ছন্ন তুলোকে সহজেই আকর্ষণ করেছে লোকটা। তুলো বুঝতে পারছিল, ওর স্কার্টের নীচে সাঁপের মতো কী যেন একটা ক্রমশই এগিয়ে আসছে। গ্রীক ভাস্কর্যের অনুপম

খাঁজ সেই মুহূর্তে আত্মসমর্পণের অসহায়তায় হিমেল ও নিথর হয়ে এসেছে। ঠোঁট চেপে গুমরে উঠেছিল হয়তো তুলো। কিন্তু ততোক্ষণে উর্ধ্বাঙ্গ-নাম্নাঙ্গ-হাঁটু-জানু—জঙ্ঘা—দুটি দেহের সমাধি ঘটেছে!...

তুলোর সেই ইতিহাস দেশে ফিরেও মাঝে মাঝে চিন্তা করি। প্রথমে প্রেমের সেই অপমান সে আজও ভুলতে পারে নি। কখনও পারবেওনা।

কোন উচ্চপদস্থ মার্কিন যুবককে দেখলেই ঘৃণায় তার ঠোঁট দুটো বেঁকে আসে। দাঁত চেপে আমায় বলে, "সেন।' দেখে নিও একদিন ওদের দেশেই বিপ্লব হবে!...ওদের দেশের সাধারণ লোকেরাই এমন বেয়াদপি সহ্য করবে না!"

তুলোর অনেক টুকরো টুকরো মন্তব্যের সঙ্গে এই কথাটিও মনে পড়ে। আমি ওর প্রতিটি কথায় তাৎপর্য খুজে পাই। নিজের অভিজ্ঞতা ও পড়াশুনা থেকে লব্ধ ওর দৃষ্টি ভঙ্গীকে আমি শ্রদ্ধা করি।

আর সত্যি তো! সমাজতান্ত্রিক মানুষগুলিকে খতম করবার জন্য পেন্টাগনদের প্রস্তুতির অভাব নেই। সামরিক বেড়াজালে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম—চারদিক ঘিরে বসে আছে।

সারা বিশ্ব জুড়ে চলেছে মার্কিন সামরিক মহড়া। যেখানেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগ্নেয়গিরি উত্তপ্ত লভা উদগীরণ করতে উন্মুখ, সেখানেই পেন্টাগনদের ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রস্তুতি।

স্পেনে আজো ফ্যাসিজমের রাজত্ব চলেছে। হিটলার-মুসলিনী চক্রের অন্যতম নায়ক জেনারেল ফ্রাঙ্কো এখনো সেখানে ক্ষমতায় আসীন। রাইফেলের মুখে গণতন্ত্রকে ধর্ষণ করে তাঁর আবির্ভাব। আজো সেই রাইফেলের দাপটেই জনগণের কণ্ঠরোধ করে আছেন।

ফ্যাসিষ্ট ফ্রাঙ্কোর বারুদকে তাজা রাখবার দায়িত্ব নিয়েছেন মার্কিন সরকার। যতদিন স্পেনের বুকে ফ্রাঙ্কোর অবস্থান টিকিয়ে রাখা যায়, ততোদিনই মার্কিন সরকার নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারেন। স্পেনের বুকে তাই সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে পঁচিশ হাজার আমেরিকান সৈন্য। রোথা, তোরেজন, মোরানা, সারাগোসা প্রভৃতি স্থানে গড়ে উঠছে সুরক্ষিত মার্কিন ঘাঁটি। কোটি কোটি ডলার ব্যয়িত হচ্ছে এই সমস্ত ঘাঁটিগুলোকে মজবুত রাখবার কাজে। জিব্রাল্টরের উপর নিজের শ্যেন দৃষ্টি মেলে ধরেছে পেণ্টাগনেরা। স্পেনের আকাশে অনবরত মার্কিন পারমাণবিক বোমারু বিমানগুলি চক্কর খাচ্ছে। মার্কিন ষষ্ঠ বিমান বহরের প্রধান ঘাঁটি হলো স্পেন। স্পেনীয় জনসাধারণ কিন্তু এমন মার্কিন প্রভুত্বকে সুনজরে দেখে না। তাদের স্বাতন্ত্র্য বোধে ঘা লাগে। অবরুদ্ধ আক্রোশে তাদের নিয়ত প্রার্থনা 'ফ্রাঙ্কো নিপাত যাও! মার্কিন সৈন্য ফিরে যাও!'...

এই সমস্ত দক্ষিণ ইটালী, সিসিল, উত্তর আফ্রিকা, এই সমস্ত অঞ্চল নিয়েও পেণ্টাগনদের মাথা ব্যথার অন্ত নেই! গণ বিদ্রোহের বীজ বপন করা আছে ওখানে। ইটালীতে তো কমিউনিস্টদের প্রাধান্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। গ্যারিবল্ডি ও ম্যাৎসিনির দেশের লোকেরা চির দিনই প্রগতিবাদী। তাই ইদানীং ভূমধ্যসাগরে তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর। ষষ্ঠ নৌবহরে আছে পঁচিশ হাজার নৌ সেনা সহ পঞ্চাশটি যুদ্ধ জাহাজ। ডজন ডজন সাবমেরিণ, ডেষ্ট্রয়ার, ক্রুজার, বিমানবাহী জাহাজ নয়া-সাম্রাজ্যবাদের অহমিকাকে প্রচার করে।

আর ভিয়েতনামকে খতম করবার জন্য মার্কিন সপ্তম নৌবহর তো আপ্রাণ চেষ্টা করেই চলেছে। একশত পঁচাত্তরটি জাহাজ পঁচাত্তর হাজার মার্কিন সেনাকে নিয়ে মহড়া দিচ্ছে প্রশান্ত মহা-সাগরে। এই নৌবহরের সাতশত বিমান ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গিয়ে

বর্বর আক্রমণ চালাচ্ছে উত্তর ভিয়েতনামের উপর। পরমাণবিক বিমানবাহী 'এণ্টার প্রাইজ' এবং পরমাণবিক ক্রুজার 'লঙ বীচ' ক্ষণে ক্ষণে নিজেদের বিধ্বংসী ক্ষমতাকে জানাতে ছুটে আসে।

উত্তর কোরিয়ার উপর হাড়ে হাড়ে চটা পেণ্টাগন-প্রভুরা। কোরিয়া যুদ্ধের ঘা তার কোনদিন শুকোবে বলে মনে হয় না। তাই আক্রোশে মাঝে মাঝে কোরিয়ার দরিয়ায় মার্কিন জাহাজগুলো এসে পড়ে। প্রভুরা গুপ্তচর বৃত্তি চালাতে যায়। কিন্তু ধরাও পড়ে যায়। আর তাই নিয়ে ক্লেচ্ছা কেলেঙ্কারির অন্ত থাকে না। টঙকিঙ উপসাগরে অনবরত তিনটি মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রায় ছায়ার সাথে লড়াইয়ের মহড়া চালাচ্ছে তারা।

জাপানের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ মার্কিন সরকারের কাছে বড় যন্ত্রণাদায়ক! জাপ প্রতিরক্ষায় তাই তাঁর থাবা ক্রমশই দৃঢ়তর হচ্ছে। জাপ নৌবহর তো প্রায় মার্কিন কর্তৃত্বেই রয়েছে বলা চলে! এর একাশিটি ডেস্ট্রয়ার, পাঁচটি সাবমেরিণ ও কয়েকটি বিমানবাহী জাহাজ মার্কিন অঙ্গুলি হেলনের দিকে তাকিয়ে আছে।

জাপানের ওকিনাওয়াতে মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য রাখছে দূর প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘটনাবলীর প্রতি!

ল্যাটিন আমেরিকা পেণ্টাগনদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে বহুদিন। ফিদেল ক্যাস্ত্রো, চে গুয়েভারা, হায়া তোরে,—এঁরা বড্ড ভাবান White Houseকে। তাই মার্কিন সরকার তাঁর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সৈনিকদের নিয়ে গঠিত 'গ্রীন বেরেটস'কে নিযুক্ত রেখেছেন ল্যাটিন আমেরিকার সমস্ত স্ফুলিঙ্গগুলিকে নিভিয়ে দেবার জন্য! এই গ্রীন বেরেটসই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সমাজতান্ত্রিক কিউবাকে হত্যা করবার জন্য! এই গ্রীনবেরেটসই দমন করেছিল ডোমিনিকান রিপাব-

লিকের মুক্তি সংগ্রামকে, মুক্তি কর্মী জনতাকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল পানামা, ভেনেজুয়েলা, চিলি, পেরু, গুয়েতেমালা প্রভৃতি দেশে।

এত প্রস্তুতি!

তবু স্বস্তি নেই!

ঘুম নেই পেন্টাগনদের চোখে। বিক্ষোভের তরঙ্গ ফুলে উঠছে তার নিজের দেশেই! কোটি কোটি ডলার ব্যয়িক হচ্ছে চক্র ও চক্রান্তের ধারা অটুট রাখতে। প্রতি বছর বাজেটের উপর তাই চাপ এসে পড়েছে খুব। জাতীয় অর্থনীতির সমগ্র ভিত্তিটাই সবেগে নড়ে উঠছে সময় সময়। ভারসাম্যের অভাবে দুলতে থাকে White House, নিত্য নতুন করের বোঝা মাথায় নিয়ে মার্কিন নাগরিকরা আর কয়েক বৎসর পর সোজা হয়ে চলতে পারবে কিনা সন্দেহ! বিশ্বব্যাপী এই জঙ্গীনীতির বিরুদ্ধে তাই প্রচণ্ড গণ বিক্ষোভের ঝড় বইছে বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

বাইরের ঝড় আছড়ে পড়ছে মার্কিন সেনেটে। সেনেটরে-সেনেটরে ভয়ানক তর্কা তর্কি, হাতাহাতির উপক্রম। সেনেটর জে ডব্লিউ ফুলব্রাইট উত্তেজনায় ফেটে পড়েছিলেন। তার চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছেন মার্কিন গণতন্ত্রের ভয়াবহ পরিণতি! বিশ্বের উন্নতিকামী দেশগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র আর আগের মতো সাহায্য করতে পারছে না কেন? অথচ, কেন এত করভার? বর্ণাদ্বেষী দাঙ্গা-হাঙ্গামার নগ্ন রূপ আমেরিকায় এত প্রকট কেন? সেনেটর ফুলব্রাইট উত্তর দিলেন, "...মার্কিন সরকার তাঁর সু-নীতি গুলিকে বিসর্জন দিয়ে শুধুই যুদ্ধের নেশায় মেতে উঠেছেন। যদি এ দেশের জনগণের উপর এত বেশী সমরিকীকরণ চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে এ দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করা হবে। দেশ এগিয়ে যাবে একনায়ক তন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের দিকে।..."

ফুলব্রাইটের বক্তৃতায় প্রকৃত সত্য ফুটে উঠেছে।

আইসেন হাওয়ার এবং জনসন নির্দিষ্ট পথে বর্তমান প্রেসিডেণ্ট নিক্সনও তাঁর নীতি পরিচালনা করলে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন গণতন্ত্র ভূমিশয্যা নেবে। জঙ্গীতন্ত্রের অত্যাচারে শুরু হবে তার রক্ত বমন। সাদা কালোর দাঙ্গা আরো জমাট বাঁধবে। এব্রাহাম লিঙ্কনের আত্মা লজ্জায় মুখ লুকাবে আড়ালে !···

বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে এত ভাবনার তরঙ্গগুলো মাথার কোষে কোষে এসে হানা দেয়। থাকি বর্ধমানের প্রায় এক গ্রামাঞ্চলে। দিনে নানা জাতের পাখিদের কাকলি, রাতে শিয়ালের ডাক। এ পাশে দামোদর নদ,—ধূ ধূ বালুচর। আর ওপাশে ধানের ক্ষেত, —সবুজে সবুজ। মাঝে এক চিলতে নদীর মতো ইডেন খাল,— আপন সঙ্গীতে মগ্ন। ভাবলাম, দিন সাতেকের জন্য রাজধানীতে যাবো। দিল্লী!

ক'লকাতা থেকে দিল্লী।

দূরত্বটা কম নয়। কিন্তু রাজধানী এক্সপ্রেস [ Capital Express ] সেই দীর্ঘপথের গ্লানীকে বুঝতেই দেয় না। যে কোন উন্নত দেশের যাত্রাবাহী ট্রেনের সাথে এটি তুলনীয়। সকাল-সন্ধ্যার আহার্য খারাপ নয়। তোফা আনন্দে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীকে দেখতে দেখতে উড়ে গেলাম হাওড়া থেকে দিল্লী !···

দিল্লী। নয়া দিল্লী। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র। রাজা-উজির, পাত্র-মিত্র সভাসদ,—সবার ব্যাপক সমাবেশ এখানে। ট্যাঙ্গা ওয়ালাদের পয়সা আদায়ের বিচিত্র কৌশল। রাস্তায় শুধু চলমান সাইকেলের মিছিল। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বুড়ি প্রত্যেকেই দু'চাকার উপর ভর দিয়ে ছুটে চলেছে। পা দুটো উঠছে আর নামছে।

দিল্লীতে আমার থাকবার জায়গার অভাব নেই। চাঁদনি চকে ডাক্তার রায় আমার মামা। ভাগনাকে পেয়ে খুশীর অন্ত নেই।' পসার ভালোই। ঝকমকে ফিয়েটখানা তাঁর কৌলীন্যের পরিচয় দেয়।

"হ্যালো ইয়াং ম্যান···দিল্লীতে তুমি কাদের দেখতে চাও? উপর তলার মানুষদের দেখবে না, পুরাতন দিল্লীতে ইতিহাস খুঁজবে?"

মামা হেসে জিজ্ঞাসা করলেন।

মাথা চুলকে উত্তর দিলাম আজ্ঞে, "দুটোই! দু'তরফকেই জানতে চাই।···"

মামা আবার হাসলেন। পিঠ চাপড়ে দিলেন।

রাতে ছাদের উপর একা উঠে এলাম। অদ্ভুত কর্মব্যস্ত দিল্লী নগরী। মনে হয় যেন কোন জলপ্রপাতের শব্দ শুনছি। মাথার উপর গর্জন তুলে অতিকায় বিমানগুলি আসছে যাচ্ছে। পালাম বিমান বন্দর সর্বদাই ব্যস্ত। যখন তখন টেলিপ্রিণ্টারে ফ্লাশ মেসেজ আসছে। হয়তো ভ্যাটিকান থেকে আসছেন পোপ পল, করাচি থেকে এসে পৌঁছলেন একদল নদী-বিশেষজ্ঞ, আসতে পারেন আফগানিস্থানের আমীর অথবা, প্রেসিডেণ্ট নাসেরের ব্যক্তিগত বার্তাবাহক! এঁদেব গুরুত্ব অনুযায়ী অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা। নামী-দামী লোক হলে বিমান-বন্দর লোকে লোকারণ্য। প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী—প্রত্যেকের মুখে মাপা মাপা হাসি। মাপা কদমে তাঁরা এগিয়ে যান সম্মানিত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে। জনতা থেকে থেকে চীৎকার দেয়। প্রয়োজন বোধে ফুল ছড়ায়, পায়রাও ওড়ায়। ব্যাণ্ড বাজে। পতাকা ওড়ে। উভয় দেশের জাতীয় সঙ্গীত ইথারে অনুরণন তোলে।··· এর পর আছে ভোজসভা। চাপরাশী, বেয়ারা, আর্দালী থেকে আরম্ভ করে চিফ্ সেক্রেটারী পর্যন্ত সকলের মহা ব্যস্ততা! মুখে বিগলিত হাসি, তবে মাপা।

কূটনৈতিক জগতে এ সমস্ত ছবিগুলো খুব পরিচিত। সাংবাদিক নই। হতে পারলে আরো নিখুঁত ছবি তুলে ধরতে পারতাম। তবে দিল্লীতে এসে বুঝতে পারছি, এখানকার আবহাওয়াটা বড় থম থমে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সারা কপালে চিন্তার কুঞ্চন। সমস্যা! ছোট-বড় সমস্যার অন্ত নেই। এককালে কৃষ্ণ মেননকে বম্বে থেকে সরিয়ে দিয়ে যারা দক্ষিণপন্থীদের বাহবা কুড়িয়ে ছিল, সেই শিব সেনার দল পিছন থেকে কী ছুরিটাই না মারলে। বম্বেতে ওদের তাণ্ডব-নর্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছে। তারপর আছে তেলেঙ্গানা আন্দোলন। আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দ্রুত ছুটে গেছেন সেখানে প্রজ্বলিত ব্রহ্মাকে শান্ত করতে কিন্তু তাঁকে শান্ত করা গেল না বরং দিন দিন বিস্তারিত হয়ে চলেছেন সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে এমনই এক অস্থিরতা! এরই মধ্য একটা ছবি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তা হচ্ছে পতন্মুখ কংগ্রেসের। কংগ্রেসের পচন শুরু হয়েছে বহু দিনই। কিন্তু দেহটি বিরাট হওয়ায় বুঝতে একটু দেরী হয়েছে আমাদের। ভারতের রাজনীতিতে এখন ছুটো পরস্পর বিরোধী স্রোত বইছে। একদিকে রয়েছেন পুরোপুরি ধনতন্ত্রবাদী দক্ষিণপন্থী লোকেরা। এবং অপরদিকে রয়েছেন সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা! এই ছুই ধরণের মানুষই রয়েছেন কংগ্রেসে। তাঁদের মধ্যকার বিবাদ দিনের পর দিন তীব্রতর হ'য়ে উঠছে। আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর এই বিবাদের ফলশ্রুতি সহজেই অনুমেয়।

কুইনস্‌ওয়েতে পায়চারি করছি। আজকাল এর নাম 'জনপথ'। সাহেবদের বিদায়ের সাথে সাথে নামের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু কর্মের পরিবর্তনটুকু বোঝা দায়। গলফ মাঠে এখনো শ্বেতাঙ্গদের দেখা মেলে। 'বার' গুলিতে জন-সমাগম কম হয় না। বোতল গ্লাসের ঠুং ঠুং শব্দ। ক্ল্যারিওনেটের বিলাপ।......আর কিছুটা এগিয়েই পার্লামেণ্ট। ডাঙ্গেকে দেখা গেল সেণ্ট্রাল হলের কফির

মজলিশে। ছোট খাটো চেহারা। পাতলুন আর পাঞ্জাবী তাঁর পোশাক। কিন্তু ঐ লোকটির আক্রমণ ভীমরুলের হুলের মত প্রায়ই বিদ্ধ করে কংগ্রেস সেবীদের।

পার্লামেণ্ট হাউসকে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। ফোয়ারার জল তির তিরিয়ে উঠছে। আবার নামছে। বাংলা দেশের কিন্তু আর মোটেই আস্থা নেই এই পার্লামেণ্টের রথী-মহারথীদের উপর। বাংলা দেশের মানুষ কোনদিনই দিল্লীর কাছ থেকে সহানুভূতি পায় নি। কোন দিন নয়। ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে থেকেই এই অবিচার। ওঁরা অপমান করেছিলেন বাংলার দুলাল সুভাষ চন্দ্রকে। অঙ্গছেদ করেছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা বাংলামাকে। দাঙ্গা, মহামারি, বন্যা, বৈষয়িক উন্নতির প্রয়াস,—কোন কিছুতেই দিল্লী বাংলার প্রতি তার কর্তব্য পালন করে নি। এর পরিণতিই তাই ঘটতে শুরু করেছে। বাংলার পেলব মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ছে কংগ্রেস। পিঠের শিরদাঁড়াটি একেবারে Compound Facture হয়ে গেছে আবার সেরে ওঠা ভয়ানক শক্ত।

বাংলা দেশ নেতৃত্ব না দিলে আধুনিক সুশিক্ষিত স্বাধীন ভারত-বর্ষের পত্তন হতো না! আবার বাংলা দেশ আজ যে পথে চলেছে, কাল সমগ্র ভারতবর্ষ সেই পথ ধরবেই। দিল্লীর তাবৎ নেতারা এ কথাটা এটুকু মনে রাখবেন!

নয়া দিল্লীর মুখর এলাকাকে পায়ে পায়ে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি নীরব দিল্লীর দিকে। হঠাৎ চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো লাল কেল্লা।

লালকেল্লা!

আমার বুক কেঁপে উঠলো। কপাল থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে টপ টপ ঘাম। বিশ্ব অঙ্গনে বিপ্লবের ইতিকথা আঁকবার চেষ্টা করছি আমি। লিখেছি রেনেসাঁস, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, চৈনিক

বিপ্লব, দিকে দিকে বিপ্লবের ধূমায়িত প্রস্তুতি। কিন্তু আমার দেশের সিপাহী-বিদ্রোহকে তো স্থান দেই নি। ১৮৫৭ সালের সেই মহা বিদ্রোহকে ঐতিহাসিকরা অনেকেই হয়তো স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিপ্রকাশ বলে স্বীকার করতে রাজি হবেন না। কিন্তু এর ব্যাপকতা, এর সংগঠনী ক্ষমতা এবং এর সামগ্রিক রূপরেখায় বৈপ্লবিক চরিত্রকে অস্বীকার করা যায় না। চীনের তাইপিং যুদ্ধ ও বক্সার বিদ্রোহ যদি বিপ্লবের ইতিহাসে স্থান পেতে পারে, ভারতবর্ষের সিপাহী যুদ্ধ কেন পাবে না? কার্লমার্কস্ পর্যন্ত এর বৈপ্লবিক অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন।

বিদ্রোহের কারণ?

প্রথম জবাব হলো, চর্বি মাখানো কার্তুজ। গরু ও শুকরের চর্বি মাখানো কার্তুজ। গরু হিন্দুদের কাছে দেবতা। আর শুকর মুসলমানদের কাছে অস্পৃশ্য। কাজেই হিন্দু-মুসলমান দু'ধরণের সিপাহীদেরই ধর্মবোধে প্রচণ্ড ঘা লাগলো। মানুষ সব ত্যাগ করতে পারে, পারে না ধর্ম। ধর্মের সম্মানেই ইংরাজ নিধনে নেমে পড়লো ভারতীয় সিপাহীরা।

কিন্তু না।

মূল কারণ আরো গভীরে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক— সর্বত্র রন্ধ্রে রন্ধ্রে সিপাহীদের গুমোট বাঁধা অভিযোগ লুকিয়ে ছিল। তাদের তলোয়ারের জোরেই ইংরাজদের এতবড় সম্রাজ্য। মুষ্টিমেয় সাহেবরা তাদের পরিচালনা করেছেন। আর তারা তলোয়ার ঘুরিয়েছে, কামান দেগেছে, কাতারে কাতারে প্রাণ দিয়েছে। গড়ে তুলেছে ইংরাজ সাম্রাজ্যের বনিয়াদকে। তাঁদের শাণিত আক্রমণেই রেণু রেণু হ'য়ে মিশে গেল বিশাল মারাঠা সাম্রাজ্য। সিন্ধিয়া, ভোঁসলে, পেশওয়া—সকলের যুগ ফুরিয়ে গেল। ভারতীয় সিপাহীদের তলোয়ারকে ভয় পেয়েই গলায় লোহার শিকল পরলেন হায়দ্রা-

বাদের নিজাম! শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে প্রাণ দিলেন মহিসুরের শ্রেষ্ঠ সন্তান টীপু সুলতান। ক্ষমতাচ্যুত হলেন রাজা দলীপ সিং ও রাণী ঝিন্দন কৌড়। ইংরাজদের পতাকা উড়লো নেপালে, তিব্বতে, সিকিমে, ভূটানে। উড়লো বিজিত ব্রহ্মদেশেও। পূর্ব পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, সর্বত্র ইউনিয়ন জ্যাক পত পত করে উড়তে থাকে।

বৃটিশ সম্রাজ্যবাদকে ভারতের মাটিতে তুঙ্গীতে পৌঁছে দিল ভারতীয় সিপাহীরাই।

কিন্তু প্রতিদানে তারা পেলো অবহেলা, ঘৃণা এবং নিষ্ঠুর দারিদ্র্য। সাহেবদের তুলনায় তাদের বেতন কত কম! চাকুরিতে উন্নতির আশা নেই। এক কবন্ধ বলয়ে তারা শোষিত, নিপীড়িত। এরপর আছে গভর্নর জেনারেল স্যার জর্জ বার্লোর [ ১৮০৬ সাল ] নিত্য নতুন ফতোয়া। লোকটা তাদের সংস্কারে, ধর্মবোধে পর্যন্ত হাত দিতে চায়।

বার্লো সাহেব বললেন, দেশী সিপাহীদের আরো বেশী কেতা-দুরস্ত হওয়া দরকার। অনেক ভারতীয় সিপাহী সখের দাড়ি ও গোঁফ রাখতো। বার্লোর মনে হলো, এমন এক মুখ দাড়ি থাকলে কাউকে ঠিক স্মার্ট মনে হয় না। বার্লো বললেন, বেশী বড় দাড়ি রাখা চলবে না। দাড়ির বিস্তৃতি হবে সীমাবদ্ধ এবং তা থাকবে এক টুকুরো সুন্দর চামড়া দিয়ে মোড়া।

হিন্দু-মুসলমান—দু'ধরণের সিপাহীরাই বিরক্ত হলো। দাড়ির দিকে এত নজর কেন বাপু? আর ও সব চামড়ার টুকরো লাগাবারই বা উদ্দেশ্য কি? এতেও কি গরুর ও শুকরের চর্বি মাখানো আছে নাকি? গুঞ্জন হতে থাকে সিপাহীদের ব্যারাকে ব্যারাকে। ওরা বিরক্ত, চিন্তিত!

প্রেসিডেন্সীতে সিপাহীরা প্রথম রুখে দাঁড়ালো। সামান্য সংখ্যক সিপাহী রুখে দাঁড়ালো তাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের বিরুদ্ধে। কিন্তু কর্ণেল গিলেসপি সহজেই দমন করলেন তাদের। বার্লো বললেন,

সিপাহীদের এই ভঙ্গুর বিদ্রোহ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। টিপু সুলতানের ছেলেকে ওরা ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছিল। কিন্তু আসলে ভারতীয় সিপাহীদের মানসিকতা ইংরাজ শাসকরা ধরতে পারেন নি।

এরপর আঠারো বৎসর কেটে যায়।

১৮২৪ সালে ইংরাজ সৈন্যরা সঙ্গীণ উঁচিয়ে ছুটলো বার্মিজদের আক্রমণ করতে। এক রক্তাক্ত যুদ্ধের পর আসাম থেকে বার্মিজদের হটিয়ে দেওয়া হলো। তারপর সেখান থেকে চললো রেঙ্গুন—পর্যন্ত দীর্ঘ অভিযান। হাজার হাজার ভারতীয় সিপাহী বার্মার দুর্গম বন পথ ধরে অগ্রসর হয়।

ব্রহ্মদেশ যাবার পথ দুটো। একটা হচ্ছে হাঁটা পথ আসাম ও আরাকানের মধ্য দিয়ে। অপর পথটা জল পথ,—দক্ষিণ ভারতীয় যে কোন বন্দর কিংবা পূর্ব বাংলার নদী পথ ধরে পৌঁছে যাওয়া যায় বর্মার উপকূলে। বাংলার সিপাহীরা স্থল পথেই আরাকান ও আসামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললো ব্রহ্ম দেশের উদ্দেশ্যে। কিন্তু গোল বাধলো দক্ষিণ ভারতীয় সিপাহীদের নিয়ে। সমুদ্রপথ ধরে ব্রহ্মদেশে যেতে তারা রাজি নয়। জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত হবার ভয় তাদের। কালাপানি পার হয়ে বিদেশে কিছুতেই যাবে না তারা!

এ সময় একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেল ব্যারাকপুরে সেনা নিবাসে। সাতচল্লিশ তম রেজিমেণ্টকে হুকুম দেওয়া হলো চট্টগ্রাম হয়ে জলপথে বর্মামুল্লুক অভিযান চালাতে কিন্তু সিপাহীরা কিছুতেই কালাপানি পার হতে রাজি হলো না। চকুরি যায়, যাক। তবু কিছুতেই তারা ধর্ম খোয়াতে পারবে না।

কমাণ্ডার-ইন্-চিফ্ স্যার এডওয়ার্ড প্যাগেট সিপাহীদের সিদ্ধান্ত শুনে রাগে দাঁত কড়মড় করতে থাকেন। হুকুম না মানাই বিশৃঙ্খলা। এবং যুদ্ধের সময় সমস্ত রকম বিশৃঙ্খলাকে কঠোর হাতে দমন করাই উচিত। ভারতীয় সিপাহীদের ধর্মীয় ম্যানিয়াকে তিনি বন্দুকের গুলিতে পরিষ্কার করে দিতে চাইলেন!

সেনাপতি এডওয়ার্ড প্যাগেট স্বয়ং একদল ইউরোপীয় সেনা স
অতর্কিত চড়াও হলেন ব্যারাকপুরে ভারতীয় সিপাহীদের শিবিরে
সিপাহীরা ছিল নিরস্ত্র, অপ্রস্তুত। মারমুখী প্রধান সেনাপতিকে
দেখে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। প্যাগেট গুলির হুকুম দিলেন।
ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে বিদ্ধ হয় সিপাহীদের বুকে। ওদের রক্তাক্ত
বিশাল দেহগুলি লুটিয়ে পড়ে চারধারে। ব্যারাকপুরের সেনা
শিবিরে রক্তের বান ডাকে। সাতচল্লিশতম রেজিমেণ্টকে খতম করে
বীরদর্পে বাইরে বেরিয়ে এলেন প্যাগেট। দেখলেন, বাইরে প্রচণ্ড
উত্তাপ। এক খণ্ড ঘূর্ণি ঝড় পাক খেতে খেতে ছুটে আসছে। সেই
ঝড়ের প্রচণ্ডতা এত দূর থেকে অনুমান করা যায় না। প্যাগেটও
অনুমান করতে পারলেন না, কী ঘূর্ণির মুখে তিনি ঠেলে দিলেন
তাঁদের সাধের ভারত-সাম্রাজ্যকে !

আরো পাঁচ বৎসর পর।

ইংরাজ শাসন ভারতীয় কুসংস্কার দূর করতে উদ্যত হয়েছে।
আইন করে নিষিদ্ধ হয়েছে সতীদাহ প্রথা। সমাজের সর্বস্তরের
মানুষের সাথে হিন্দু সিপাহীরাও ইংরাজদের অভিপ্রায়ে ভীত ও
সংঘবদ্ধ। সন্দেহের দোলায় দোল খাচ্ছে মুসলীম সিপাহীরাও।
আজ হিন্দুদের ধর্মবোধে ঘা লাগছে, কাল তো তাদের মসজিদেও
বাইবেল-বিশ্বাসীদের হাত পড়তে পারে !

বিখ্যাত ভারতীয় সিপাহী সর্দার বাহাদুর হেদায়েৎ আলি গভর্ণর
জেনারেলের কাছে এক দীর্ঘ চিঠিতে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন,
ভারতীয় সিপাহীদের অসন্তোষের কারণ।

হেদায়েৎ সাহেব লিখেছেন, "…কাবুল অভিযানে গিয়ে সবচেয়ে
বিপদে পড়েছিল হিন্দু সৈনিকরা। আফগানিস্তান মুসলীমদের দেশ।
হিন্দুদের সেখানে খাবার সংগ্রহ করতে হতো মুসলীমদের কাছ
থেকেই।…অনেক হিন্দু সৈনিককে কাবলীরা হঠাৎ পাকড়াও করে
ধর্মান্তরিত করবার চেষ্টা করেছে। সেই সমস্ত হতভাগ্য হিন্দু

সিপাহীরা দেশে ফিরে এসে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে। সমাজ তাদের গ্রহণ করে নি। পরিবারে পায় ঘৃণা। সবদিক দিয়ে তারা বিচ্ছিন্ন। তারা একক।…*২১

হিন্দু সুবেদার সীতারাম লিখেছেন, "সিন্ধু নদ পাড়ি দিয়ে আফগানিস্থান যেতে হবে। প্রতিটি হিন্দু সিপাহীর তাই বুক ভরা জমাট অশ্রু। ভয়ও কম নয়। কারণ, অনেকেরই ধারণা এই যুদ্ধে ইংরাজদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।…হিন্দুদের ধারণা সিন্ধু নদ হিন্দুস্তানের বাইরে। কাজেই এটা পাড়ি দেবার অর্থই ধর্মচ্যুতি, জাতিচ্যুতি। তাই যাত্রার প্রারম্ভেই বহু অনিচ্ছুক সিপাহীর চাকুরি গেলো। অনেকে গেলো পালিয়ে।…"*২১

কাবুলে ইংরাজদের ঘটেছিল ভয়ানক বিপর্যয়।

আফগানদের অতর্কিত আক্রমণে হাজার হাজার সিপাহী প্রাণ দিলো। যারা বন্দী হলো তাদের উপর চললো অমানুষিক অত্যাচার। অনেককে ক্রীতদাস রূপে চালান দেওয়া হলো মধ্য প্রাচ্যের মুসলীম দেশগুলিতে। ধর্ম গেলো, মান গেলো, প্রাণ গেলো। সিপাহীদের সঞ্চিত ভাণ্ডারে আবো বারুদ এসে জমা পড়লো।

আফগান যুদ্ধ সিপাহীদের শিক্ষা দিলো, ইংরাজদের হয়ে লড়াই করাটা মোটেই সম্মানজনক নয়। আর যুদ্ধে ইংরাজদেরও পরাজয় ঘটতে পারে। পরাজয়ের অভিজ্ঞতা যে কত মর্মান্তিক আফগানিস্তান প্রত্যাগত উদ্‌ভ্রান্ত সিপাহীরাই তার প্রমাণ।

ধর্মীয় ব্যাপারে বৃটিশ হস্তক্ষেপ ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছে। ক্যাথলিকদের ব্যাপক ধর্ম প্রচার রাজানুগ্রহে ক্রমশ বিস্তারিত। হিন্দুদের অনেক প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলিকে সরকারী কর্তৃত্বে

---

**From Sepoy to Subadar./Colonel Norgate *২১**

আনা হচ্ছে। এমন কি পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরও সরকারী রক্ষণাবেক্ষণে আনা হলো। স্কুলে, হাসপাতালে, কারাগারে, বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে মিশনারীদের প্রভাব সিপাহীদের কাছে আতঙ্ক-জনক। ভারতের ধর্মীয় সূর্য বুঝি অস্তাচলে গেল। স্যার সৈয়দ আহম্মদ বললেন, "It has been commonly believed that Government appointed missionaries and maintained them at its own cost" মিশনারীরা তো সরকারেরই চর! ভারতবাসীদের খৃষ্টান বানাতে চান ইংরাজ সরকার!

১৮৫৫ সালে সিপাহীদের হাতে প্রথম ইংরাজের রক্তপাত ঘটলো। কর্ণেল কোলিন ম্যাকেঞ্জি সাহেব হুকুম দিয়েছিলেন, হায়দ্রাবাদে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোন রকম মিছিল বা গান বাজনা চলবে না। অথচ, আদেশের দিনটিতেই মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ উৎসব মহরম অনুষ্ঠিত হবার কথা। কর্ণেল ম্যাকেঞ্জির হুকুমে তাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো মুসলমান সিপাহীরা। তারা সুযোগ খুঁজতে থাকে— ম্যাকেঞ্জিকে গুপ্ত হত্যা করতে হবে।

দুর্ভাগ্যবশত ঐ দিনই হায়দ্রাবাদের একটি নির্জন পথ ধরে একা ফিরছিলেন কর্ণেল ম্যাকেঞ্জি। হঠাৎ চার দিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেললো একদল দেশী সিপাহী। আত্মরক্ষার কোন চেষ্টার আগেই কর্ণেল চূড়ান্ত আঘাত পেলেন। তাঁর রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের মাটি ইংরাজের উষ্ণ রক্ত শোষণ করে নেয়। কর্ণেলকে হত্যা করেই সিপাহীরা তৃপ্ত হলো না। তারা আক্রমণ করলো কর্ণেল ম্যাকেঞ্জির বাসভূমিও। কর্ণেলের পরিবারের সকলে উন্মত্ত সিপাহীদের হাতে নিহত হন।

এটা একটা ঘটনা।

কিন্তু লর্ড ডালহৌসী এ ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন না। বুঝলেন না, সাইক্লোন শুরু হবার পূর্ববর্তী বাতাসের গোঙানি এটি।

ভারতবর্ষের বুকে রেলগাড়ি চলছে। রেলওয়ে কামরাতে বসবার আসনে কোন জাতি ভেদের বালাই নেই। উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণের পাশে যে কোন মুহূর্তে নিম্ন বর্ণের হিন্দু নমশুদ্র এসে স্থান গ্রহণ করতে পারে। ভারতীয়রা তাই ভয় পেলো। সমাজ পতিরা সরকার-বিরোধী হয়ে উঠলেন। সিপাহীরা আরো বিরক্ত হলো সরকার বাহাদুরের উপর। এরপর আছে টেলিগ্রাফ এবং বৈদ্যুতিক আলো ঝলমলে সড়কগুলি যেন ভগবানকে বিদ্রূপ করছে। এত দ্রুত সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা ভগবানকে অস্বীকার করার সামিল। গণ অসন্তোষের ঢেউ উঠলো তাই ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে।

১৮৫৬ সালে লর্ড ডালহৌসী বিদায় নিলেন। এলেন লর্ড ক্যানিং। উদার ও মহানুভব ক্যানিং। ভারতের তপ্ত মাটিতে পা দিয়েই চমকে উঠলেন সাহেব! এখানে যে অনেক বারুদ সঞ্চিত হয়ে আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তা আর অপসারণের উপায় নেই।

ক্যানিং সাহেবেরও প্রারম্ভিক কাজকারবার ভারতীয়দের এত কাল লালিত কুসংস্কারে ঘা দিতে থাকে। বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জানালেন তিনি। বিধবা-বিবাহ আইনসিদ্ধ বলে সরকার বাহাদুর ঘোষণা করলেন।

ভারতীয় সিপাহীদের উপর ইংরাজদের উন্নাসিকতার অন্ত ছিল না। তাদের যখন তখন, যে কোন দূরবর্তী স্থানে বদলি করে দেওয়া হতো। স্ত্রী-পুত্র পরিবার থেকে অনেক দূরে বছরের পর বছর যেন নির্বাসন ভোগ করতো ভারতীয় সিপাহী।

সিন্ধু প্রদেশে একবার বহু বাঙ্গালী সিপাহীকে পাঠাবার কথা ওঠে। কিন্তু বাংলার সৈনিকেরা রুখে দাঁড়ায়। সিন্ধু প্রদেশে তারা যাবে কিন্তু এ জন্য তাদের স্পেশাল এলাউন্স দিতে হবে! তখন ইংরাজ সরকার মাদ্রাজী সৈন্যদের দিকে ফিরলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন বেতন বৃদ্ধির। দলে দলে দক্ষিণ ভারতীয় সৈনিক চললো ভারত আফগান সীমান্তের দিকে। কিন্তু মাসের পর মাস যায় ইংরাজ সরকার আর তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করলেন না। আত্মীয় পরিজন

থেকে অনেক দূরে ভারতীয় সিপাহী দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে থাকে। সিন্ধুর মরুভূমিতে ঝড় ওঠে। সেই তপ্ত ঝড়ের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেকে। আবার হিমেল রাত্রিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। টপ টপ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে মাটিতে।

স্বল্প বেতনে দারিদ্র্যের করাল রূপ। চাকুরিতে উন্নতি নেই। অথচ, সাদা চামড়াদের কত সুযোগ সুবিধা! প্রতিরক্ষায় যতটুকু ব্যয় হয়, তার অধিকাংশই টেনে নেয় ওরা। মিশরের ক্রীতদাসদের চেয়েও দুঃখজনক অবস্থা ভারতীয় সিপাহীদের! একজন অবসর প্রাপ্ত ইংরাজ অফিসার লিখেছেন, "The entire army of India amounts to 315, 520 men costing £ 9, 802 235. Out of this sum no less than £ 5, 668, 110 are expended on 51, 316 European officers and soldiers."

অথচ, সাহেবরা কখনো যুদ্ধে বড় রকমের ঝুকি নেয় না। শত্রুর কামানের মুখে আগে ঠেলে দেয় ভারতীয় সিপাহীদেরই। পিছনে থাকে নিজেরা। যুদ্ধে জয় হলে সাহেবদের উল্লাসের অন্ত থাকে না। সুরা ও নারী নিয়ে গড়াগড়ি যায়। পিয়ানো বাজে। বল নাচে। আর সেই সময় আহত, ক্লান্ত ভারতীয় সিপাহীরা যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে।

সংখ্যা লঘু সাহেবদের এই অত্যাচার কৃষ্ণবর্ণ ভারতীয় সিপাহীরা আর কতকাল সহ্য করবে? রাগে তারা নিজেদের হাত নিজেরাই কামড়ে ধরে। হাতের আগ্নেয় অস্ত্রটা আরো শক্তভাবে চেপে ধরে। এটাকে হাত ছাড়া করলে চলবে না! এরই মুখে একদিন জবাব দেওয়া হবে কমবক্ত ইংরাজদের।

বিদেশীর শাসন এভাবে স্থায়ী হতে পারে না। দেশীয় যোদ্ধাদেরই যদি হাত না করা যায়, তবে ব্যর্থতা অনিবার্য। ইংরাজ শাসনের গোড়া পত্তনের যুগে সিপাহীদের প্রতি সাহেবদের ব্যবহার কিন্তু আদর্শ ছিল। সুবেদার সীতারাম লিখেছেন, "তখন আমি সাধারণ সিপাহী। সে সময়ে সাহেব সেনাপতিদের ব্যবহার কত

নম্র ছিল। প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে খানা-পিনার নিমন্ত্রণ পেতাম আমরা। তিনি আমাদের সাথে অনর্গল কথা বলতেন। নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন।" ইংরাজ-শাসন দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে ওদের আচার-ব্যবহারও পাল্টে গেল।

ইংরাজদের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা দরিদ্র চাষীদের খুশী করতে পারেনি। গ্রামের চৌকিদারেরা অনেকেই এ সময় চাকুরি হারায়। সরকারী বরকন্দাজরা তাদের স্থান দখল করে নেয়। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী তাই সন্ধ্যার অন্ধকারে জমায়েত হয়। পদচ্যুত চৌকিদার ইংরাজ বিরোধী বাষ্প ছড়াতে থাকে।

এর উপর আছে ডালহৌসীর সত্ত্ববিলোপ নীতি [ Doctrine of Lapse ]। পুত্রহীন দেশীয় রাজারা দত্তক পুত্র গ্রহণের সার্থকতা হারালেন। দত্তকপুত্র সিংহাসন পাবেন না। সেই রাজ্য গ্রাস করে নেবে কোম্পানী। এই নীতির জোরেই সাঁতরা, ঝাঁন্সী এবং তাঞ্জোর ইংরাজরা দখল করে নেয়। সাঁতরাকে ছিনিয়ে নেবার সময় এর মারাঠী নেতারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রজারাও স্থানীয় নেতাদের অধীনে অস্ত্র-শস্ত্র শাণাতে থাকে। ঝাঁন্সির বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মীবাঈও প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের উত্তেজনা ছড়াতে থাকেন।

ছোট্ট রাজ্য সম্বলপুরকেও সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। কর্ণাটের নবাবের উপাধি ও বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হলো। বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হলেন বিঠুরের নানাসাহেবও।

গদিচ্যুত, বৃত্তি বঞ্চিত এই সমস্ত দেশীয় নৃপতিরা সংঘবদ্ধ হতে থাকেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চূড়ান্ত আঘাত হানতে তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। রাণী লক্ষ্মীবাঈ ঘোষণা করলেন, "ঝান্সি হাম দেউঙ্গা দেউঙ্গা'। রঙ্গ বাপুজি ছুটে এলেন লণ্ডনে। সাঁতরাকে গ্রাস করবার কি অধিকার আছে কোম্পানীর, তা তিনি জানতে চান! সম্বলপুরের রাজ পরিবারের লোকেরা সশস্ত্র বরকন্দাজদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইংরাজদের উপর। তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া

হলো তাঁদের বিক্ষিপ্ত প্রয়াস। বিক্ষোভের বারুদ চূড়ান্ত ভাবে জমা হতে থাকে নাগপুরে। একমাত্র তাঞ্জোর ও কর্ণাট নীরবে মেনে নিলো ইংরাজদের অন্যায় বিধান। এরপর ১৮৫৬ সালে কোম্পানী যখন অযোধ্যার দিকে হাত বাড়ালো, বিপ্লবের তখন আর বেশী দেরী নেই!

হেদায়েৎ আলী লিখেছেন, "অযোধ্যাকে গ্রাস করবার কোন এক্তিয়ার বৃটিশ সরকারের ছিল না। সমস্ত ভারতবর্ষ এ ঘটনায় সরব হয়ে ওঠে। কারণ এই ঘটনাই প্রমাণ করে দিল, বৃটিশ সরকারের সাথে দেশীয় রাজাদের সমস্ত চুক্তিই মূল্যহীন। সুযোগ পেলেই ইংরাজরা চুক্তি ভঙ্গ করে।"

অযোধ্যার রাজ ভক্ত প্রজারা এই হঠকারিতা ক্ষমা করতে পারে নি। তাই বিদ্রোহের আগুনে সবচেয়ে বেশী পুড়ে ছিল অযোধ্যা।

অনেক ঐতিহাসিক বলেন, ধর্মীয় কারণেই সিপাহী বিদ্রোহ। কিন্তু এটা সত্যের অপলাপ। সাঁওতাল বা, ভীলদের মধ্যে কোন জাতিভেদ প্রথা বা অহেতুক ধর্মনাশের ভয় নেই। তবে এই সমস্ত উপজাতিরাও কেন সিপাহী-বিপ্লবে অংশ নিয়ে ছিল? কারণ একটা নয় অনেক। উপজাতি মেয়েদের উপর সাহেবদের পাশবমূলক অত্যাচারও এর অন্যতম কারণ।

দেশীয় নৃপতি ও জমিদারদের অধীনে কাজ করতো হাজার হাজার সশস্ত্র পাইক বরকন্দাজ। প্রভুদের ক্ষমতাচ্যুতির সাথে সাথে তারাও বেকার হয়ে পড়ে। ফলে ইংরাজ বিরোধী বিষে জর্জরিত পাইক বরকন্দাজরা সমবেত হতে থাকে পূর্বতন নেতাদের অধীনে।......

এনফিল্ড রাইফেল [ Enfield Rifle ]!

প্রথম উন্নত বৃটিশ রাইফেল। এর আগে চালু ছিল ব্রাউন বেস [ Brown Bess ]। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রথম ভাগে ব্রাউন বেস নিয়েই লড়াই চালিয়েছিল ইংরাজরা। কিন্তু রুশদের হাতে প্রচণ্ড

মার খেয়ে ফিরে আসছিল তাদের আক্রমণ। তারপর আবিষ্কৃত হলো এনফিল্ড গান। যুদ্ধের গতিও পরিবর্তিত হয়। ইংরাজদের গোলাবর্ষণের মুখে রুশ প্রতিরক্ষা ভেঙ্গে পড়তে থাকে। এনফিল্ড রাইফেলকে তাই চুম্বন করেন বৃটিশ কর্তারা। এটিকে এবার চালু করতে হবে তাঁদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য রক্ষায়।

১৮৫৬ সালে এনফিল্ড এলো ভারতবর্ষে। এলো এর সাথে ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত চর্বি মাখানো নতুন ধরণের কার্তুজ। দম দম এবং মিরাটে সৈনিকদের ছাউনিতে পৌঁছে দেওয়া হলো শত শত এনফিল্ড রাইফেল ও এর কার্তুজ। নতুন রাইফেল চালনার শিক্ষা শিবির বসলো দম দম, আম্বালা এবং শিয়ালকোটে। বাছাই করা ভারতীয় সিপাহীরা এলো সেখানে নতুন বন্দুক চালানো শিখতে।

প্রথম প্রথম নিশ্চিন্তে ভারতীয় সিপাহীরা দাঁতে টোটা কেটে নতুন ধরণের বন্দুক চালাতে শুরু করে। কার্যকারিতা দেখে তারা চমৎকৃত হয়। খুশী হয়।

কিন্তু গোল বাঁধলো কয়েক সপ্তাহ বাদেই।

একজন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ সিপাহী এক নীম্ন বর্ণের লস্করের কাছে শুনলো সেই সাংঘাতিক কথা। এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজগুলিতে নাকি চর্বি মাখানো আছে। গরু এবং শুকরের চর্বি। লণ্ডনের কারখানায় তৈরী। দাঁত দিয়ে কাটতে হয় এই টোটা।

সর্বনাশ! চাকুরির দায়ে জাত গেল, ধর্ম গেল। জাত গেল হিন্দুদের—গো-দেবীর চর্বি তাকে দাঁতে কাটতে হচ্ছে। জাত গেল মুসলীমদেরও—শুকুরের চর্বি তাকে দাঁত দিয়ে স্পর্শ করতে হচ্ছে।

কলকাতার ধর্মসভা এই খবর শুনলো।

বাতাসের সাথে ছড়িয়ে পড়লো চারধারে ইংরাজদের এই অপ-চেষ্টার কথা। প্রতিটি ভারতীয় সিপাহী সরাসরি প্রতিবাদ জানালো এই ব্যবস্থার। ঐ কার্তুজ স্পর্শও করবে না। অন্য কোন ধরণের চর্বিহীন কার্তুজ তাদের দেওয়া হোক! তারা রাজভক্ত, কিন্তু তাই বলে ধর্ম ত্যাগ করতে পারবে না।

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬ সাল The Times পত্রিকা সিপাহীদের সন্দেহকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করলো :

"The cartridges of the new Enfield rifle are greased at one end to make them slip readily into the barrel. The Government ordered mutton fat for the purpose. Some contractors, to save a few shillings, gave pigs' and bullocks fat instead."

ইংরাজ সরকার সিদ্ধান্ত নিতে যত দেরী করছেন, সিপাহীদের অসন্তোষ ততোই বেড়ে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত চক্রান্তই এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ইংরাজরা শুধু ভারতীয়দের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করেনি, তাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে নিঃস্ব করেছে, এখন ধর্ম নিয়েও টানাটানি শুরু করেছে! এই সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদকে চূর্ণ করবার জন্য প্রথম সংগ্রামে এগিয়ে এলো লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সিপাহী!

প্রথম আগুন জ্বললো বেরহানপুরে।

আগুন জ্বালালেন এক ইংরাজ সেনাপতি—কর্ণেল মিচেল। মিচেল হুঙ্কার দিলেন, প্রতিটি ভারতীয় সৈনিককে এনফিল্ড রাইফেল ব্যবহার করতেই হবে! না হলে, কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে তাদের। জোর করে পাঠানো হবে বার্মায় অথবা, চীনে। সেখানে ঘটবে তাদের করুণ মৃত্যু।

মিচিলের হুমকিতে ভারতীয় সৈনিকরা রক্ত চক্ষু নিয়ে তাকায় তাঁর দিকে। তারপর হঠাৎ বন্দুক তুলে রুখে দাঁড়ায় মিচেলের দিকে। মিচেল ঘাবড়ে যান। মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে চলে আসেন নিজের শিবিরে।

বেরহানপুরের নীরব বিপ্লব ইন্ধন জোগালো ব্যারাকপুরে। ২৯শে মার্চ ব্যারাক পুর প্যারেড গ্রাউণ্ডে মার্চ, ড্রিল ও ঘোড় দৌড়ের মহড়ায় নেমে পড়েছে ভারতীয় সিপাহীরা। ওদের মধ্যে আছেন এক দীর্ঘকায় জোয়ান। নাম তাঁর মঙ্গল পাণ্ডে। সাহসী সৈনিক

হিসাবে তাঁর সুনাম আছে। কিন্তু গত কয়েক দিন যাবত ইংরাজ বিদ্বেষে তাঁর চওড়া বুকখানা ফুলে উঠছে। বৃটিশদের বেয়াদপির জবাব দিতে আজ তিনি বদ্ধ পরিকর তাঁর চোখের সামনে কয়েক জন ধর্মভীরু ভারতীয় সিপাহীর কোর্ট মার্শাল হয়ে গেলো। মঙ্গল পাণ্ডের রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। ২৯শে মার্চ ঈশ্বরী পাণ্ডে এবং আরো দু একজন সহকর্মী সহ তিনি আক্রমণ করলেন ইংরাজ সার্জেণ্ট মেজরকে। মেজরকে সাহায্য করতে ছুটে এলেন লেফটন্যাণ্ট বাগ্। কিন্তু মঙ্গল পাণ্ডের অব্যর্থ গুলিতে ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন সার্জেণ্ট মেজর এবং লেফন্যাণ্ট বাগ্। কোন সিপাহী এগিয়ে এলো না তাঁদের তুলে ধরতে।

খবর পেয়ে সসৈন্যে ধেয়ে আসেন জেনারেল হিয়ার সে।

মঙ্গল তাঁর সহকর্মীদের আহ্বান জানালেন, ইংরাজদের রুখতে। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোন ভারতীয় সিপাহী তাঁকে সাহায্য করে নি। অসহায় মঙ্গল পাণ্ডে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন। নিজের কপাল তাক করে গুলি ছুড়লেন। কিন্তু আঘাত তেমন গুরুতর হলো না। রক্তাপ্লুত পাণ্ডে কে ভর্তি করা হলো সামরিক হাসপাতালে। সুস্থ হলে দেওয়া হলো কোর্ট মার্শাল। প্রকাশ্যে ফাঁসি হলো মঙ্গল পাণ্ডে ও ঈশ্বরী পাণ্ডের। মৃত্যুর আগে মঙ্গল চিৎকার করে তার সহকর্মীদের আর অপেক্ষা না করে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে বলে গেলেন!

উনিশতম ইন্‌ফেন্ট্রিকে নিরস্ত্রীকরণ করা হলো। অনেকের চাকুরি গেল। অনেককে পোরা হলো কয়েদখানায়।

কিন্তু আগুন আর চাপা থাকে না।

ব্যারাকপুরের স্ফুলিঙ্গ বিরাট বিস্ফোরণ ঘটালো মিরাটে। কর্ণেল স্মিথ ছিলেন এখানের সামরিক অধিকর্তা। তাঁর ধারণা ছিল, স্থানীয় সশস্ত্র ইউরোপীয় সৈন্যদের দিয়েই তনি ভারতীয় সেনাদের ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন।

মিরাটের সৈন্যরা বেশীর ভাগই মুসলীম। এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ তারাও ব্যবহার করতে রাজি নয়। স্মিথ তাই প্রায়ই কোর্ট

মার্শাল দিচ্ছেন ওদের ধরে ধরে। সামরিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ভারতীয় সৈনিকরা। ক্রমশই তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

১১ই মে দুপুর বেলা! ভারতীয় উদ্বিগ্ন সিপাহীরা খবর পেলো, ইংরাজরা ধেয়ে আসছে তাদের অস্ত্র কেড়ে নিতে। এই চূড়ান্ত লগ্নে আর সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা থাকা উচিত নয়। 'মার মার' শব্দে সিপাহীরা রাইফেল হাতে সমস্ত শহরময় ছাড়িয়ে পড়ে। শহরের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। গ্রাম থেকেও হাজার হাজার লোক এসে যোগ দেয় সিপাহীদের সাথে।

কর্ণেল স্মিথ ছুটে গিয়ে ইউরোপীয়দের ব্যারাকে আশ্রয় নিলেন।

সিপাহীরা প্রথমেই অফিসারদের হত্যা করতে চায় নি। কিন্তু ইংরাজ-কামান গর্জে উঠতেই তারাও গুলি বর্ষণ শুরু করে। সিপাহীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন ইংরাজ সেনাপতি ফিনিশ। ··

সেই অন্ধকার রাত্রিতে ভয়াবহ যুদ্ধ চললো মিরাটের পথে পথে। ইংরাজদের বাংলোগুলো তছনছ হয়ে গেলো সিপাহীদের আক্রমণে। ইউরোপীয়দের আর্তনাদে মিরাটের আকাশ বাতাস কেঁপে কেঁপে ওঠে।

জেলখানা ভেঙ্গে কয়েদীদের মুক্ত করে দিলো সিপাহীরা। শহরের পুলিশ বাহিনীও হাত মেলালো বিদ্রোহীদের সাথে। কোতোয়াল ধ্যান সিং সাহেবদের বিলেতী মদের দোকান এবং 'বার' গুলি চুরমার করে দিলেন।

ইউরোপীয়ানদের সাক্ষাৎ পেলেই রক্তলোভী নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে সিপাহীরা, ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলছে ওদের রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা।

নৃসংশ হত্যাকাণ্ড ঘটলো ক্যাপ্টেন ক্রেজীর বাংলোতে। ক্যাপ্টেন ডিউটিতে চলে গেছেন। আর তাঁর সুন্দরী স্ত্রী ছোট ছেলেটিকে নিয়ে খেলা করছিলেন। হঠাৎ সিপাহীরা চড়াও হলো সেই বাংলোতে। শ্রীমতী ক্রেজীর দেহটিকে টুকরো টুকরো করে

ফেলা হলো। শিশুটিকে হত্যা করা হলো মেঝেতে আছড়ে। ইংরাজরা এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড কোনদিন ভুলতে পারে নি। ভারতীয় সিপাহীদের উপর প্রতিশোধ নেবার সময় তারা মিসেস্ ক্রেজী ও তাঁর শিশুপুত্রকে স্মরণ করতো।

'কোম্পানীর রাজত্ব খতম করে দিয়েছি!'

মিরাটের সৈন্যরা পাগলের মতো বন্দুক তুলে নাচতে থাকে। বহুদিন পরে মুক্তির স্বাদ পাওয়া রোমান ক্রীতদাসদের মতো তাদের উল্লাসের আর কোন সীমা নেই!

কিন্তু মিরাটে বেশীক্ষণ অবস্থান.করা যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ, তখনো সেখানে দেড় হাজারের উপর সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সৈন্য রয়ে গেছে। প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে তারা যে কোন মুহূর্তে পাল্টা আক্রমণ হানতে পারে।

কিন্তু মিরাট ত্যাগ করে যাবে কোন দিকে?

একদল বললে, রোহিলাখণ্ডে চলো। অপর দল আওয়াজ তোলে, 'দিল্লী চল!' রাজধানী দিল্লী বেশী দূরে নয়। মাত্র চল্লিশ মাইল মিরাট থেকে।

ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিদ্রোহীরা মিরাট শহর ত্যাগ করলো। তাদের অধিকংশই চললো দিল্লীর দিকে।

ভীত বিহ্বল ইংরাজ সৈনিকরা ব্যারাক ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখলো, সমগ্র মিরাট শহরটি যেন এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তখনো ধোঁয়া উঠছে। আগুন জ্বলছে ধিক ধিক। তখনো শোনা যাচ্ছে আহতদের আর্তনাদ। সন্তানহারা মায়ের বুক ফাটা কান্না।

সেনাপতি রটন আক্ষেপের সাথে বললেন, "আমাদের সমর-কর্তারা একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন। কেউ স্থির করতে পারেন নি, সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে তাঁর কী করা উচিত! বাস্তবিক পক্ষে, আমরা কিছুই করতে পারিনি!"

বৃটিশরা এমন অসহায়ের মতো এর আগে কখনো মার খায়নি।

মিরাটের পর দিল্লী।

এই লালকেল্লা, সুশোভিত, সুরক্ষিত দিল্লী।

দিল্লীতে একজন রাজা অবশ্য তখনো ছিলেন। কিন্তু নামেই রাজা। ক্ষমতায় একেবারে কাঠের পুতুল। রাজভাণ্ডারও কপর্দক-শূন্য। শুধুই অতীত গরিমায় তিনি ভরপুর। অতীতকে নিয়েই তাঁর স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা। বাস্তবে ইংরাজদের চোখ রাঙানি তাঁকে পদে পদে হজম করতে হয়।

সেই হতভাগ্য পুতুল রাজার নাম বাহাদুর শাহ। সূর্যতুল্য প্রতাপান্বিত সম্রাট আকবর ও ঔরঙ্গজীবের বংশধর তিনি। লাল-কেল্লার সিংহাসনে বসেন ১৮৩৭ সালে। অত্যন্ত সাদাসিধে ধীর স্থির মানুষ। সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। থাকবার মধ্যে আছে একটু সাহিত্য-প্রীতি। অবসর সময়ে তিনি আত্মস্মৃতি লেখেন। রচনা করেন সুললিত ছন্দবদ্ধ কবিতা। বেগম জিনাৎ মহলকে ছাড়া তাঁর এক মুহূর্ত চলে না। প্রিয়ার রূপ আকণ্ঠ পান করে পরমতৃপ্ত বাহাদুর শাহ।

ইংরাজ সরকার আর এই পুতুল সম্রাটকে সেলাম জানাতে রাজি হলেন না। লর্ড এলেনবার্গ বাহাদুর শাহ্‌কে 'নজরানা' দিতে অস্বীকার করলেন। নিদারুণ অপমানে লাল হয়ে উঠলেন বাহাদুর শাহ। কিন্তু কী করবেন? তিনি শক্তিহীন, অথর্ব, ইংরাজদের করুণার উপরই নির্ভরশীল!

বাহাদুর শাহ্‌ বুঝতে পারলেন, তিনিই শেষ মোগল প্রদীপ। তাঁর মৃত্যুর পর আর কাউকে ইংরাজরা 'সম্রাট' উপাধি দিতে রাজি হবে না! শাহ্‌জাহান এবং আলমগীরের বংশধরেরা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে। ইতিহাসের আঁস্তাকুড়েও স্থান হবে না তাঁদের!

ক্ষুব্ধ, চিন্তিত বাহাদুর শাহ তখন আর মুক্তির পথ দেখতে পাচ্ছেন না।

ঠিক এমন এক মুহূর্তে মিরাট থেকে বিপ্লবী সিপাহীরা হৈ হৈ

.করতে করতে উপস্থিত হলো দিল্লীর দরজায়। দিল্লীর ইংরাজরা এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বিদ্রোহীদের বন্দুকে গুলিতে প্রাণ হারাতে লাগলো তারা। দিল্লীর কমিশনার সাইমন ফ্রেসার তখনো শুয়ে আছেন বিছানায়। হঠাৎ বিপদের ঘণ্টা শুনে ছুটে এলেন বাইরে। শত শত বিদ্রোহী সিপাহী ঘোড়া ছুটিয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এক দক্ষ যজ্ঞ বাধিয়ে তুলেছে। ওদের গুলিতে প্রাণ দিলেন নগরের তোলা সংগ্রহক। বহু ইংরাজের মৃতদেহ ছড়ানো রয়েছে ইতস্তত।

বিদ্রোহীদের সেই উল্লাস-ধ্বনিতে এবং আহত ইংরাজদের কাতর চিৎকারে চমকে উঠলেন বাহাদুর শাহ। এরা কারা? কি চায়? তবে কি তাঁর মুক্তি আসন্ন? শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ আর ভাবতে পারছেন না!

ইংরাজ সৈন্যদের আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও লালকেল্লায় ঢুকে পড়ে সিপাহীরা। তাদের গুলিতে প্রথমেই প্রাণ হারালেন একজন ভারতীয় খৃষ্টান চিকিৎসক ডাঃ চমনলাল। ডাক্তার তাঁর ডিসপেনসারীতে বসে ছিলেন। হঠাৎ একটি বুলেট এসে বিদ্ধ হয় তাঁর বুকে।

বিদ্রোহীরা ছুটলো প্রাসাদ লক্ষ্য করে। কোন বাধা পেলো না তারা। বাধা দেবে কে? প্রাসাদরক্ষীরাও যে যোগ দিয়েছে তাদের সাথে। একে একে হত্যা করা হলো তিনজন ইংরাজ সেনাপতিকে,—কমিশনার সাইমন ফ্রেসার, কালেকটর হ্যাচিনসন এবং যুদ্ধ-নিপুণ ডগলাসকে! সিপাহীদের হাতে মারা গেলেন মিঃ জেনিংস, মিসেস জেনিংস, তাঁদের একমাত্র কন্যা এবং তাঁর বান্ধবী!

বিদ্রোহীরা বাহাদুর শাহকে তাদের নেতা বলে ঘোষণা করলো। ঘোষণা করলো ভারতবর্ষের সম্রাটরূপে। দিল্লীর স্থানীয় সিপাহীরাও এসে যোগ দেয় সেই স্বাধীনতার উৎসবে। তাদের অনেক ইংরাজ অফিসার খুন হয়েছেন। অনেকে পালিয়ে গেলেন

সপরিবারে। দিল্লী মুক্ত। ভারতবর্ষের রাজধানীতেই প্রথম স্বাধীনতার কথা ঘোষিত হলো। দু'জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবক দ্রুত ছুটে গিয়ে টেলিফোনে খবর পাঠালেন আম্বালা, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি এবং পেশোয়ারে "ভয়ানক বিপদ! মিরাট থেকে দলে দলে বিদ্রোহী সিপাহীরা ঢুকে পড়েছে দিল্লীতে। তারা দখল করে নিয়েছে লাল কেল্লা। গোটা শহরটা এখন তাদের কব্জায়।

মিঃ টড সহ বহু উচ্চপদস্থ ইংরাজ খুন হয়েছেন। আমরা মাত্র কয়েকজন আত্মগোপন করে আছি। যে কোন মুহূর্তে আমাদেরও মৃত্যু ঘনিয়ে আসতে পারে!"

বাহাদুর শাহকে সামনে রেখে বিজয়ী সিপাহীরা দিল্লীতে তাদের সরকার গঠন করে ফেলে। একটি সংবিধানও রচিত হলো।

কিন্তু মে মাসের শুরুতেই বিপদ ঘনিয়ে আসে। বিচ্ছিন্ন দিল্লীতে দেখা দেয় ভয়ানক খাদ্যাভাব। অর্থাভাবে সিপাহীদের বেতন দেওয়া চলছে না। শুধু লুটপাট করে কি আর রাজত্ব চলানো যায়? অর্থ ও খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো সিপাহীরা।

হায়দ্রাবাদ ও দিল্লীর লাখোপতিদের আস্তানা লুণ্ঠিত হলো। সঞ্চিত হলো লক্ষ লক্ষ মুদ্রা। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাও সামান্য।...

দিল্লী উদ্ধারে ইংরাজদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো।

প্রধান সেনাপতি জেনারেল এ্যানসন হিমালয়ের পাদদেশে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে গিয়াছিলেন। বিদ্রোহের সংবাদে ছুটে এলেন পাঞ্জাবে। এলেন বিখ্যাত ইংরাজ সেনাপতি জন লরেন্স। দেরাদুন থেকে মার্চ করতে করতে এগিয়ে চললো বিশাল গুর্খা রেজিমেণ্ট। এ্যানসন বুঝলেন, সুরক্ষিত দিল্লীকে উদ্ধার করা সহজ হবে না। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে সৈন্য ও রসদ সংগ্রহ করতে থাকেন তিনি। দেশীয় বহু রাজাও ইংরাজদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। পাতিয়ালার মহারাজা, ঝিন্দের রাজা এবং কারণের নবাব এই সঙ্কটময় মুহূর্তে রাজভাণ্ডার উজাড় ক'রে ইংরাজদের সাহায্য করলেন।

দেশীয় শিখ সৈন্যরা পরিপূর্ণ আনুগত্য জ্ঞাপন করলো ইংরাজ সরকারকে। ক্রিমিয়াযুদ্ধ-ফেরৎ ইংরাজ সেনাপতি বার্ণাড সসৈন্যে উপস্থিত হলেন মিরাটে।

৮ই জুন দিল্লী থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে বাদ্লি-কি-সরাই এ সেনাপতি বার্ণাড একদল বিদ্রোহীর সাক্ষাৎ পেলেন। ইংরাজদের কামান গর্জে উঠলো। নেতৃত্বহীন সিপাহীরা বীরের মতো লড়াই করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে না ওঠায় চারদিকে পালিয়ে যায়। বার্ণাড ওদের ছাব্বিশটা বন্দুক উদ্ধার করেন। সেই খণ্ডযুদ্ধে চার জন ইংরাজ অফিসার প্রাণ হারান।

ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদেরও সংখ্যা এবং শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে। মথুরা রোড ধরে হাজার হাজার সিপাহী দিল্লীতে ঢুকে পড়েছে রোহিলাখণ্ড ঝান্সী, কানপুর, নাসিরাবাদ ইত্যাদি শিবির থেকে।

ইংরাজরা দিল্লী আক্রমণের পরিকল্পনা আঁকেন। বার্ণাড অতর্কিতে দিল্লী আক্রমণের কথা বললেন। কিন্তু সেনাপতি রটন আরো শক্তি সংগ্রহের কথা বললেন। কারণ, সিপাহীরা যদি একবার ইংরাজদের আক্রমণ রুখতে পারে, তবে ভারতের মাটিতে আর কোন দিন ইউনিয়ন জ্যাক উড়বে না। কর্ণেল কীথও যথেষ্ট সতর্কতার সাথে অগ্রসর হবার কথা বললেন।

৯ই জুন, সিপাহীরাই প্রথম আক্রমণ করলো বার্ণাড-এর সৈন্য শিবিরকে। অনেক কষ্টে বিদ্রোহীদের রুখলেন বার্ণাড।...দুর্ভাগ্যের বিষয়, সিপাহীদের মধ্যে কোন সুদক্ষ নেতা ছিলেন না। তাদের শুধু বুকভরা সাহস এবং উন্নত যুদ্ধ কৌশল ছিল আয়ত্তে। কিন্তু কে দেবে তাদের নেতৃত্ব?

১৯শে জুন আবার সিপাহীরা ঝাপিয়ে পড়লো ইংরাজ শিবিরে। এবারও প্রচুর ক্ষতি হলো ইংরাজদের। তাদের পাঞ্জাবে যাবার রাস্তাটা পর্যন্ত সিপাহীরা উড়িয়ে দিলো। তবু নেতৃত্বের অভাবে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারলো না সিপাহীরা।

ঘটনাগুলো ঘটছে পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশত বৎসর বাদে।

সিপাহীদের বিশ্বাস ছিল, ঠিক এই একশত বৎসরের মাথাতেই ইংরাজ শাসনের অন্তিম ঘনিয়ে এসেছে। তাই তারা মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালালো ইংরাজ শিবিরে। তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো মারমুখী সিপাহীরা তছনছ করে দিতে থাকে ইংরাজদের প্রতিরক্ষা ব্যূহকে। মেজর রীড সেই ভয়াবহ আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, "No men could have fought better···and I thought I must have lost the day···every thing is going against ourselves."

তবু ইংরাজরা হারলো না।

ইউনিয়ন জ্যাককে যমুনার জলে বিসর্জন দিতে পারলো না সিপাহীরা। ২৪শে জুন ইংরাজ সেনাপতি নেভিল চেম্বারলেন তাঁর বিশাল শিখ রেজিমেণ্ট নিয়ে উপস্থিত হলেন দিল্লীর প্রান্তরে। রক্ষা করলেন পতন্মুখ ভারত সাম্রাজ্যকে।

সেনাপতি হার্ভে সহর্ষে স্ত্রীকে লিখে পাঠালেন :

"Neville Chamberlain has arrived, of this we are all glad, as well as the General······"

বিদ্রোহীদের মধ্যেও এসে পৌঁছেছেন এক নতুন নেতা।

নাম তাঁর বাগৎ খান। বেরেলি থেকে সসৈন্যে সদ্য দিল্লীতে এসে পৌঁছেছেন। সঙ্গে আছে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা। প্রতিটি সিপাহীকে পাঁচ মাসের অগ্রিম বেতন দিয়ে ফেললেন। বাহাদুর শাহ্ তাঁকে প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত করলেন। ভোজনপ্রিয়, বিশালদেহী বাগৎ খান দূরে ইংরাজ শিবিরগুলির দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ হট্টহাসিতে ফেটে পড়েন!

কিন্তু হাসি যেন হৃদয়বিদারক কান্নারই প্রকাশ।

সিপাহীদের রসদ যে ক্রমশই ফুরিয়ে আসছে। গোলা-বারুদের ভাণ্ডার শূন্য বললেই চলে! বৃটিশ সেনাপতি বার্ণার্ড কলেরায় মারা গেছেন। তবু ইংরাজদের শক্তি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সিপাহীদের প্রতিটি আক্রমণ ব্যর্থ!

হতভাগ্য সম্রাট বাহাদুর শাহ ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে বেগম জিনাৎ মহলের দিকে তাকান। টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ে গণ্ড বেয়ে। অবাধ্য সিপাহীরা তাঁকে এতটুকুও মানে না।

ওদের লুণ্ঠনে, অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে দিল্লীর প্রতিটি সাধারণ নাগরিক। এমনকি, সম্রাটের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাকিমকে পর্যন্ত সিপাহীরা বন্দী ক'রে নিয়ে গেলো। হাকিম নাকি গোপনে ইংরাজদের হয়ে চক্রান্ত করছেন! গভীর বেদনায় ভেঙ্গে পড়েন সম্রাট! একবার ভাবেন, সব কিছু ত্যাগ করে তিনি মক্কা চলে যাবেন, আর ফিরবেন না। আবার ভাবেন, আত্মহত্যা ক'রে সকল জ্বালার হাত থেকে মুক্তি পাবেন! কিন্তু বেগম জিনাৎ মহল অতটা ভেঙ্গে পড়েন নি। গোপনে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করলেন ইংরাজদের সাথে। ইংরাজদের কাছে পাঠিয়ে দেন, তাঁদের শুভেচ্ছা ও মুক্তির আকুতি! হতভাগ্য সিপাহীরা জানতেও পারলো না, স্বয়ং মুঘল সম্রাট তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে দিয়েছেন!

৭ই আগষ্ট।

চেম্বারলেনের পর অপর এক যুদ্ধ নিপুণ সেনাপতি নিকলসন এসে যোগ দিলেন ইংরাজ শিবিরে। অসমসাহসিক নেতা তিনি। সাহসের সাথে ছিল নিষ্ঠুরতা। মুক্ত কৃপাণ হাতে তিনি যে কোন বাঘের মুখেও লাফিয়ে পড়তে পারতেন। 'He could fearlessly face a ferocious tiger, armed with a sword only'

নিকলসনের আবির্ভাবে ইংরাজরা এবার দিল্লী আক্রমণে প্রস্তুত হলো। ইঞ্জিনীয়ার এনে ব্যাটারী চার্জ করা হলো কেল্লার দরজায়। তারপর সেই ফাটল দিয়ে পিল পিল করে ইংরাজ সৈন্য ঝাপিয়ে পড়ে ভিতরে। সিপাহীরা লড়াই করলো মরণ পণ। বহু ইংরাজ অফিসার তাদের হাতে মারা যান। বিদ্রোহীদের মৃতদেহে পাহাড় জমে ওঠে। সেলিমগড়ের শক্ত দুর্গের পতন ঘটালেন উইলসন। পরাজয় অনিবার্য দেখে সসৈন্যে অযোধ্যার দিকে ছুটলেন সেনাপতি বাগৎখান।

কিন্তু বাহাদুর শাহ কোথাও যেতে নারাজ। সিপাহীদের পতন তিনি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন। দেখলেন কী ভাবে ভারতীয় শিখ, ও গুর্খা রেজিমেণ্টই শেষ করে দিল তদেরই ভ্রাতৃ-প্রতিম অযোধ্যা, দিল্লী, গোয়ালিয়র ও বেরিলির সিপাহীদের।

সম্রাট বাহাদুর শাহ তাঁর প্রিয়তমার হাত ধরে আত্মসমর্পণ করলেন ইংরাজ সেনাপতি হাডসনের কাছে।

কিন্তু তাঁর পুত্ররা মির্জা মুঘল, মির্জা খিজির সুলতান এবং মির্জা আবুবকর আত্মরক্ষার আশায় হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরে আশ্রয় নিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন।

সেনাপতি হাডসন তিনজন যুবরাজকেই বন্দী ক'রে নিয়ে এলেন শহরের মধ্যস্থলে। তারপর তিনজনকেই হত্যা করলেন নিজের হাতে। নীলরক্তের বান ডাকলো দিল্লীর রাজপথে। সম্রাট বাবরের কবরে বাতি দেবার কেউ রইলো না। বৃদ্ধ সম্রাট বুক চাপড়ে কেঁদে উঠলেন। নির্মেঘ আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি হতে লাগলো লালকেল্লার উপর!

সিপাহী বিদ্রোহের কথা আলোচনা করতে গেলে সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে কুমার সিংকে। দিল্লীর কুমার সিং ভবনে গিয়েছিলাম মামার গাড়ীতে চেপে। তাঁর সেই তেজদৃপ্ত তৈলচিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মন আমার হারিয়ে যায় কোন সেই সুদূর অতীতে! একশ' বছর আগে সেই অগ্নিঝরা দিন গুলিতে।

জগদীশ পুরের রাজা কুমার সিং। আজ অবশ্য তাঁর রাজ প্রাসাদের চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু ইতিহাস বলে, একদিন সেখানে ছিল এক সুরম্য অট্টালিকা। ছিল অবিস্মরণীয় দৃশ্য ও শোভা। শ্বেতপাথরের স্তম্ভ ও মন্দির। রাজপুরুষগণের নয়নাভিরাম সাজসজ্জা ও মনোহর আচার-ব্যবহার।

বিলাসে বৈভবে ভরপুর ছিলেন কুমার সিং। দানবীর হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল বহুদূর বিস্তারিত। প্রার্থীদের ভিড় লেগেই থাকতো তাঁর দরবারে। নিষ্ঠাবান হিন্দু কুমার সিং ধর্ম কর্মেও ব্যয়

করতেন অকাতরে। ব্রাহ্মণ সেবায় ও মন্দির নির্মানে তাঁর রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নির্দিষ্ট থাকতো।

ইতিহাসের আরও অনেক সফল নায়কের মতো কুমার সিংও ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু এই নিরক্ষরতা তাঁর রাজ কর্মকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। আকবর, শিবাজী, রণজিৎ সিংহের পদাঙ্ক অনুসরণে তিনিও নিজের সহজাত প্রতিভা ও বুদ্ধিতে ভাস্বর হ'য়ে উঠেছিলেন।

জাতিতে রাজপুত, ধমণীতে উচ্ছল রক্তপ্রবাহ নিয়ে কুমার সিং তাঁর যৌবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর দীর্ঘবাহু, অমিত শক্তি —জগদীশ পুরের শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন তিনি। ঘোড় দৌড়ে, অসি চালনায়, বন্দুক নিয়ে নিশানা স্থির করাতে তাঁর সমকক্ষ সে তল্লাটে অন্তত কেউ ছিল না।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক হয়েও কুমার সিং কিন্তু ইংরেজ বিদ্বেষী ছিলেন না। বরং সাহেব সুবোর সঙ্গেই ছিল তাঁর জোর দহরম-মহরম। বহু পদস্থ ইংরাজ অফিসারের দল জগদীশপুরের প্রাসাদে এসে আপ্যায়িত হতেন। পাটনার কমিশনার টেলর ছিলেন তাঁর বন্ধু স্থানীয়।

যৌবনের প্রারম্ভ থেকে পৌঢ়ত্বের দ্বার পর্যন্ত এই ইংরাজ সাহচর্যে কুমার সিংহ তাঁর দিনগুলি অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে তাঁকেই দেখা গেলো বিদ্রোহীদের নায়করূপে।

তাঁর এই পরিবর্তনের পিছনে ক্রমশ সঞ্চারিত কতকগুলি কারণ বর্তমান ছিল :

প্রথমত, বিদ্রোহের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসর কুমার সিংকে অত্যন্ত আর্থিক দুশ্চিন্তায় কাটাতে হয়েছিল। নিরক্ষতার সুযোগ নিয়ে তাঁর অসাধু কর্মচারীরা প্রায়ই রাজস্বের মোটা অংশ আত্মসাৎ করতো। এ সম্পর্কে টেলর বলেছেন, Baboo is altogether illiterate and thus has ever been an easy prey to the

designing and a puppet in the hands of his interested agents.

কুমার নিজেও বড় একটা হিসাব করে চলতেন না। ফলে রাজকোষ দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু ইংরাজ ট্যাক্স কালেকটররা কড়ায় গণ্ডায় নিজেদের পাওনা আদায় করে নিতে কসুর করতেন না।

কুমার সিং টেলরকে তাঁর বিপদের কথা জানালেন এবং ইংরাজদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু বার বার প্রার্থনা জানিয়েও ব্যর্থ হলেন তিনি। এই ঘটনা ক্রমশ তাঁকে ইংরাজ বিদ্বেষের দিকে পরিচালিত করে।

দ্বিতীয়ত, এই সময় ইংরাজ সরকার অহেতুক কুমার সিংকে সন্দেহ করতে শুরু করেন। চারদিকে তখন বিপ্লবের বহ্নি প্রজ্বলিত। বহু স্থানচ্যুত, কক্ষচ্যুত অসন্তুষ্ট দেশীয় রাজারা তাঁদের পাইক বরকন্দাজ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। পাটনার ইংরাজদের ধারণা বদ্ধমূল হলো, কুমার সিংও নিশ্চয় গোপনে বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলেছেন!

কুমার সিংকে নির্দেশ দেওয়া হলো পাটনায় এসে কৈফিয়ৎ দিতে। বস্তুত তখন পর্যন্ত কুমার সিং বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন নি! কিন্তু এই হঠাৎ নির্দেশই তাঁর ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিতভাবে চিহ্নিত ক'রে দিয়ে গেল।

কুমার সিং স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, পাটনাতে উপস্থিত হওয়া মানেই স্বেচ্ছায় ইংরাজ খপ্পরে গিয়ে পড়া। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে [২০শে জুন, ১৮৫৭ সাল] কয়েকজন 'ওহেবী নেতা' পাটনাতে ইংরাজ কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে বন্দী হয়েছিলেন। এমন কি, সন্দেহ তীব্রতর হলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত আশ্চর্য ছিল না।

তৃতীয়ত, এই সময়ে বিদ্রোহের আগুন ক্রমশ শহরকেও স্পর্শ করে। একদল বিদ্রোহী সিপাহী দানাপুর সেনানিবাস থেকে আরার দিকে রওয়ানা দেয়। ইংরাজ সেনারা শত চেষ্টাতেও শহর

রক্ষা করতে পারে নি—মাত্র কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধেই আরা বিদ্রোহীদের করতলগত হয়। বিদ্রোহী সেনারা কুমার সিংহের নেতৃত্ব প্রার্থনা করলো। ইংরাজদের উপর ক্রুদ্ধ কুমার সিং সানন্দে এগিয়ে এলেন। জগদীশপুর ত্যাগ ক'রে আরাতে তাঁর শিবির স্থাপিত হলো।

কুমার সিং শহীদ হবার পথে এগিয়ে চললেন।

এ সেই ১৮৫৭ সালের ইতিকথা।

রক্তপিচ্ছিল সংগ্রামের ইতিহাস। শত বৎসরের ইংরাজমূল নড়ে উঠলো সবেগে! হিংস্র, উন্মত্ত গতিতে বিপ্লবের সর্পিল গতি রক্ত স্বাক্ষর আঁকতে লাগলো দিল্লী, বাংলা, অযোধ্যা, কানপুর, ঝাঁন্সী, ভরতপুর, গোয়ালিয়র, মিরাট, এবং এই আরাতে।

কুমার সিং তখন তাঁর যৌবন হারিয়েছেন। মধ্য বয়সের সেই শারিরিক দক্ষতা আর নেই। সত্তরের কোঠা পার হতে চলেছেন। চোখের দৃষ্টি গভীর হলেও ঘোলাটে! দীর্ঘদেহ ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। মুখের চারপাশে বলীরেখার স্থায়ী স্বাক্ষর।

বৃদ্ধ তিনি দেহে। কিন্তু অন্তরে তখনো নবীন। অমিত বল যেন তাঁর দুই দীর্ঘ বাহুতে। কণ্ঠস্বরে যেন যাদু। বলিষ্ঠতায় ভরপুর। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ দৃপ্ত। জাতীয় ইতিহাসের এক চাঞ্চল্যকর চরিত্র হয়ে উঠলেন এই পড়তি বয়সেই। তাঁর অগ্রগতি সৃষ্টি করলো ইংরাজ শিবিরে এক দারুণ অনুরণন। একাধারে বার্ধক্য অন্যধারে নানাবিধ রোগজ্বালা—সমস্ত কিছুকেই উপেক্ষা করে তিনি অগ্রগামী হলেন।

কমিশনার টেলর লিপিবদ্ধ করে গেছেন:

"···I would mention in conclusion that Baboo is very old now, I regret to say, so ill that it is not probable that he will live long.

···Old age and ill health, however could not make him dispirited nor could they hold him in check and this was all the more remarkable in view

of his very daring military activities possible only for a man in full passion of youth and Vigour."

কুমার ছেড়ে এলেন তাঁর জগদীশপুরকে।

আরা শহরে বিদ্রোহীদের শিবিরে প্রাণ চঞ্চলতার সাড়া পড়ে গেল। তারা তাদের নেতা পেয়েছে! নির্ভাবনায় নিশ্চিন্তে কুমারের নির্দেশে তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে এবার!

কুমার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন বিদ্রোহীদের প্রস্তুতি। রাত ঘনিয়ে এলো। আকাশে তারা, অনুজ্জ্বল ম্লান তারা! অন্ধকারে কাঁথা মুড়ি দিয়ে সমস্ত আরা শহর যেন সুপ্ত, শান্ত, নিথর, মধ্যে মধ্যে শুধু স্নিগ্ধ বাতাসের ঝাপটা।

সেই তারকা খচিত আকাশের দিকে চেয়ে সেদিন হয়তো কুমার সিং দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছিলেন। ভাগ্যের ফের! না হলে, তাঁরই অন্তরঙ্গ বন্ধু টেলরের বিরুদ্ধে আজ তাঁকে অভিযান চালাতে হবে কেন? গভীর আত্মস্থ কুমার তাঁর পরিকল্পনা স্থির করে ফেললেন।

ক্রমশ ভোর হয়ে এলো।

সাথে সাথে আবার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো সিপাহীদের হুঙ্কার, "জ্যায়, কুমার সিং কি জ্যায়!"

ফাঁকা মাঠের উপর দমকা বাতাসের মতো কুমার সিং তাঁর সেনাদল নিয়ে ছুটে এলেন ইংরাজদের কোষাগার লুঠ করতে! শুরু হলো তুমুল গোলাবষণ। কিন্তু বন্যার জলের মতো সমস্ত কিছুকে ছিন্ন ভিন্ন করতে করতে সিপাহীরা ঝাঁপিয়ে পড়লো। স্বল্প আয়াসেই কোষাগার বিদ্রোহীদের দ্বারা লুণ্ঠিত হলো।

এরপর কুমার সিং ছুটলেন জেলের প্রাচীর চূর্ণ করতে।

ইংরাজ রক্ষীদের মৃতদেহ জমে উঠলো। শক্ত প্রাচীর মাটির সাথে সমান্তরাল হয়ে এলো।

বন্দীদের মুক্তিগানে চতুর্দিক মুখরিত।...

পাটনার ইংরাজ শিবিরে সংবাদ পৌছতে বিলম্ব হলো না।

ক্যাপ্টেন দানবার [ Dunbar ] কে পাঠানো হলো একদল সেনা সহ। অগ্রগামী কুমার সিংয়ের মুখোমুখি হলেন দানবার। আবার শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি, রণহুঙ্কার, আর্তনাদ। অশ্বারোহী কুমার সিং যুবকের দীপ্ততায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন যেন। হতবল দানবার শেষ শয্যা গ্রহণ করলেন। লাঞ্ছিত ইংরাজ সেনা মিলিয়ে গেল দৃষ্টির বাইরে।

কিন্তু মুষ্টিমেয় সিপাহী নিয়ে বিশাল বৃটিশ-সিংহের বিরুদ্ধে কতক্ষণ আর সংগ্রাম চালাতে পারবেন কুমার সিং ? তাঁর অগ্রগতি রুদ্ধ হলো। ইংরাজ সেনাপতি ভিসেঁণ্ট এয়ার [ Vıcent eyer ] এক বিশাল সেনাদল সহ তিন দিক দিয়ে বেষ্টন করে ফেললেন আরা শহরকে। গুজরাজগঞ্জের প্রাঙ্গণে আর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা হলো।

শিখ ও গুর্খা সেনার তীব্র আক্রমণে কুমার সিং বিব্রত হ'য়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এই ভাবে যুদ্ধ চালালে অল্পক্ষণেই তাঁর সমস্ত অনুচরই শেষ শয্যা গ্রহণে বাধ্য হবে। তাই কুমার পিছিয়ে এলেন। রক্তাক্ত আরা শহরে আবার ইংরাজ পতাকা উড়লো। রক্ত মাখানো ইউনিয়ন জ্যাক আবার দেখলো আকাশের মুখ।

অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে কুমার সিং তাঁর জগদীশপুরে ফিরে এলেন। রাজপ্রাসাদটিকেই দুর্গাকৃতি করে তুললেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন ইংরাজ আক্রমণের।

সেদিন পড়ন্ত বেলায় কামান গর্জে উঠলো। জগদীশপুরের ধূসর মাটি রাঙা হয়ে এলো। অগ্নিগোলক গুলি ছিটকে ছিটকে পড়তে থাকে কুমার সিংয়ের প্রাসাদে। কুমার সিংও দিলেন প্রত্যুত্তর। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার। কুমার সিং বুঝলেন, দুর্গের পতন অবশ্যম্ভাবী। চকিতে স্বল্প জীবিত অনুচর সহ বেরিয়ে এলেন তিনি।

ধূলি ধূসরিত জগদীশপুরের এলাকা পেরিয়ে আবার দূরে—বহু

দূরে মিলিয়ে গেলেন কুমার। বৃদ্ধের সর্বদেহ তখন কাঁপছে। আরক্তিম আকাশের দিকে চেয়ে তিনি যেন পরম পুরুষের কাছে শক্তি প্রার্থনা করলেন। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। জোনাকিরা জ্বলছে নিভছে। নীরবে সাজাচ্ছে রোশনাই। অক্লান্ত গতিতে ছুটছে ঘোড়া। কুমার সিং এগিয়ে চলেছেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।......

ইংরাজ সেনা মহা কলরবে এগিয়ে এলো।

জগদীশপুরের রাজপ্রাসাদ এক মহা শূন্যতায় হাহাকার করছে। প্রাচীরের প্রতিটি ইঁট খসিয়ে দেওয়া হলো। বিলাসের প্রতিটি সামগ্রীকে নিয়ে কাড়াকড়ি পড়ে গেলো। অবশিষ্ট সমস্ত ধনরত্নই লুণ্ঠিত হলো। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় জগদীশপুরের রাজপ্রাসাদ বিরাট এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'য়ে হাহাশ্বাসে ভরে উঠলো।...

পথশ্রমে ক্লান্ত কুমার সিং থামলেন। ঘোলাটে দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকাতেই তাঁর অন্তর আবার উৎসাহে পূর্ণ হয়ে উঠলো।...

ঐ তো সামনেই রোটাস [ Rhotas ] এলাকা। ওখানেই স্থাপিত হয়েছে বিপ্লবীদের আর এক শিবির! ওদের কাছেই আশ্রয় নিতে হবে তাঁকে! আবার নতুন উদ্যমে শুরু করতে হবে সংগ্রাম!...

কুমার সিং 'রোটাস' এলাকাতে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। এই সময় তিনি সুযোগ পেলেই ইংরাজ সেনার উপর চোরা গোপ্তা আক্রমণ শানাতেন। এমন কি ইংরাজ সেনার অগ্রগতি রুদ্ধ করবার জন্য 'বাদশাহী সড়কের' [ Grand Trank Road ] খানিকটা উড়িয়ে দিয়ে ছিলেন পর্যন্ত।

কিন্তু রোটাস্ অঞ্চলেও কুমার সিং অধিক দিন অবস্থান করেননি। আরো অধিক সংখ্যক সিপাহী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন 'রেওয়া' [ Rewa ] রাজ্যে। রেওয়ার আধপতি তাঁর আত্মীয়। নিশ্চয় তিনি সাহায্যে করবেন কুমারকে!

মির্জাপুর জেলার গভীর জঙ্গল পথ ভেঙ্গে কুমার সিং এসে দাঁড়ালেন রেওয়ার দ্বারে।

কিন্তু তাঁকে হতাশ হতে হলো। রেওয়ার শাসনকর্তা স্বয়ং তোপ দাগতে লাগলেন কুমার সিংয়ের সেনাদলের উপর।

হতাশ হলেন যুদ্ধে। কুমার আবার ফিরে চললেন।...চলতে চলতে উপস্থিত হলেন 'বান্দা'তে। সেখান থেকে 'কলপি'।

কলপি তখন বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাঁটি। গোয়ালিয়র থেকে দলে দলে সিপাহীরা তখন এখানে জমায়েত হচ্ছে। প্রখ্যাত নানা সাহেবের ভ্রাতা বালারাও পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছেন এখানে।

কুমারসিংকে নেতৃত্বদানে অনুরোধ জানানো হলো। বিশাল এক সেনাদলসহ নব উদ্যমে কুমার সিং কান্দাপুরে ইংরাজ ঘাঁটি আক্রমণ করলেন। কিন্তু অধিকতর রণকৌশলের অধিকারী উন্নততর অস্ত্র সহ ইংরাজ সেনা সেই আক্রমণ প্রতিহত করলো।

পরাজিত কুমার সিং ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে চললেন। অনেক পথ-প্রান্তর অতিক্রম ক'রে উপস্থিত হলেন কানপুরে। কানপুর ত্যাগ করে লক্ষ্ণৌতে। এখানে অযোধ্যার বালক নবাব অপেক্ষা করছিলেন তাঁরই জন্য। রাজকীয় সমাদর পেলেন কুমার সিং। আজমগড়ের ফরমান দেওয়া হলো তাঁকে। আর সাহায্য করা হলো নগদ দশ সহস্র মুদ্রা।

কিন্তু আসলে আজমগড় তখন সম্পূর্ণভাবে ইংরাজদের করতলগত। কুমার সিং এই শহর আক্রমণ করলেন। কর্ণেল মিলম্যান বাধা দিলেন, কিন্তু পরাজিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলেন।

কুমার সিং আজমগড়ের অধিকার পেলেন।

আজমগড়ের পতন ইংরাজদের মধ্যে বিস্ময় ও ত্রাসের সঞ্চার করলো। কারণ, এটি ছিল ইংরাজদের একটি শক্ত ঘাঁটি। পাঠানো হলো সেনাপতি ডামস্‌কে। কিন্তু কুমার সিংয়ের হাতে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ডামস্‌ও ফিরে গেলেন।

এলাহাবাদ হেডকোয়ার্টার থেকে অনুসন্ধান করা হলো, বার বার

সরকার পক্ষের এমন বিপর্যয়ের কারণ কি! এবার এলেন লর্ড মার্ককের। তিনি সঙ্গে নিলেন এক ডিভিশন পাঠান গোলান্দাজ।

বৃটিশ কামানের অগ্নি বমন শুরু হয়। আজমগড়ের উপর চড়াও হয়েছেন লর্ড মার্ক। যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর।...মার্ক খবর পাঠালেন, কুমার সিংকে কিছুতেই কাবু করা যাচ্ছে না। আরো সৈন্যের দরকার! আরও একদল সৈন্যসহ আজমগড়ের রণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন স্যার এডওয়ার্ড লুগার্ড।

কুমার সিংয়ের পরাজয় ঘনিয়ে এলো। আবার এক বিচিত্র উপায়ে আত্মগোপন করলেন তিনি। আবার ফিরে চললেন তাঁর জন্মভূমি বিহারের দিকে।

এই যাত্রাপথ দীর্ঘ, দুর্গম। কুমারের সমস্ত শক্তি যেন তিলে তিলে শেষ হয়ে আসছে। বার্ধক্যের জ্বালা সর্ব দেহে। অবসাদে থিতিয়ে আসছে প্রাণ শক্তি। তবু থেমে পড়লে তো চলবে না! তাঁকে যেতেই হবে। তাঁকে লড়তেই হবে! এই দেহের শেষ রক্তবিন্দু নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

হ্যাঁ, বিকল্প আছে। সেই বিকল্প মৃত্যু! সেই মৃত্যুরই যেন ছায়া দেখতে পেলেন কুমার!

ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে তিনি এসে দাঁড়ালেন শিউপুর ঘাটে। সামনেই বয়ে চলেছে গঙ্গা। স্বচ্ছ, পুণ্যতোয়া ভাগিরথী। যেন তাঁকে হাতছানি দিচ্ছে। হিমশীতল আলিঙ্গন করার জন্য!

নৌকায় চেপে গঙ্গা পার হতে লাগলেন কুমার। কল্ কল্ ছল্ ছল্ শব্দে সমুদ্র সন্ধানে তীরবেগে জলধারা ছুটে চলেছে। বুঝি কুমারকেও সঙ্গী করে নিতে চায়! ভবের খেলা বোধ হয় শেষ হয়ে এলো। এবারে শান্তি! সমুদ্র প্রশান্তি চাই তাঁর!.....

হঠাৎ ইংরাজ বন্দুক গর্জে উঠলো। গঙ্গার অপর পার থেকে কোন শ্বেতাঙ্গ যেন নিশানা ক'রে গুলি ছুঁড়েছে কুমার সিংয়ের দিকে!

ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন কুমার। তাঁর বাঁ হাতের দুটো আঙুল খেতলে দিয়ে গুলিটা ছিটকে বেরিয়ে গেছে। কুমারের দু'জন অনুচর ছুটে এলো। আঙুল দুটো চেপে ধরলো। কুমার নিষেধ করলেন। বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। তাঁর রক্ত ঝরছে! বড় ঘন রক্ত! টপ্ টপ্ ক'রে ঝরে পড়ছে পাটাতনে!

নিজেরই রক্ত দেখতে দেখতে হঠাৎ আবার যেন উদীপ্ত হয়ে উঠলেন কুমার সিং। কটি থেকে ছুরি বের করে আনলেন। এক লহমায় ক্ষত বিক্ষত আঙ্গুল দুটো ছিন্ন ক'রে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করলেন।···

কুমারের অনুগামীরা বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় হতবাক!···

আর সংগ্রাম চালাবার মতো শক্তি কুমারের ছিল না। তাঁর দলের লোকেরাও একে একে বিদায় নিচ্ছে। মাত্র দু'হাজার প্রায় নিরস্ত্র সিপাহী নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁরই জগদীশপুরে!

ইংরাজ সেনার ছাউনি পড়েছে সেখানে সারি সারি। আহত সিংহের মতো হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কুমার সিং। যুদ্ধ হলো ক্ষণকাল!······

তাঁর প্রিয় জগদীশপুরের গেরুয়া মাটিকে লাল করে কুমার যেন পরম তৃপ্তিতে সমুদ্র-প্রশান্তিকে আলিঙ্গন করলেন।

১৮৫৮ সালের ২৪শে এপ্রিল ভোর হলো। পাখিরা বৈতালী গাইলো। বাতাসের নিঃস্বনে কারা যেন আনন্দে ফিস ফিস করে বলছে—

কুমার সিং ফিরে এসেছেন। আর কখনো তিনি ত্যাগ ক'রে যাবেন না। তাঁর প্রিয় জগদীশপুরকে।

বিহারের পর কানপুর।

কানপুরের নেতৃত্বে ছিলেন নানা সাহেব ও তাঁর বিশ্বস্ত সহচর আজিমোল্লা খান। ব্যক্তিত্বে ও শিক্ষা দীক্ষায় আজিমোল্লা ছিলেন অনেক উচ্চস্তরের মানুষ। ইংরেজি ও ফরাসীতে অনর্গল কথা বলতে পারতেন তিনি। বিদ্রোহের আগুন যখন প্রায় প্রজ্বলিত কানপুরে

তখন শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের সংখ্যা নেহাৎ মুষ্টিমেয়। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের সংখ্যা প্রচুর। তিন রেজিমেণ্ট পদাতিক ও দুই রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী। অধিনায়কত্বে ছিলেন অভিজ্ঞ বৃটিশ সেনানী স্যার হুগ হুইলার!

দিল্লী এবং মিরাটের সংবাদ কানপুরে এসে পৌঁছলো। সিপাহীরা আরো শুনলো, বিরাট একদল ইংরাজ বাহিনী নাকি এসে তাদের অস্ত্র শস্ত্র কেড়ে নেবে। কানপুরের সিপাহীরা স্বভাবতই চঞ্চল হয়ে পড়ে।

দুর্ভাগ্যবশত এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাতে সিপাহীরা ইংরাজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার মানসিকতা সঞ্চয় করে। সিপাহীদের বাজারে পচা ও দুর্গন্ধ যুক্ত আটা এনে রাখা হয়েছিল। গুজব রটে গেল, ঐ আটাতে গরু এবং শকুরের চর্বি মাখানো আছে। সিপাহীদের চাপাটি বানানো হবে ঐ আটাতে।

সিপাহীরা ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠে।

সভয়ে তারা দেখলো, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু ইউরোপীয় সৈনিক ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলছে কানপুরকে। একজন মাতাল শ্বেতাঙ্গ প্রথম সিপাহীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। সাথে সাথে সশস্ত্র সিপাহীরা নেমে পড়ে পথে। শুরু হয় তাদের বিদ্রোহ।

হুগ হুইলার এবং বহু পদস্থ ইংরাজ অফিসার তাঁদের পরিবার সহ নানা সাহেবের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সিপাহীরা প্রথমেই ট্রেজারি লুঠ করলো। জেল ভেঙ্গে কয়েদিদের মুক্তি দিল। তারপর রওয়ানা দিল দিল্লী অভিমুখে। দিল্লী যাবার পথে কল্যাণপুরে অবস্থান করলো তারা। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা বীর তাঁতিয়া তোপীর আহ্বানে নানা সাহেব ও সদলবলে এগিয়ে এলেন সিপাহীদের সাহায্যে। কল্যাণপুর থেকে সিপাহীরা আবার কানপুরে ফিরে আসে। তারা চিৎকার করে জানায় নানা সাহেবের নেতৃত্বে আবার তারা মারাঠা সাম্রাজ্যকে গড়ে তুলবে।

নানা সাহেবের এই রূপান্তরে তাঁর আশ্রিত ইংরাজদের মধ্যে দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়। অর্ধেকের বেশী স্ত্রী ও শিশু। আতঙ্কে তারা ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে। সারাদিনে মাত্র একবার আধপেটা খেয়ে পড়ে আছে তারা। মরিয়া হয়ে কয়েকজন ইংরাজ যুবক সিপাহীদের সাথে যুজতে গেল। বন্দুক তোলবার আগেই বুলেটে বুলেটে তাদের দেহ ছিদ্র ছিদ্র হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন হ্যালিতে ও মারা গেলেন এ ভাবে। অনেকে প্রচণ্ড দাবদাহে 'সান স্ট্রোক' এ মারা গেল। জল কষ্টে মুর্চ্ছা গেল কিছু সংখ্যক নারী ও শিশু। জন ম্যাকলিকপ নামক এক ইংরাজ জল আনতে গিয়ে সিপাহীদের হাতে প্রাণ দিলেন। মেজর লিণ্ডসে মারাত্মক আঘাত পেলেন সিপাহীদের গোলায়। চিকিৎসার অভাবে দুদিনের মধ্যেই মারা গেলেন তিনি। এই ভাবে দিনের পর দিন পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে নারকীয় যন্ত্রণার মধ্যে শেষ হয়ে যেতে লাগলেন কানপুরের সম্ভ্রান্ত ইংরাজরা।

ইতিমধ্যে নানা সাহেব কানপুরে তাঁর সরকার গঠন করে ফেলেছেন। টিকা সিং হলেন তাঁর সেনাপতি। ২৭ তারিখে পরাজিত, লাঞ্ছিত ইংরাজরা সপরিবারে নদী পথে পালাতে গিয়ে প্রায় সকলেই সিপাহীদের হাতে নিহত হল। এতবড় নৃশংস হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই ঘটেছে। প্রতিটি নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হয়। অতল জলে তলিয়ে গেল শত শত প্রাণ। যারা সাঁতার কাটবার চেষ্টা করছিল, বিদ্রোহীদের গুলিতে প্রাণ দিল মাঝ নদীতেই। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড নানা সাহেবকে কলঙ্কিত করছে।

অবশ্য কানপুর বেশীক্ষণ সিপাহীরা ধরে রাখতে পারেনি। ইংরাজ, গুর্খা ও শিখ সৈন্যদের তীব্র আক্রমণে বিদ্রোহীরা ক্রমশই পিছু হটে এসেছে। নানা সাহেব স্বয়ং গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সাঁতরে উপস্থিত হন অযোধ্যায়।

বিঠুরে নানা সাহেবের সুরম্য প্রাসাদ ইংরাজদের তোপের মুখে

গুঁড়িয়ে যায়। সেনাপতি নেইল প্রায় বিধ্বস্ত কানপুরের ভার গ্রহণ করলেন।

কানপুর থেকে অযোধ্যা।

বিলাসিতার অবগাহনে অযোধ্যা। নবাব ওয়াজেদ আলী জীবনে শুধু তিনটি বস্তুকেই চিনতেন—নারী, সুরা ও সংগীত। জেনারেল আউটরাম তখন অযোধ্যায় বৃটিশ রেসিডেন্ট। তিনি নবাব সম্পর্কে লিখে পাঠালেন, "The King's days and nights are passed in the female apartments, and he appears wholly to have resigned himself to debanchery, dissipation and low pursuits."

শাসন ব্যাপারে অযোগ্যতার দোহাই দিয়ে ইংরাজ সরকার অযোধ্যাকে গ্রাস করে নেন। আউটরামের পর সেখানে এলেন ক্যাভারলি জ্যাকসন। জ্যাকসনের ব্যবহারে অযোধ্যার পদচ্যুত নবাবসহ প্রতিটি সাধারণ লোকও বিশেষ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। এর উপর বৃটিশ রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বেড়েই চলেছিল অসম্ভব করভার।

জ্যাকসনের পর এলেন স্যার হেনরী লরেন্স। মানুষ হিসাবে লরেন্স সমসাময়িক বৃটিশদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না। লরেন্স অযোধ্যাবাসীর অসন্তোষের কারণগুলি দূর করতে চাইলেন।

কিন্তু বিক্ষোভের ঝড় তখন দানা বেঁধে ফেলেছে।

১৮৫৭ সালের ১৮ই এপ্রিল, হেনরী লরেন্সের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালানো হলো। একটা পাথরের চাঁই ছোড়া হয়েছিল তাঁকে লক্ষ্য করে। দৈবক্রমে রক্ষা পেয়ে গেলেন হেনরী।

হেনরী এতেও ক্রুদ্ধ না হয়ে সমস্ত সিপাহীদের শান্ত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। এক বিশাল সেনা-সমাবেশে তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, ইংরাজ শাসন ভারতবর্ষের মুখ্যত কোন ক্ষতি করেনি। ইংরাজরা ভারতবর্ষের ধর্মীয় অত্যাচার বন্ধ করেছে।

সম্রাট ঔরঙ্গজী বহিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছেন। আবার রণজিৎ সিং মুসলীমদের সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু ইংরাজ সরকার হিন্দু মুসলীম তুই সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

লরেন্সের বক্তৃতায় চিঁড়া ভিজলো না।

সিপাহীরা ও সমস্ত বড় কথায় বিশ্বাসী হতে রাজী নয়। ওদের ধূমায়িত বিক্ষোভ বিস্ফোরণ ঘটাবেই।

দিল্লী, মিরাট ও কানপুরের বিদ্রোহের সংবাদ অযোধ্যাতে এসে পৌঁছলো। সাথে সাথে বিরাট একদল ইউরোপীয় বাহিনী লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে ছুটলো কানপুরের উদ্দেশ্যে। ফলে হেনরী আরো দুর্বল হয়ে পড়লেন।

৩০শে মে একদল সিপাহী প্রথম বিদ্রোহী হয়ে উঠে। কিন্তু হেনরী লরেন্স অতি দ্রুত তাদের দমন করেন। তিনি দ্রুত সিপাহী-দের বিভিন্ন শিবিরে ভাগ করে দেন। তাদের জটলা বাধাতে বা আলোচনা করতে কোন সুযোগই দিতে চাইলেন না তিনি।

তবু শেষরক্ষা হলো না।

প্রচণ্ড পরিশ্রমে হেনরী অসুস্থ হয়ে পড়লেন।···আর সিপাহীরা হঠাৎ একসঙ্গে বিক্ষোভের আগুনে ফেটে পড়লো। অযোধ্যার বারোটি জেলা জুড়েই শুরু হলো তাণ্ডব-নর্তন। এলাহাবাদ, বেনারস থেকেও 'মার মার' রবে ধেয়ে আসতে থাকে বিদ্রোহীরা। ফিরোজাবাদের কোষাগার সিপাহীরা লুঠ করে নেয়। বিধ্বস্ত ইংরাজ বাহিনী নৌকা যোগে পালিয়ে আসছিল। তাদের তুটো নৌকা বিদ্রোহীরা ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এর ফলে ফিরোজাবাদের কমিশনার কর্ণেল গোল্ডনে আরো বহু ইংরাজসহ প্রাণ হারান।

অবশ্য স্থানীয় সামন্ত ও জমিদারা বহু ইংরাজকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেন। এঁদের মধ্যে রাজা মানসিংহের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়।

অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহী সিপাহীরাও তাদের অফিসারদের উপর অহেতুক অত্যাচার করতে চায়নি। বরং, তাঁদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

ডঃ বারট্রাম তাঁর স্ত্রীর কাছে লিখেছিলেন, "সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়েও চোখের জল ফেলেছে। ওরা আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেছে নিরাপদ আশ্রয় পর্যন্ত। ভারতীয় হাবিলদারেরা বিদায় নেবার আগে বার বার সেলাম জানিয়েছে।..."

হেনরী লরেন্স তাঁর অসুস্থ দেহেই বিদ্রোহ দমনে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু চিনহাটের যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যরা সিপাহীদের হাতে বিধ্বস্ত হয়। লরেন্স বিদ্রোহীদের শক্তির গভীরতা পরিমাপ করতে ভুল করেছিলেন। বহু ইউরোপীয়ান এই যুদ্ধে নিহত হয়। অজস্র গোলাবারুদ বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়।

এই ভয়াবহ পরাজয় লক্ষ্ণৌতে ইংরাজদের মধ্যে দারুণ ভীতির সঞ্চার করে। বহু ইংরাজ নারী ও শিশু তাদের আবাস ত্যাগ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটতে থাকে। শত শত গৃহ পালিত পশু বাঁধনহারা অবস্থায় লক্ষ্ণৌর জনশূন্য রাস্তায় ঘুরতে থাকে। ইংরাজরা তাদের অধিকাংশ আত্মীয় পরিজনসহ সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেয়। অপেক্ষা করতে থাকে সিপাহীদের আক্রমণের। দুধের অভাবে সদ্যজাত শিশুদের কষ্টের অন্ত থাকে না। একটি শিশু দুধ না পেয়ে মারা গেল। সেই অবরুদ্ধ দুর্গের ভয়াবহ চিত্র কয়েকজন ফরাসী ও জার্মান ব্যক্তিও প্রত্যক্ষ করে গেছেন। ইটালীয়ান ভাস্কর সিগনর বারসোতেলি দুর্ভাগ্যবশত সেই "মানুষ খোয়াড়ে" গিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মতে, এমন নারকীয় পরিবেশ থেকে কোন মানুষ আর সুস্থ চিন্তাশক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না।

শুরু হলো লক্ষ্ণৌ দুর্গের উপর সিপাহীদের তীব্র আক্রমণ। মেজর গল ছদ্মবেশে এলাবাদে যাবার চেষ্টা করলেন, সাহায্যের আর্জি পৌঁছে দেবার জন্য। কিন্তু পথে তিনি ধরা পড়ে যান। তাঁকে হত্যা করা হয়।

কিন্তু আত্মরক্ষার যুদ্ধে হেনরী লরেন্স অসামান্য দক্ষতা দেখালেন। বিদ্রোহীরা দুর্গের কাছাকাছি আসতেও সক্ষম হলো না। হাসপাতাল, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি স্থানগুলি রক্ষা করতে থাকে বিশ্বস্ত শিখ বাহিনী। গোমতি নদীর ধার ঘেঁষে উভয় পক্ষে চললো তুমুল লড়াই। কামানের গোলায় বাতাস ভারী, আকাশ ধোয়ায় অন্ধকার। মৃতদেহের পাহাড় জমেছে চারধারে। পচা দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে।

ঠিক এমন মরণপণ যুদ্ধে বীর সেনানী হেনরী লরেন্স মর্টারের গোলায় মারাত্মক ভাবে আহত হলেন। রক্তাপ্লুত হেনরী ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন "আমি আর কতক্ষণ জীবিত থাকতে পারবো? [ How long have I to live ? ]

ডঃ ফেয়ার উত্তর দিলেন "প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা [ About forty hours. ]"

হেনরী লরেন্স মারা গেলেন। মৃত্যুর পুর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

হেনরীর মৃত্যুর পর আরো বহু ইংরাজ প্রাণ হারালেন অতর্কিত বুলেটের আক্রমণে। রক্ত আমাশায় ভুগে প্রাণ হারালেন প্রধান ইঞ্জিনীয়র এনডারসর।

বিদ্রোহীদের অনবরত ব্যাটারী চার্জে দুর্গের দেওয়ালে ক্রমশই চিড় ধরতে থাকে।...নিশ্চিন্ত পরাজয়ের মুখে দাড়িয়ে অন্তিম লড়াই চালিয়ে যায় ইংরাজ পক্ষ। ঠিক এমনি সময় সেনাপতি হ্যাডলক তাঁর বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিদ্রোহীদের পশ্চাৎভাগে। তিনি ধেয়ে এসেছেন কানপুর থেকে। পথে প্রতিটি যুদ্ধে তিনি সিপাহীদের পরাজিত করেছেন। স্যার কলিনও এসে পড়লেন তাঁর বাহিনী নিয়ে।

সিপাহীরা বিধ্বস্ত হলো। মতিমহল পর্যন্ত প্রতিটি প্রাসাদ ইংরাজরা তোপের মুখে উড়িয়ে দেয়। বিদ্রোহীদের নেতারা একের

পর এক মৃত্যু বরণ করতে থাকেন বীরের মতো যুদ্ধ করে। অর্ধমৃত রুগ্ন দুর্গবাসীরা মুক্তির আনন্দে জড়িয়ে ধরে পরস্পরকে।

কানপুরের পতন ঘটেছে।

লক্ষ্ণৌ সিপাহীদের হস্তচ্যুত হয়েছে।

দিল্লী ইংরাজরা পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়েছে।

ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁতিয়া তোপী স্থান থেকে স্থানান্তরে আশ্রয় নিচ্ছেন।...তারপর সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ হারালেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ। ধৃত হলেন তাঁতিয়া তোপী। ফাঁসি হলো তাঁর। নানা সাহেব পালিয়ে গেলেন নেপালের জঙ্গল পথ ধরে। আর তাঁর সম্পর্কে কিছু জানা গেল না।

সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হলো। ইংরাজরা ভারতীয় সিপাহীদের রক্তে পৈশাচিক উল্লাসে স্নান করে নিলো।

কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একশত বৎসরের শাসনের অবসান ঘটলো। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণার দ্বারা ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার সরাসরি নিজের হাতে গ্রহণ করলেন। লর্ড ক্যানিং হলেন তাঁর প্রথম প্রতিনিধি বা ভাইসরয়।

অতঃপর স্থির হলো, ইংরাজ কর্তৃপক্ষ দেশীয় রাজাদের সাথে 'ভদ্রলোকের চুক্তিগুলি' মেনে চলবেন। ভারতীয়দের ধর্ম ব্যাপারেও নাক গলাতে আসবেন না। ভারতীয় সিপাহীদের বৈষয়িক উন্নতিকেও তাঁদের দৃষ্টি থাকবে সহানুভূতি সম্পন্ন।

## ॥ সতেরো ॥

দিল্লী থেকে ফিরে এসেছি।

ফিরে এসেই দেখলাম, ফ্রান্স থেকে আর একখানা চিঠি এসে গেছে। তুলোর চিঠি।

তুলো লিখেছে:

"তোমার গত চিঠিতে জানতে পারলাম, তুমি নাকি একখানা বই লিখছো। বিষয় বস্তুতে আকৃষ্ট হলাম। আমি তো বাংলা জানি না। জানলে কী ভালোই না হতো!...

আর একটা ভালো খবর আছে। আমি এই প্রথম ফ্রান্সের বাইরে বেড়াতে যাবার সুযোগ পাচ্ছি। বাবার সঙ্গে যাচ্ছি ম্যানিলায়। ফিলিপাইনের রাজধানী। বাবা ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় এক বৎসর অধ্যাপনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এশিয়ায় যাচ্ছি। ভারতবর্ষের অনেকটা কাছে। যদি পারি, একবার নিশ্চয় বাংলা দেশে যাবো!...

বিপ্লবের ইতিকথায় তুমি কি স্বাধীনতাকামী জাতিগুলির কথা লিখবে না? যদি লিখতে পারো, ভালো হবে। লিখতে পারো ফিলিপাইনের কথা।

প্রকৃত অর্থে ফিলিপাইন আজো পরাধীন। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক—দু'দিক দিয়েই আমেরিকার কাছে সে দাসখত লিখে বসে আছে।

এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত। বনজ সম্পদের তো তুলনাই হয়না!...আগে ছিল স্প্যানিশদের দখলে। এখন এসেছে মার্কিনদের বুটের নীচে। প্রেসিডেণ্ট ফার্ডিন্যাণ্ড মার্কস মার্কিন দর্পণেই নিজের মুখ দেখতে ভালোবাসেন।

কিন্তু তাই বলে জাতি হিসাবে ফিলিপাইনরা ক্লীবত্বে ভুগছে না। আন্দোলনের বিস্তৃতি এখানেও আছে। দেশের বুদ্ধিজীবীরা

আমেরিকার তাঁবেদারীর অবসান ঘটাতে আসরে নেমে পড়েছেন। ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ীরাই ক্রমশ সংঘবদ্ধ বিক্ষোভে উদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

'ম্যানিলা সানডে টাইমস' লিখেছে, এশিয়ার প্রতিটি দেশ মুক্তি যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করলেও একমাত্র ফিলিপাইন এখনো সাম্রাজ্য-বাদীদের মুঠোর মধ্যে দমবন্ধ অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

এই সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদ!...

সুখের বিষয় ফিলিপাইনের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন জানাচ্ছেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবীরাও। তারা সেনেটে প্রশ্ন তুলেছেন ফিলিপাইনের বুকে মার্কিন জঙ্গী দাপটের অর্থ কী? কেন ফিলি-পাইন থেকে সমস্ত সৈন্য সরিয়ে এনে আমেরিকা তাকে মুক্তি দেবে না?

মজার কথা শোন, ফিলিপাইনে অবস্থিত মার্কিন ফৌজের সমস্ত খরচ খরচা ফিলিপাইন অধিবাসীদেরই বহন করতে হয়। এর জন্য প্রতি মাসে ব্যয় হয় দুই লক্ষ ডলার। এমন চমৎকার ব্যবস্থা আমেরিকা আর কোথায়ও করতে পারেনি। পারলে সে ভিয়েত-নামের যুদ্ধ আরো কয়েক বৎসর চালাতে পারতো।

আজকের আমেরিকার আসল ব্যথার কারণ, ডলার দুর্বল হয়ে পড়ছে; এবং দেশের মানুষ ক্রমশঃই সচেতন হয়ে উঠছে।..."

তুলোর চিঠি শেষ করে ড্রয়ারে রেখে দিই।

বাইরের আকাশে মেঘ জমেছে। আজ আষাঢ়স্য প্রথম দিবস। মন আমার তাই বিরহী হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। আবার সময় সময় স্বপ্ন দেখছি সবুজের। রিম ঝিম্ রিম ঝিম্ বৃষ্টি হবে। ব্যাঙের দল রব তুলবে ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙর। একহাঁটু কাদায় নেমে আসবে কৃষক পরিবার।...তারপর একদিন ছোট ছোট চারাগাছে লাগবে দোলা। সবুজের হিল্লোলে মাঠ ঘাট স্নিগ্ধ। বাতাসের নিঃস্বনে ওরা দুলছে। ঢেউয়ের মতো দুলছে আজকে দিনের সবুজ কিশলয়ের দল!

## ॥ আঠারো ॥

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের সমাপ্তিতে বর্ষার রিম ঝিম্ রিম ঝিম্ সুর মূর্ছনা। গায়ে রেইনকোট চাপিয়ে সাইকেল ছুটিয়ে চলেছি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। কেষ্ট সায়রের কালো গভীর জলে অজস্র মুক্তো যেন টুপ্ টুপ্ নাচছে। কিছু দূরে গোলাপ বাগ,—বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ওখানেই হয়। পরিবেশের বিচিত্রতায় শান্তি নিকেতনের সমকক্ষ। আকাশ স্পর্শী দেবদারু, শিশু, নিম, অর্জুন, বট, অশ্বত্থ ইত্যাদি মহীরুহের দল গত শতকের নাভিমূল থেকে উত্থিত। এই দশকে শিক্ষাবিদের দল এখানে আশ্রমিক পরিবেশ রচনা করতে চাইছেন।

কিন্তু যুগের তপ্ততায় সেই পরিবেশ খুঁজে পাবার আকুতি অলীক স্বপ্ন মাত্র। আজ আমি যাচ্ছি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংসদের নেতার সাথে দেখা করতে। অশান্ত তারুণ্য আজ যুক্তির আলোকে প্রাচীনদের ছানি পড়া দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে বার বার। সেই আলোক উচ্ছল ঢেউয়ের মেলা দেখে এলাম ফ্রান্সে। দেখছি তার খণ্ডিত অভিপ্রকাশ বাংলার বিভিন্ন স্থানেও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা ধরেছেন, আমাকে বর্ণনা করতে হবে ফরাসী ছাত্রদের সাম্প্রতিক বিপ্লবের রূপরেখা।

কি বলবো ?·· অনেক কিছু যে ভাববার আছে! সব কিছু কি গুছিয়ে বলতে পরবো ?

মনে হয়, আজকের যুগে আমাদের স্থান রাস্তাতেই। গজদন্ত মিনার আর কল্পনাকে ভূমিসাৎ করে দিচ্ছে রূঢ় বাস্তব। প্যানপেনে কান্না আর দুঃখবাদের সময় এটা নয়। সমস্ত রকম দুঃখের কারণ বেছে বের করতেই রাস্তায় নেমে পড়েছি আমরা। আর আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে তরুণরা,—ছাত্ররা। মাথায় শিরস্ত্রাণ এঁটে হাতে

লাঠি নিয়ে দাপাদাপি করলেই মানুষগুলিকে আর ভিন্ন মুখী করা যাবে না। বরং, এদের স্লোগানে চমকিত হ'য়ে উঠবে ঐ দূরের শহীদ বেদীটা। এমন ভাবেই আজকের দুরন্ত যৌবন বিপ্লবী আদর্শে ক্রমশ সংবদ্ধ হ'য়ে উঠেছে।...

ভারতবর্ষে ফিরে একটা জিনিস আমাকে সত্যই বিস্মিত করছে! এ দেশের অনেকেই ফ্রান্সের সাম্প্রতিক ছাত্র বিপ্লব সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছেন। তাঁদের ধরণা, এই প্রচণ্ড ছাত্র-শ্রমিক নেতৃত্ব দিয়েছিল ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি! অথচ প্রকৃত ঘটনা একে বারে ভিন্ন; বরং ফরাসী কমিউনিষ্ট নেতারাই এই বিপ্লবকে পিছন থেকে ছুরি মারতে চেয়েছিলেন!

এ কথা বাস্তব সত্য যে, অনেক সময়ই পার্টি নেতারা তরুণদের অগ্রগতিকে ভয়ের দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁদের 'দাদাইজম' রক্ষাকল্পে মরিয়া হ'য়ে উঠেন। ফ্রান্সেও ঠিক তাই ঘটেছিল। তরুণদের বিপ্লবী ভূমিকা দেখে 'সামাল সামাল' রব তোলেন অনেক তথাকথিত জবরদস্ত কমউনিষ্ট নেতারাও। তার উপর যখন বিপ্লবী ছাত্র সমাজ জাগিয়ে তুললো বিপ্লবী শ্রমিক সমাজকেও, তখন এই সমস্ত 'পার্টি-দাদারা' নিজেদের মসনদ হারাবার ভয়ে একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠলেন। সম্পূর্ণ প্রতিক্রীয়াশীলদের মতোই হাত মেলালেন দাগল সরকারের সাথে। ফরাসী কমউনিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা জর্জ-মার্শে তো বিপ্লবী ছাত্রদের রীতিমত গালাগাল দিয়ে বললেন, 'এ সমস্তটাই প্রগতি বিরোধীদের চক্রান্ত! এরা আবার শ্রমিকদেরও বিপ্লব শেখানোর ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে!'

ছাত্ররা যে আবার কোন দিন শ্রমিকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সত্যই বিপ্লব করতে পারে, ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি এমন ভাবতেও পারেনি! পার্টির নেতৃত্ব ছাড়া যে আবার বিপ্লব সম্ভব পর, তা প্রত্যক্ষ ক'রে ফরাসী কমউনিষ্ট নেতারা গাত্রদাহে ছটফটিয়ে উঠলেন!...সেই বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের নেতা ড্যানিয়েল কোন-বেণ্ডিটের নামে কম কুৎসা রটানো হয় নি। তিনি বিদেশী বলে তাঁর ভূমিকাকে

হেয় করে দেখবার চেষ্টা করেছেন অনেক তথা কথিত বামপন্থী নেতা। কিন্তু কেন-বেণ্ডিটের চিন্তার ও কার্য ধারার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাবান হবো যদি তাঁর ভূমিকা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারি!

বেণ্ডিট দেখিয়েছেন, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতেও ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হ'য়ে উঠছে। বুর্জোয়া সমাজের শোষিত শ্রমিক বানাতেই যেন এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গুলি বড় বড় গাল ভরা আদর্শের ধ্বজা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বস্তু বিজ্ঞানের কৃতি ছাত্র যখন তার ভবিষ্যতের কথা ভাবে, তখন সে চমকে ওঠে। সে বুঝতে পারে, একদিন তাকে হাইড্রোজেন বোমা তৈরীর কাজে নিযুক্ত করা হবে। রসায়নের ছাত্র জানে, তাঁর মৌলিক আবিষ্কার কিছু থাকলে যে কোন ফার্ম মোটা টাকার বিনিময়ে সেটি আত্মসাৎ ক'রে নেবে; অথবা, রাষ্ট্র তাকে এনে পিঞ্জরাবদ্ধ করবে কোন এক রাষ্ট্রিয় গবেষণাগারে। সে তখন বিচ্ছিন্ন। এমন কি, নিজের শ্রমলব্ধ বস্তু থেকেও সে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়বে ক্রমশই। এই বিচ্ছিন্নতার জ্বালাই এ যুগের সব চাইতে বড় অভিশাপ।

ছাত্র সমাজের কাছে শোষণতন্ত্রের এই স্বরূপ অত্যন্ত নগ্ন ভাবেই ধরা দিয়েছে। তাই তারুণ্য আজ বিদ্রোহী। তাদের বৈপ্লবিক প্রতিবাদে মুখর হ'য়ে উঠেছে তমাম দুনিয়া। প্যারিসে, টোকিওতে, নিউইয়র্কে, ক'লকাতায়, রোমে, মাদ্রিদে, কলাম্বিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী ছত্ররা রাস্তায় নেমে এসেছে। কারণ, রাস্তায় না নেমে এলে এ যুগের কোন দাবী প্রতিফলিত হয় না।

ছাত্র নেতা ড্যানিয়েল কোন-বেণ্ডিট ফরাসী ছাত্রদের বৈপ্লবিক চরিত্র সুন্দব ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ছাত্রদের এই সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ কোন চাকুরি লাভের জন্য নয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনবার জন্যও নয়। এই বিপ্লব সামগ্রিক ভাবে ফরাসী সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়েছে। চেয়েছে শ্রেণী বৈষম্যের অবসান এবং শোষণ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

ছাত্র বিপ্লবের প্রথম ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ২৯শে মার্চ ১৯৬৮ সাল। শ্রমিকদের সাথে হাত মিলিয়ে ছাত্ররা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১লা এপ্রিল ফরাসী ছাত্ররা সমাজ বিদ্যা পরীক্ষা বর্জন করে। কারণ, আজকের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য সমাজবিদ্যা ধনতন্ত্রকে মদত দেবার একটা প্রচ্ছন্ন হাতিয়ার মাত্র।

ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়লো অনেক আন্তর্জাতিক দাবী নিয়েও। তারা প্রতিবাদ জানালো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে, ভিয়েতনামের প্রতি জানালো নিজেদের অকুণ্ঠ সমর্থন, জানালো রেড রুডি এবং জার্মান এস. ডি. এস. কে।

ছাত্রদের অসংখ্য জমায়েত, আকাশ ফাটানো শ্লোগান, প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পোস্টার,—বিপ্লবী ফ্রান্স আবার বহুদিন বাদে তার চরিত্র ফিরে পেলো।

কোন রাজনৈতিক দল এই বিপ্লবী ছাত্র-সমাজের সমর্থনে এগিয়ে এলো না। 'অক্সির্দা' রাজনৈতিক দল হুমকি দিল, অশান্ত ও অবাধ্য ছাত্রদের তারা ঠাণ্ডা করে দেবে। ফরাসী কমউনিষ্ট পার্টি নাক সিঁটকে বললে এ সমস্তই অল্প সংখ্যক অতি বাম ছাত্রদের হঠকারিতা।

'ছাত্রদের কিন্তু এত সব প্রতিকূল পরিস্থিতি দমিয়ে দিতে পারে নি। ক্রমশ তাদের সমর্থনে এগিয়ে এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সমিতি এবং নাঁতের-এর চারজন খ্যাতনামা অধ্যাপক।

সাধারণ লোকেরা ছাত্রদের সমর্থন জানাতে থাকে।

এমন কি, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির বহু সদস্য বিপ্লবের ধারাকে সমর্থন জানালেন। শক্ত মানুষ দ্যগল তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এত বড় বিপদের আর কখনো সম্মুখীন হন নি।

চললো পুলিশের অত্যাচার। ছাত্ররাও পাল্টা মার দিতে থাকে। ১৩ই মে এই আন্দোলনে নেমে পড়লো ফরাসী শ্রমিকরাও। বিরাট শ্রমিক ধর্মঘটে অচল হ'য়ে গেলো সমগ্র ফ্রান্স। সমস্ত

রাজনৈতিক নেতারা হতচকিত। ছাত্রদের এমন বৈপ্লবিক সাফল্য তাঁরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি। তাঁদের এতকালের 'কর্তামি' ছাত্ররা গুঁড়িয়ে দিল দেখে একেবারে মুষড়ে পড়লেন।

বিপ্লবী ছাত্র-শ্রমিক সম্প্রদায় দেখলো, বিপ্লবের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি, সি. জি. টি. এবং অন্যান্য তথাকথিত বামপন্থী দলগুলি! তাই পার্টি নেতৃত্ব অস্বীকার করে ফরাসী ছাত্র এবং শ্রমিকরা নেমে এলো রাস্তায়। ২৫শে মে দু'লক্ষ শ্রমিক-ছাত্রের এক অভূতপূর্ব মিছিল বের হলো প্যারির রাস্তায়। আর এক লক্ষ গার দ্য লিয়ঁতে জমায়েত হলো। দখল করে নিলো স্টক এক্সচেঞ্জ। আগুন ধরিয়ে দিলো সেখানে। বিপ্লব নিশ্চয় ছড়িয়ে পড়তো এরপর সমগ্র ফ্রান্স জুড়ে। কিন্তু বাধা দিলো কমিউনিষ্ট পার্টি। তাদের পরিচালিত বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভয়ানক বিভ্রান্তিতে পড়ে। বিপ্লব মধ্য পথেই থমকে দাঁড়ায়। নচেৎ দ্যগল সরকারের সাধ্য ছিল না সেই উত্তাল তরঙ্গ রোধ করে।

ছাত্রনেতা ড্যানি তীব্র ভাবে আক্রমণ করেছেন কমিউনিষ্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের! এঁরা বিপ্লবের ভ্রূণকে হত্যা করেছেন। বিপ্লবকে তাঁরা ভয় করেন। কারণ, বিপ্লব সফল হলে বিপ্লব উত্তর রাষ্ট্র যন্ত্র পরিচালনা করবার মতো মানসিক দৃঢ়তা তাঁদের নেই।

এ যুগের অধিকাংশ পার্টিই ব্যুরোক্রাসিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। পার্টিগুলি আর জনতার ইচ্ছা পূরণের দিকে নজর দেয় না। এরা মুষ্টিমেয় নেতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত। সুতরাং কেউ যেন না ভাবেন যে কোন একটি পার্টির নেতৃত্বে আজকের দিনে কোথাও প্রকৃত বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। একথা শুধু ফ্রান্সের ক্ষেত্রে নয়, বিশ্বের সর্বত্রই রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা ক্রমশই সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার হয়ে উঠছে। কমিউনিষ্ট পার্টি গুলিতে অবাধে গুলজার করে চলেছে স্বার্থান্বেষী লোকেরা। বিপ্লবীর মানসিকতা তারা পাবে কোথা থেকে?

আগামী দিনে সর্ববিধ বৈপ্লবিক কাজে নেতৃত্ব দেবে পার্টির বদলে

বহু ছোট ছোট অ্যাক্‌সন কমিটি। কোন রাজনৈতিক দলের ধ্বজা না ধরে গড়ে উঠবে দেশে দেশে অজস্র প্রগতিশীল সংগঠন। তারাই এগিয়ে নিয়ে যাবে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবকে। প্রতিটি ছোট বড বৈপ্লবিক প্রয়াসের স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে মর্যাদা দিতে হবে। অহেতুক হস্তক্ষেপ ও নির্দেশের ছড়াছড়ি থাকবে না সেখানে। প্রত্যেক বিপ্লবী হবেন জনগণের খুব কাছের মানুষ। এবং তিনি তাঁর কাজের জন্য সর্বদাই জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে দায়ী থাকবেন। বিপ্লবী কমিটিগুলিতে সদস্যদের মধ্যে কোন রকম উঁচু নীচু ভেদাভেদ থাকা চলবে না। কোন রকম খবরদারি সহ্য করা হবে না। তত্ত্ব ও তথ্যের আদান প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত পথকে খুঁজে বের করতে নিরন্তর ব্যস্ত থাকবেন বিপ্লবীরা। শ্রমিক সমাজে সর্ববিধ অসাম্যের বেড়াজাল তুলে ফেলতে হবে। সমস্ত শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করবে মেহনতী মানুষরাই। বিপ্লবের নামে অহংবোধকে জাহির করা চলবে না। কেউ যেন আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কাজ না করেন। 'বিপ্লবের জন্য আত্মদান করতে এসেছি', 'বিপ্লবের খাতিরে সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করেছি' —ইত্যাদি আত্মঅহংকারের বুলি কোন মতেই বরদাস্ত করা হবে না। বিপ্লব কাউকে অনুগ্রহ করে-ধরতে আসে না; বিপ্লবে মানুষ এগিয়ে আসে নিজেরই তাগিদে,—কারণ, এটাই যে তার বাঁচার একমাত্র পথ!

ফরাসী ছাত্ররা বিশ্বাস করে, তাদের বিপ্লব একদিন সফল হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের ঈপ্সিত বিশ্ববিদ্যালয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পাঠক্রম তুলে দেওয়া হবে ছাত্রদেরই হাতে। প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণী হীন শোষণ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা। সকলের কাছেই সমভাবে খুলে যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা।

## ॥ উনিশ ॥

সাপের ফণার মতো অর্ধ উলঙ্গ মানুষগুলো একবার এগিয়ে যাচ্ছে, আবার আসছে পিছিয়ে। গ্রাম থেকে ধেয়ে আসা প্রায় দশ হাজার কৃষক জোতদারদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে জমায়েত হয়েছে বর্ধমানের কোর্ট কম্পাউণ্ডে। চৈতন্যপুরে নাকি এক ধনী জোতদারের সাথে ভূমিহীন কৃষকদের রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়ে গেছে কিছুদিন আগে। জোতদারের হাতে ছিল বন্দুক। তাই দিয়ে ঝপা ঝপ্ কৃষকদের কয়েকটি রক্তাক্ত দেহ ভূমিশয্যা নিয়েছে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। সেই কৃষক-হত্যার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ।

বিক্ষোভকারীদের হাতে তীর-ধনুক, লাঠি, টাঙ্গি ইত্যাদি। আমি বিস্মিত, রোমাঞ্চিত। মনে হয় অন্ধকার আকাশ যেন কড়মড় করছে,—ঘন ঘন ঝলসে উঠছে অঙ্কুশ। ভেঙে পড়া, ঘূণধরা কাঠামোর ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসছে এতগুলি শক্ত সমর্থ মানুষ! কোদালের হাতলে হাত রেখে তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। গম্ভীর নির্ভয় অধিকারে নিজেদের চষা জমির বুকে দাঁড়াতে চাইছে তারা। ঘোলা পানিতে অঙ্গ ডুবিয়ে গেরুয়া মাটির আস্বাদন নেবে তারা। ওরা চিৎকার করছে। ওদের চক চকে ধারালো জিভ কোর্ট কম্পাউণ্ডের অনড় বট গাছটাকে পর্যন্ত ঝাপটা লাগায় বার বার।

আর আমরা এই এত দূরে হতবাক। বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে সব কিছু ধরতে পারছি না। শুধু মনে হয়, পিছিয়ে যাচ্ছি—সত্যই পিছিয়ে পড়ছি আমরা!···

যুগের আহ্বানে সাড়া না দিতে পারার বেদনা যে কত গভীর, আমার এক ছাত্র বন্ধু একবার তা অনুভব করতে পেরেছিল। নাম তার সুব্রত। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী ছাত্র। সেদিন বর্ষণ

মুখর মধ্যাহ্নে বেদনাতুর সুব্রত অকপটে বর্ণনা করছিল আমার কাছে তার সেই অভিজ্ঞতার কথা। এই বিপ্লব-তরঙ্গায়িত যুগে সেই বাস্তব ঘটনা অনেকের কাছেই শিক্ষাপ্রদ বলে মনে হবে।

আসুন, সুব্রতর মতো আধুনিক এক যুবকের মানসিকতা আমরা পর্যালোচনা করে দেখি। মাত্র একটি দিনের ঘটনা। তারই দর্পণে ফুটে উঠলো পরিপূর্ণ সুব্রত।—

আকাশ স্পর্শ করবে মনে হয়, এত উঁচু ছাদের উপর পতাকাটা পত্ পত্ করে উড়ছে। স্বাধীনতা দিবসের চন্‌মনে্ উজ্জ্বল দিনটাতে এ তল্লাট সেদিন সাত সকাল থেকেই সরব।

ছুটির দিন। রঙ বেরঙের দিন। সিনেমা হলের সামনে তাই এত বড় জটলা অন্য দিনের বিক্ষত স্মৃতিকেও ম্লান করে দেয়। সিনেমার দেওয়ালে বিরাট পোষ্টারটা শুষে নিচ্ছে প্রত্যেকের একাগ্রতা। একটা শির শিরে অনুভূতি প্রত্যেকের বুক বেয়ে নেমে আসতে থাকে। পোষ্টারটার গায়ে ওরা সবাই যেন জীবন্ত।

একটি মেয়ে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। আবরণহীন মোমের মত পা—জানু পর্যন্ত স্পষ্ট। উর্ধ্বাঙ্গের নিম্নাঙ্গের সেই ঝিলিক আবেগ সঞ্চারিত করছে অপর এক যুবককে, যে একটা চোখ বন্ধ ক'রে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। অবশ্য, ওদের দু'জনের মধ্যে আছে প্রকাণ্ড নীল সমুদ্র। সেখানে এক জাহাজে জোর যুদ্ধ চলছে। এরোপ্লেন আর তলোয়ারের অপূর্ব সংমিশ্রণ।

সে সময় খুব ভিড়। ভয়ানক ভিড়! কালো মাথায় গিস গিস। বিরাট লাইনে ধ্বস্তাধ্বস্তি, রক্তারক্তি। অনেকগুলো হোমগার্ড আর পুলিশ বেমালুম লাঠি চালাচ্ছে থেকে থেকে। কার যেন মাথাটা ফেটে গেল। 'বাপ' বলে ছিটকে এল সে! রক্ত! ঘন রক্ত!

এমন ভিড়েও সুব্রত অবশ্য টিকিট পেয়ে গেছে। গাঁটের শেষ কড়িটি খরচ করে সর্বোচ্চ দামের দুখানি টিকিট সে কিনে ফেললো। টিকিট ঘরের সরু ফোকর থেকে হাত বার করবার সময় অনেকখানি চামড়া ছুলে গিয়েছিল তার। রক্ত বার হয় নি। কিন্তু জায়গাট

ক্রমশই ফুলে উঠছে। নোনা ঘাম সেখানে জমে আরো যন্ত্রণা। বাব বার ফুঁ দিতে লাগলো।

বাড়ি থেকে আজ কত সকালেই বেরিয়ে এসেছে সে! তিন ভাগ ক্ষুদ আর এক ভাগ ডালের আধপেটা খেচুড়ি খেয়ে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে সে। রান্নাঘর থেকে ম' টের পান নি। পেলে নিশ্চয় বাধা দিতেন। কেরসিনের জন্য লাইন দেবার কথা ছিল আজ।

সুব্রতর সাইকেলটা ঘুরছিল কেষ্টসায়রের চারপাশে। ক্যাঁচ-ক্যাচানি আওয়াজ উঠছিল বার বার। তেল নেই ওতে।··· আকাশে স্তরে স্তরে মেঘ জমেছিল। গুমোট পরিবেশ। সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়তো সংশয় জেগেছিল। কপালটা কুঁচকে এসেছিল। হয়তো শিখা আজ আসতে পারবে না। পুলিশ ইনেসপেক্টরের মেয়ে শিখা সিংহ আকাশ দেখে ভয় পাবে। হয়তো একটু বাদেই বৃষ্টি নামবে, চাপ চাপ ধূলো জমে গিয়ে পাথর হ'য়ে উঠবে। আর সেই সঙ্গে সুব্রতর এক সপ্তাহের নানা রঙের প্রত্যাশাটিও ক্রমশ কঠিন আর বিবর্ণ হ'য়ে উঠবে।

কিন্তু বেলা যত এগিয়ে আসতে থাকে, মেঘ ততোই পরিষ্কার হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত দেখা হয় অমল সূর্যালোক। নীল আকাশকে স্বাগত জানিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সুব্রত তাদের নির্দিষ্ট হলের সামনে এসে দাঁড়ায়। অবশিষ্ট সমস্ত শক্তিটুকু দিয়ে সর্বোচ্চ দামের ছ'খানা টিকিট সংগ্রহ করে নেয়।

সুব্রত ঠোঁট কামড়ে হাসে। নীচু হয়ে যেন গন্ধ শুঁকতে থাকে টিকিট ছ'খানার। পকেটে তুমড়ে থাকা সিগারেটটা বের করে ওতে অগ্নি সংযোগ করে সুব্রত। জোর জোর টানতে থাকে। কিন্তু মৌতাত আসে না, হাতে যন্ত্রণা হচ্ছে। ফুলো জায়গাটা চেপে ধরলো সে।···

মস্ত—প্রায় জীবন্ত পোষ্টারটার নীচে থেকে ভিড় ক্রমশই পাতলা হয়ে আসতে থাকে। একে একে কমবেশী সকল দামের

টিকিটই ফুরিয়ে আসে। কেমন যেন এক ধরণের পাণ্ডুর হতাশা নিয়ে এক মাড়োয়াড়ী ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে গাড়ীতে রেখে কালোবাজারীদের ইতস্তত সন্ধান করতে থাকেন।

সিগারেটটা শেষ হ'য়ে গেছে।

সুব্রতর কপাল ঘামছে। ঘন ঘন তাকাচ্ছে সে থেকে থেকে ধেয়ে আসা রিক্সাগুলোর দিকে। শিখা আসেনি। শিখা এখনো এলো না।

আকাশ ছোঁয়া পতাকা উড়ছে। সুব্রত অত উঁচুতে তাকাতে পারে না।...তার সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা গৌতম, নবকুমার, নির্মল, রবি, চন্দ্রনাথ, বিভাস —আজ সব দল বেঁধে মিছিল বার করবে। চেষ্টা করবে অনুরোধ জানাবে ঐ পতাকা অত উঁচুতে তুলে না ধরবার। সুব্রতর দিকে ঘোলো জোড়া দৃষ্টি এসে পড়েছিল। "স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ আমাদের নেই। আমরা অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি। ঋণে ঋণে..."

সুব্রত তবু ছিটকে এসেছে। ছিটকে এসেছে সেই সংগ্রামী পরিবেশ থেকে। চাকাটার ক্যাচ ক্যাচানিতে একটা ছন্দহীন লয় ওকে তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে। তিন ভাগ ক্ষুদ আর এক ভাগ ডাল! কেরসিনের জন্য ঘর্মাক্ত লাইন! অথচ, কী আশ্চর্য! সদ্য ভালবাসায় আবদ্ধ পুলিশ ইনেস্পেক্টরের মেয়ে শিখা সিংহ কথা দিয়েছে, সিনেমায় সে আসবে —একেবারে একা! গভীরতম স্পর্শ!...

তলপেটে বোধহয় আবার সেই যন্ত্রণাটা উঠল। নাভির নীচে প্যাণ্টটা নামিয়ে দেয় সুব্রত। পাথরের চকচকে চত্বরে প্রতিফলিত ঠিকরে এসে পীড়িত করছে তার চোখ দুটোকে। মা প্রায় বলেন, 'তোর চোখ দুটো অমন দিন দিন লাল হয়ে উঠছে কেন সুব্রত?' মার দিকে তাকাতে সত্যই ভয় হয়। কী অসম্ভব সারশূন্য মেদবহুল দেহ! যে কোন দিন হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে!

একটা রিক্সা এলো হুম্ করে। আনন্দে অস্ফুট শব্দ ক'রে

উঠতে চাইলো সুব্রত—তার প্রতীক্ষিত শিখা এসে গেছে। সমস্ত দেহ জুড়ে আভিজাত্য ঝরে পড়ছে ওর। হয়তো কিছুক্ষণ আগে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে ও আকাশে মেঘের খেলা দেখছিল। অপূর্ব দিন একটা! চড়ুই পাখীর মত উড়ে উড়ে বেড়াতে ইচ্ছা জাগে।

সুব্রত আর শিখা—মনে হয় যেন মন গড়া কোন পিকনিকের এক জোড়া…। যদিও ওরা কোনদিন পিকনিকে যায়নি, গাছের নীচে বসে ভালবাসা জানায়নি। মাত্র সামান্য-সামান্য মন দেওয়া-নেওয়ার প্রথম সুযোগে আজ এই বিরাট সিনেমা পোষ্টারটার নীচে এসে পৌঁছে গেছে তারা।

শিখার ধবধবে দেহে লাল শাড়ি। চুলগুলো ঘন ও মিসকালো। চোখ দুটো টানা টানা। ঠোঁট বাঁকা ও গর্বিত। কোন এক পোষাকের দোকানের সামনে দাঁড়ালে 'মডেল' বলে মনে হবে।

"এত দেরী?"

"বিলকুল ভুলে গিয়েছিলাম।"

"ভুলবেই তো!"

"থাক, উপরে চলো আগে।"

ছ' পাক সিঁড়ি ভেঙ্গে ওরা উপরে পৌঁছে গেল।

অন্ধকার হলে নরম সিট খুজে বসে পড়লো দু'জনে। সামনে ছবির পরিচয় তালিকা। হিন্দী জগতের শ্রেষ্ঠ তারকাদের সমন্বয় ঘটেছে এখানে। কিন্তু নায়ক এক কুস্তিগীর।…চড়া সুরে বাজনা বেজে চলেছে।

"এইবার শোন। বাবা আজ হঠাৎ বাড়ীতে ছিলেন। শহরে নাকি গোলমাল হতে পারে, তাই আগে থেকেই 'সিক' হ'য়ে আছেন! আমাকে নিয়ে আজ এক বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে যাবেন বলেছিলেন!…অনেক কষ্টে ফাঁকি দিয়ে এলাম। বাবা তখন নাক ডাকছেন; আর মা—"

খিক খিক ক'রে শিখা সিংহ হাসতে লাগলো। সুব্রত তার

শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। নিজের পোষাক নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে, রুমাল দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে, অথবা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে শিখার ফুলঝুরি ছড়াতে ওস্তাদ। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে ওর কণ্ঠস্বরে যেন পিয়ানো বাজে।

সুব্রত অত বলতে পারে না। তবে থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জানিয়ে দেয় তার মস্ত অস্তিত্ব, ভাবনার ও আবেগের গভীরতা।

"তুমি অত দীর্ঘশ্বাস ফেলছো কেন?"

আমি আমার বন্ধুদের ফাঁকি দিয়ে এসেছি..."

"ভালো করেছো। ও রকম ঝামেলায় না জড়িয়ে পড়াই ভালো। আমাদের বাড়ীতে ওসব একদম পছন্দ করে না!"

"তুমি?"

"অত ভাববার ইচ্ছা আমার নেই।"

শিখা আবার হাসলো হিস্ হিস্ করে। সুব্রতর হাতখানা কখন যেন পৌঁছে গেছে ওর মোটা সোটা গোলগাল হাতের আবেষ্টনীতে। শিখার হাতে দুটো আংটি সুব্রত তার যন্ত্রণা ভুলে যাচ্ছে ক্রমশ।

তবু তো কপাল ঘামে। তবু তো মনে পড়ে যায় পিছনের কথা। বাইরে রৌদ্রালোকেতে আকাশের পটভূমিকায় এক বিরাট বিক্ষোভের ঝড় দানা বাধছে। হঠাৎ এই থমথমে স্তব্ধতা ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে সম্মিলিত বুভুক্ষু আত্মার দাবীতে। শিখাদের সেই গ্যাণ্ড পিয়ানোর সব কটি রিডও অচল হ'য়ে যাবে একে একে। সুব্রতকে ওরা আহ্বান জানিয়েছিল সুব্রত যায়নি। সুব্রত পালিয়ে এসেছে!

সমস্ত হল জুড়ে চিৎকার উঠলো। শিস হাততালিতে কান পাতা দায়। শিখাও হাসছে খামচে ধরেছে সুব্রতর একখানা হাত।

চোখের সামনে হিন্দী ফিল্মের সেই পুনরাবৃত্তি:

তিনটি মেয়ে আর একটি ছেলে। মেয়ে তিনটি প্রায় নগ্ন আর ছেলেটি তো রাজপুত্র! কুস্তির রকমারি প্যাঁচ কষতে ওস্তাদ।

প্রমত্ত বাতাসের গায়ে রাশ রাশ চুল উড়িয়ে ঐ তিন জনের একজন বালির উপর ঝুঁকে পড়ে ঝিনুক খুঁজছে, দ্বিতীয়জন চকচকে ঢেউগুলোর দিকে কবির দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে, তৃতীয়জন সটান বালির উপর শুয়ে বুকের কাপড় সরাতেই সমস্ত হলটা যেন উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লো।···তারপর রাজপুত্র গান গাইছেন!···এরপর যুদ্ধ হবে।···এরোপ্লেন, তলোয়ার, যুদ্ধজাহাজ··· !

"ক্যামেরার কাজ সুন্দর !"

—আত্মপ্রবঞ্চকের মতো বলে উঠলো সুব্রত।

"কেন ? সু' ঐ মেয়েটি ?"

—শিখা ঘনিষ্ঠ হয়ে চোখ টিপে বলে ! অনেকটা সে সুব্রতর বক্ষলগ্না। কপালের ঘাম গুলো এবার মুক্তো হয়ে আসছে। মুখ ঘুরিয়ে সুব্রত একবার দেখে নেয় শিখার মুখের ভগ্নাংশ। মনে হয়, কোন এক দক্ষ শিল্পীর অর্ধসমাপ্ত ছবি। প্রাইমারী শ্যাডো হয়ে গেছে, কিন্তু তুলির সব কটি টানে এখনো জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। কেমন যেন পাথর কাটা মূর্তি। নিজের ঠোঁট দুটো আরো এগিয়ে নেবার চেষ্টা করলো সুব্রত।

···কিন্তু তার আগেই—

তার আগেই প্রচণ্ড এক শব্দ উঠলো !

বাতি গুলো নিভে গেল এক দমকায়। সম্মিলীত বিস্ময়ে ও আর্তস্বরে ভরে উঠলো চারদিক।

"কি হলো ?"

শিখা উঠে দাঁড়ায়।

"কি জানি।···তুমি বস।"

আচ্ছন্নের মত সুব্রত ওকে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

"না।"

কিন্তু ততোক্ষণে বাইরে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে শিখা। ঠেলাঠেলি, গুঁতো-গুঁতিতে একটা মাংস পিণ্ডের মত দলাই মালাই হতে হতে শিখা সিংহ বাইরে বেরিয়ে এলো।······

সুব্রত এলো তার অনেক পেছনে। বাইরে বেরিয়ে আসতেই নাকে এসে লাগলো সেই গন্ধ!

বারুদ!

তিন তলার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে সুব্রত দেখলো, নীচের সেই বিলাসী পরিবেশটা বিদায় নিয়েছে। সমস্ত শহরটা যেন এক গভীর যন্ত্রণায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে ওর পাঁজরের প্রতিটি হাড়।

ভীরু শিশুর মত পিছিয়ে যেতে চাইলো সুব্রত। কিন্তু সিনেমা হলের দরজা ততোক্ষণে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেছে। শত শত দঙ্গল দঙ্গল পুলিশী জটলা। বুটের বিক্ষিপ্ত পেষণে আত্মরক্ষার অন্তিম প্রয়াসে একান্তই অস্থির। অপর ধারে ওরা সবাই। তিন ভাগ খুদ আর এক ভাগ ডালের আধপেটার দল, কেরসিনের লাইন থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা সরব জোয়ার···সেই বিভাস, নির্মল, গৌতম, চন্দ্রনাথ, অনিল, মৃণাল প্রভৃতি।

এই এত উঁচুতে ভীরু শিশুর মত পিছিয়ে পড়া সুব্রত। নাকে এসে লাগছে ঝাঁজালো বারুদের গন্ধ। হাতের সেই যন্ত্রণার চাইতে চোখের যন্ত্রণা তীব্রতর।

কিন্তু শিখা কোথায়? শিখা সিংহ কোথায়? রক্ত চক্ষু নিয়ে সুব্রত দেখলো, শিখা হারিয়ে গেছে! শিখা পালিয়ে গেছে!

আহত, পরাজিত সৈনিকের মত সুব্রত একে একে আবিষ্কার করলো, কেউ আর তাকে ডেকে নেবে না। আহ্বান জানাবে না। এই মাটির পৃথিবী আর কিছুতেই অমন তিনটি নগ্ন মেয়ে এবং এক রাজ পুত্রের গানে বশ মানবে না। বাইরে ঐ বারুদের গন্ধেই রয়েছে এক নিখুঁত রমণী।

সুব্রতর চোখের সামনে যেন একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। সেই আগুনের তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে তার এতক্ষণের চুইয়ে চুইয়ে পড়া ঘামের বিন্দু। তার বদলে তার টক টকে কপাল ক্রমশই তামাটে হয়ে আসছে।

সিঁড়িগুলো বেয়ে বেয়ে সুব্রত নামতে থাকে। ওর চলার ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, ছেলেটা এতোক্ষণে ভালবাসায় বুকখানা ভরিয়ে তুললে। আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা নিয়ে ওর প্রতিটি পদক্ষেপ রচনা করছে।

এগিয়ে এসে সুব্রত মাটির বুকে পা রাখলো। তার সামনে বিধ্বস্ত শহরের ছবি! একটু আগে এখানে এক খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে। স্বাধীনতা দিবসেও আনন্দহারা সংগ্রামী ছেলের দল দাবী জানাতে এসেছিল। চেয়েছিল, খাদ্য নিয়ে ও শিশুর স্বাস্থ্য নিয়ে এমন ফাটকা বাজি চলতে দেওয়া হবে না। হয়তো তারা এও চেয়ে ছিল, ঐ কুৎসিত ছবিটাকে আর প্রদর্শিত হতে দেওয়া হবে না। তীব্র দৃষ্টি নিয়ে সুব্রত তাকালো সেই বিরাট পোষ্টারটার দিকে! আশ্চর্য! এটা এখনও অক্ষত!—

একটি মেয়ে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। আবরণ হীন মোমের মতো পা—জানু পর্যন্ত স্পষ্ট। উর্ধ্বাঙ্গের নিম্নাঙ্গের সেই ঝিলিক আবেগ সঞ্চারিত অপর এক যুবককে, যে একটা চোখ বন্ধ করে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। অবশ্য ওদের দুজনের মাঝে প্রকাণ্ড নীল সমুদ্র। সেখানে এক জাহাজে জোর যুদ্ধ চলেছে। এরোপ্লেন আর তলোয়ারের অপূর্ব সংমিশ্রণ।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে সুব্রত। তারপর পায়ে পায়ে আরো এগিয়ে যায়। একেবারে সেই পোষ্টারটার গায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। নাকে এসে লাগছে আরও তীব্র ঝাঁজ! আরও জ্বালা!

দুই অকম্পিত হাত দিয়ে হঠাৎ সেই পোষ্টারটাকে সবেগে টেনে ছিঁড়ে ফেললো সুব্রত। তার বোধহয় নিজেরও অবাক লাগে। হাত দুটোতে এত শক্তি নিহিত ছিল! এত বড় পোষ্টারটা এক টানেই দু'খণ্ড হয়ে গেল। এত ভঙ্গুর!

এইভাবে সুব্রত পাল্টে গেল।

এই ভাবেই পাল্টে যাচ্ছে সুব্রতদের দল।

ছাত্রদের চেতনার রঙে আজ অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়ে আসছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ ক'রে গা ঢাকা দেবেন আর সুবোধ বালকের মতো ছাত্ররা তাই হজম করবে,—এটা আর সে যুগ নয়! তারপর রাজনীতির ধাপ্পাবাজিতে ছাত্রসমাজকে নিজের মসনদ গড়ার কাজে লাগাবেন,—এমন প্রত্যাশাও যেন কোন বুর্জোয়া নেতা স্বপ্নেও কল্পনা না করেন। নবীনদের জাগ্রত বুদ্ধি আজ শাণিত। স্বার্থপরদের চোখ তো ধাঁধিয়ে যাবেই!...

কোর্ট কম্পাউণ্ডের মিছিল ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সেখান থেকে সাইকেলে চেপে চলে এলাম বর্ধমানের একটি গ্রাম তেজগঞ্জে। পেলব ও উজ্জ্বল আবহাওয়া। গোলাপী মেঘ চরে বেড়াচ্ছে আকাশের গায়। অস্তমিত সূর্য,—পৃথিবীর রঙ বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। মেঘ ও সূর্যের লুকোচুরি খেলায় এই উজ্জ্বল, এই অন্ধকার, আবার আলোর মেলা।

অদূরে দামোদর নদের সাদা চড়া থেকে ভেসে আসছে মৃদু স্নিগ্ধ বাতাসের পরশ। এতদূর থেকেও পরিষ্কার শোনা যায় রেলগাড়ীর চাকার ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্ শব্দ। মনে হয়, পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথের ভিতরই পাওয়া যাবে রেলষ্টেশন। আসলে কিন্তু ষ্টেশন অনেক দূরে,—প্রায় তিন মাইল ব্যবধানে।

ঘরে ফিরে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। গায়ের রঙ তামাটে মনে হচ্ছে। কটা চুল এখন অনেকটা কৃষ্ণাভ। চোখের দৃষ্টিতে এখনো বিস্ময়। উত্তেজনা মাখানো ঠোঁট দুটো।

ডিভানে দেহ এলিয়ে চোখ বুজলাম। একটা পুরণো ছবি, দোলা দিচ্ছে বার বার। ছবিটাকে ধরতে চাইছি মুঠো করে। ঠিকমতো ধরতে পারছি না। ফস্কে যাচ্ছে বার বার। অবশেষে ধরে ফেললাম। হ্যাঁ, ছবিটা প্যারিসের। আমার প্রবাসী ছাত্র জীবনের। প্যারির সেই তীর্থক্ষেত্র কাফে!

কাফেতে বসেই আমি দেখতে শিখেছি। ওখানে বসেই আমার অনুভূতিগুলো এত তীক্ষ্ণ ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে! ওখানে কে যায় না? সবাই যায়। কাফেতে না বসতে পারলে জীবন-বোধকেই

খুঁজে পাওয়া যায় না। ছাত্র, ছাত্রী, ভ্রমণলিপ্সু-শিল্পী, নিছক আমুদে লোক, বিরামসন্ধানী, ভোজনপ্রিয়, রাজনৈতিক নেতা, দার্শনিক—সকলের এক গম্‌গমে জটলা।

দেশ-বিদেশের মানুষের সাথে অনায়াসে পরিচিত হওয়া যায় এখানে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আলোচনা করুন, কেউ অপনাকে এসে বিরক্ত করবে না। কাফের মালিকের লোকেরা আপনাকে উঠে যেতে বলবে না। প্রতিটি কাফে যেন ফ্রান্সের জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

তুলো আর আমি এমনি এক কাফেতে রোজ মিলিত হতাম। তারপর সেখান থেকে মধ্যসন্ধ্যায় বেরিয়ে এসে পায়চারি করতাম সাঁজলিজিতে। এটাই ছিল আমাদের যৌথ বিলাস। প্যারির শ্রেষ্ঠ রাজপথ সাঁজলিজি। এমন সুন্দর, স্বাধীন ও স্বাচ্ছন্দ্য বিহার ভারতবর্ষের কোন রাজপথে দাঁড়িয়ে ভাবাও যায় না। কী প্রশস্ত! চৌরঙ্গী এর তুলনায় একটা গলি মাত্র!

সাঁজলিজিতে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের বুক কাঁপানো ছবিগুলো যেন দেখতে পেতাম। দেখতাম, এই পথ দিয়ে শার্লেমেন যাচ্ছেন 'করনেশান' উৎসবে যোগ দিতে। সাগর কল্লোলের মত মুখর বিপ্লবী জনতা ছুটে যাচ্ছে বাস্তিলকে ধ্বংস করতে। আবার ধীরে ধীরে পদচারণা করছেন রুশো, ভলতেয়ার, ভিক্টর হুগো, এমিলি জোলা, মোপার্শা ইত্যাদি সংস্কৃতির মহারথীরা!

সাঁজলিজি থেকে যেতাম নোতারদামে। ভিক্টোর হুগোর নির্ঝরিণী কাব্য তাকে অমর ক'রে রেখেছে। আজো এর ঘণ্টা নির্ঘোষে অতীতকে স্পর্শ করে যায়।

তারপর আছে কল্লোলিনী সীন নদী,—প্যারিকে আপত্যস্নেহে জড়িয়ে ধরে আছে সৃষ্টির প্রথম বয়স থেকে।···

প্যারির আবেগ-মধুর সন্ধ্যাগুলিতে তুলো ও আমার আর একটি 'বাই' ছিল। তা হচ্ছে, বেছে বেছে বিদেশীদের সাথে আলাপ করা। বিশেষত, কোন নিগ্রো যুবক ও যুবতীর সন্ধান পেলে কিছুতেই তার পিছু ছাড়তাম না। প্রায় গায়ে পড়ে আলাপ

জমাতাম। তারপর রাত্রিতে ডায়রিতে টুকে রাখতাম সেই বিদেশীর বর্ণিত ইতিবৃত্তকে।

এমনই এক নিগ্রো যুবক যোশেফের সাথে আলাপ হয়েছিল সাঁজারমা গ্যা গ্রের কাফেতে। খুব হাসিখুশী লোক। সল্লেতেই জমে গেলেন আমাদের সাথে। নোতারদামের বাগানে বসে পল রবসনের সাংগিতিক মুর্ছনা শুনিয়েছিলেন আমাদের! সংগীতের লহরে মনে হয়েছিল, যেন এক নিগ্রো মাঝি ওহিয়োর বুক চিরে ছলাৎ ছলাৎ করে দাঁড় বেয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে!

গান থামতেই যোশেফকে জড়িয়ে ধরেছিলাম আমি। শুনেছিলাম ওর জীবন-কাহিনী। বড় করুণ ও মর্মস্পর্শী। ট্রান্সভালের এক কুলি পরিবারে তার জন্ম। বাবাকে এক অফিসার গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। অথচ, মা রোজিনা আইনের কাছেও কোন অনুকম্পা পেলেন না। উপরন্তু, একদিন কলেজ-ফেরতা যোশেফকে ধরে প্রচণ্ড মারধর করলো শ্বেতাঙ্গদের ভাড়াটে গুণ্ডারা।...চমৎকার গাইতে পারে যোশেফ। তাকেই মূলধন ক'রে ফ্রান্সে চলে এসেছে সে। আজ এই প্যারির স্থায়ী বাসীন্দা যোশেফ ভ্যালেনটাইন।

যোশেফ ভ্যালেনটাইন দক্ষিণ আফ্রিকায় দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে সেখানে বিরাট সংখ্যক ভারতীয়দের ভূমিকাকেও ব্যাখ্যা করেছেন। শ্বেতাঙ্গ আর ভারতীয়,—এরা দু'জনেই তো এক রকম পরগাছা সেখানে। তারা তো সেখানে জোর ক'রে ঢুকেছে অথবা, তাদের আমদানী করা হয়েছে। শ্বেতাঙ্গরা নিয়েছে অত্যাচারীর ভূমিকা; আর ভারতীয়রা পড়ে পড়ে মার খেলেও নিজেদের অহং বোধটুকু ত্যাগ করতে পারেনি। পারছেনা আদিবাসী নিগ্রোদের আপন বক্ষের উষ্ণতায় আলিঙ্গন করতে! এখানেই মস্ত ব্যর্থতা, বিরাট ফারাক!...

যোশেফ বিপ্লবী আফ্রিকার অনেক গল্প জানেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিকথা যেন তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। পরপর

কয়েকদিন তুলো ও আমি তাঁর সাথে কাফেতে বৈঠক বসিয়েছিলাম। তাঁর খাদ-গম্ভীর স্বর আমাদের পরিবেশকে ক্রমশই ভারী ক'রে তুলতো।

সীল নদীর ধারে বসে তিনি একদিন শুনিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপ্লবী বীর ম্যাকানার গল্প। সামনেই সর্পিল নদীর প্রচণ্ড উচ্ছ্বলতা ও অমেয় শক্তির মধ্যে ম্যাকানাকে সহজেই অনুভব করতে পারছিলাম। যোশেফ ভ্যালেনটাইন বলছিলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে বাস করে কেউ যদি কোন দিন ম্যাকানার নাম ভুলে যায় তবে সে নিজের বিবেকের কাছেই কোন জবাব দিতে পারবে না।"

প্রায় দেড় শ' বছর আগেকার কথা,—ইংরেজী ১৮১৯ সাল। বর্বর শ্বেতাঙ্গদের বন্য অত্যাচার তখন চূড়ান্ত ভাবেই শুরু হয়ে গেছে। আজকের দিনের মত সে সময়ও বিদ্রোহী কৃষ্ণাঙ্গদের রোবেন দ্বীপে [ Robben Island ] চালান দেওয়া হতো। সেখানে তাঁদের উপর চলতো অকথ্য অত্যাচার। ইলেকট্রিক চাবুকের মার থেকে শুরু ক'রে জীবন্ত চর্ম উৎপাটন পর্যন্ত সমস্ত রকম মধ্যযুগীয় অত্যাচারই চালানো হতো বিপ্লবীদের উপর। সেই অত্যাচারের ধারা আজো সমানে চলেছে। সমুদ্র বেষ্টিত রোবেন দ্বীপ তাই বিভীষিকার প্রতিমূর্তি,—আজো এর আকাশে মুক্তিকামীদের আত্মারা যেন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে।...

ম্যাকানা এক্সোসা [ Xhosa ] উপজাতিদের নেতা। তাঁর বিশাল বক্ষ, অটুট সাহস ও অমিত বল,—কৃষ্ণকায়রা তাঁর নেতৃত্ব মাথা পেতে নিয়েছিল।

ম্যাকানা প্রথমেই শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী ছিলেন না। বরং তিনি তাঁর স্বজাতিদের বলেছিলেন বিদেশীদের উপর অত্যাচার না করতে!

কোন ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী তাঁর কাছে এলে ম্যাকানা তাঁর আদর-যত্নের কোন ত্রুটি রাখতেন না। ফলমূল, মধু এনে আগন্তুকের ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে তুলতেন।

কিন্তু শ্বেতাঙ্গ হানাদারের দল এই বন্ধুত্বের মর্যাদা দিল না। ম্যাকানার ভূখণ্ডে একদিন অতর্কিতে ইংরাজরা আক্রমণ চালালো। দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলতে থাকে আদিবাসীদের আস্তানায়। ওদের শস্যক্ষেত্র পুড়ে ছাই হল। ছেলে-বুড়ো-নারী,—সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে হানাদারেরা। কালো চামড়া কেটে লাল রক্তের বান ডাকে। বিশ হাজার গৃহপালিত পশু সমেত এদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হলো।

ম্যাকানা বিস্ময়ে বেদনায় হতবাক হ'য়ে গেলেন। দেখতে দেখতে সেই ব্যথা রুদ্র রোষে পরিণত হলো। হুঙ্কার ছাড়লেন ম্যাকানা। এর প্রতিশোধ নিতে হবে!

খুন কা বদলে খুন!

ম্যাকানার সেই ডাকে ঝড় উঠলো গহন আফ্রিকার এক ভূখণ্ডে। শুরু হলো অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রথম যূথবদ্ধ অভিযান!

'শয়তান সাদা আদমীদের সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলে দাও!'—চিৎকার করতে করতে ম্যাকানার অনুগামীরা ছুটলো গ্রাহাম শহরের দিকে। সংখ্যায় ওরা আট হাজারের উপর। তীর, ধনুক, বর্শা, গাঁইতি, শাবল ইত্যাদি ওদের অস্ত্র।

গ্রাহাম শহরের শ্বেতাঙ্গ ফৌজ প্রস্তুতই ছিল। তোপের মুখে তারা উড়িয়ে দিতে লাগলো কৃষ্ণাঙ্গদের সমস্ত প্রয়াস। সমুদ্রের ঢেউ এর মতো বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে নিগ্রোরা। শত শত তীর আর বর্শা আকাশ ছেয়ে ফেলে। তবু হারতে তাদেরই হলো।

সাহেবদের উন্নত অস্ত্রের মুখে দাঁড়াতে পারবে কেন তারা? মৃতদেহের পাহাড় জমে উঠলো। সেই মৃতদেহ গুলিকে পদদলিত ক'রে শ্বেতাঙ্গরা আবার ধেয়ে এলো সামনের দিকে। আগুন জ্বালালো আদিবাসীদের গ্রামে গ্রামে। পূব আকাশ পশ্চিম আকাশ রক্তের মতো লাল। মানুষের আর্তনাদ, অভুক্ত শিশুর কান্না, লাঞ্ছিত কৃষ্ণাঙ্গীর গভীর বেদনা, গর্ভবতী নারীর অকাল প্রসবের

জ্বালা, বৃদ্ধদের আর্তনাদ, আহত যুবকের হাহাশ্বাস,—রচিত হলো দক্ষিণ আফ্রিকার ঘৃণ্য ইতিহাসের একটানা পটভূমি!

বিদ্রোহী ম্যাকানাকে কিন্তু ইংরাজরা সহজে ধরতে পারেনি। স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। শত প্রলোভন বা ভীতি প্রদর্শনেও কেউ তাঁকে ধরিয়ে দেয় নি। অবশেষে ধড়িবাজ শ্বেতাঙ্গরা সন্ধির ছলনায় দেখা করবার সুযোগ পেল ম্যাকানার সাথে। ভুলিয়ে নিয়ে এলো নিজেদের শিবিরে। তারপর ঠেলে পাঠালো রোবেন দ্বীপে।

ম্যাকানা ভেবে পান না, সভ্য দুনিয়ার (?) মানুষরা আরও কতখানি অসভ্য হতে পারে! এদের কাছে সততা, নিষ্ঠা, দয়া, মমতা, ভদ্রতা এসব আশা করাই বাতুলতা। এই বেনেজাতেরা শুধুমাত্র শোষণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই কায়েম করতে চায় বিশ্ব জুড়ে!

ম্যাকানাকে দুর্ভেদ্য রোবেন কারাগারেও বেশী দিন আটকে রাখা সম্ভব হলো না। তিনি ঐ দ্বীপের বন্দীদের নিয়েই গোপনে জোট বেঁধে ফেললেন। তারপর হঠাৎ একদিন ঝাঁপিয়ে পড়লেন কারা-রক্ষীদের উপর। ওদের সমস্ত অস্ত্র কেড়ে নিয়ে কয়েদখানার প্রাচীর টপকে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, ভয়াবহ আটলান্টিক মহাসমুদ্র। হাঁ করে যেন গিলতে চাইছে তাঁদের। ম্যাকানা একখানা ছোট বোটে নেমে পড়লেন সমুদ্রে। রাত ঘনিয়ে এলো। আটলান্টিকের তরঙ্গে দুলতে দুলতে ম্যাকানা দেখলেন, তাঁর ছোট ডিঙ্গিখানাকে ঘিরে ফেলেছে ইংরাজদের কয়েকটা জাহাজ। অনবরত গুলি বৃষ্টি হচ্ছে তাঁর নৌকা লক্ষ্য করে।

ডিঙ্গি থেকে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ম্যাকানা। চিৎকার ক'রে জানালেন তাঁর অনুগামীদের শেষ বিদায় বার্তা।···তাঁর মজবুত কৃষ্ণপাথর দেহখানা হারিয়ে যেতে লাগলো দূরে বহু দূরে······ আটলান্টিকের অতল গহ্বরে!······

যোশেফ থামলেন।

একটা ষ্টিম লঞ্চ এদিকেই যেন আসছে জল কাটতে কাটতে। ফসফরাসের দারুণ চাকচিক্য নদীর জলে। কালো জলের কল-কলনিতে আমরা কার যেন বিদায়-বার্তা অথবা, অভিনন্দন-বার্তা শুনতে পাচ্ছি।

"কে? ম্যাকানা?"

"না, শুধু ম্যাকানা নয়, তাঁর অনুগামী লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী কৃষ্ণাঙ্গদের আগামী বিজয়-বার্তা যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম।"

## ॥ কুড়ি ॥

"রক্ত-রঙের ফসল ফলে তাড়াতাড়ির বীজে,
বিনাশ তারে আপন গোলায় বোঝাই করে নিজে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

সমস্ত দেশ জুড়ে দারুণ চাঞ্চল্য! ইন্দিরা বনাম দেশাইয়ের দ্বন্দ্ব। বলা হয়েছে এটা ব্যক্তিগত আক্রোশের পরিণতি নয়। এ হচ্ছে নীতির যুদ্ধ।

আমাদের কাছে কিন্তু সত্য একটি কথাই: "পচনশীল ও পতন্মুখ কংগ্রেস আজ ভূমিশয্যা নিচ্ছে।" নেহেরুর মৃত্যুর পর কংগ্রেসের এই ভয়াবহ রূপ দিনের পর দিন স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্রকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে পুঁজিতন্ত্রের ধ্বজা তুলে অট্টহাসি হাসছিলেন নড়বড়ে কংগ্রেসের পুঁজিবাদী দক্ষিণপন্থী নেতারা। নেহেরু তনয়া বিবেকের তাড়নায় ছটফটিয়ে উঠছেন বার বার। শেষে আঘাত হেনেছেন সর্বশক্তি দিয়ে। পুঁজিবাদীদের বুক কাঁপিয়ে ঘোষণা করেছেন, "ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়করণ করা হবে।"

অর্থদপ্তর ছিনিয়ে নেওয়া হলো মোরারজী দেশাইয়ের কোল থেকে।

সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে অস্থিরতা।

এ দেশের রাজনীতি ক্রমশই দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। একদিকে দল নির্বিশেষে প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক মানুষরা! অন্যদিকে ধনতন্ত্রী ও প্রতিক্রিয়াশীলের দল। এই দুই দলের চূড়ান্ত সংঘর্ষের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে দেশ। মোরারজী-পাতিল চক্রের পিছনে সায় দিচ্ছে জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের মতো দক্ষিণ পন্থীরা। আর ইন্দিরাজীর সাহসিকতাকে তারিফ করেছেন দেশের অধিকাংশ বামপন্থীরা। পশ্চিম বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায় এই মুহূর্তে ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রেখে বললেন, "ঘটনার

প্রবহমানতায় প্রধানমন্ত্রীর মোরারজীর হাত থেকে অর্থদপ্তর কেড়ে নেবার সংবাদে আমি মোটেই বিস্মিত হই নি। আমি তখনই বলেছিলাম মোরারজী সম্ভবত পদত্যাগ করবেন। এখন আমার অনুমান সত্যে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেসে যে ভাবে আভ্যন্তরীণ বিরোধ দানা বাঁধছে, তাতে এখানেই তার সমাপ্তি বলে মনে হয় না। আরো অনেক চমকপ্রদ সংবাদ আমরা আশা করছি।…”

আরো অনেক চমকপ্রদ সংবাদ!

আজাদী ভারতের বুকে উপর বসে যাঁরা ব্যক্তিস্বার্থের বনিয়াদ গড়ে তুলেছে এতকাল, আজ তারা বিপন্ন বোধ না করে পারে না। স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকেই এদেশের মানুষের সাথে লুকোচুরি খেলে এসেছে দিল্লীর মসনদ। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সরব ঘোষণায় আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে; কিন্তু সেই আয়ের সবটুকুই তো পাঁচটি বিপুল বপু নির্বিচারে গ্রাস করে বসে আছে! আর আমরা দিনের পর দিন আরো অন্ধকারের অতলান্তে তলিয়ে যাচ্ছি। আরো অন্ধকার! ঋণের ভারে জর্জরিত, বেকারত্বের ভয়াবহ জ্বালা, আকাশস্পর্শী অসাম্যের অভাবনীয় দম্ভ, নেতাদের মিথ্যা স্তোক বাক্য,—‘অজ্ঞ-দরিদ্র ভারতবাসী, আর কতকাল সহ্য করবে?’

তাই পিছনের সংগ্রামী ও বিপ্লবী ভারতবর্ষের দিকে তাকালে চোখে জ্বালা ধরে যায় আজ। নোনা জ্বালা। গান্ধী, সুভাষ, তিলক, ক্ষুদিরাম, দেশবন্ধু, লালা লাজপত……এদের কারুর স্বপ্নই বাস্তবায়িত হয় নি। অঙ্গহীন ভারতবর্ষে আজ তাঁরা প্রকৃত অর্থেই লাঞ্ছিত! অথচ, বিপ্লবী ভারতবর্ষের সম্ভাবনা কম ছিল না।

১৮৫৭ সালের সেই মহা বিদ্রোহের কথা আগেই আলোচনা করেছি। সেই আগুন নিভে যাবার সাথে সাথেই শুরু হলো প্রতি-হিংসার পালা। বন্য-উল্লাসে, নগ্ন-বর্বরতায় এক নতুন ইতিহাস রচনা করলো ইংরাজরা। তৈমুর, নাদিরশাহ ও চেঙ্গিসখানের অত্যাচারকেও তা লজ্জা পাইয়ে দেয়। বহু বিদ্রোহীকে তারা গুলির বদলে আগুনে পুড়িয়ে মারে। অগ্নি দগ্ধ নর-নারীরা যখন

করুণ আর্তনাদে ফেটে পড়ত, সুসভ্য ( ? ) ইংরাজরা তখন হাততালি দিয়ে নেচে উঠতো। শুধুমাত্র সন্দেহের দোহাই দিয়ে কত নিরপরাধ ভারতবাসীর যে ফাঁসি হয়ে গেল, তার ইয়ত্তা নেই। এক নানা সাহেবের সন্দেহেই ছয়জন নিরপরাধের প্রাণদণ্ড হয়ে গেল। ইংরাজ রোষাগ্নিতে দিল্লী প্রায় জনশূন্য নগরীতে পরিণত হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পিতা সেখ মহম্মদ খৈরুদ্দিন সে সময় দিল্লীর বাসিন্দা ছিলেন। ইংরাজদের তাড়নায় তিনি ভারত ত্যাগ করে আশ্রয় নেন সুদূর মক্কায়।

দেশের সামরিক বাহিনীকে ঢেলে সাজানো হলো। প্রভুভক্ত শিখ ও গুর্খাদেরই বেশী সংখ্যায় নিয়োগ করা হতে থাকে। সৈন্য-বিভাগের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি শুধুমাত্র ইংরাজদের জন্যই নির্দিষ্ট হলো। সৈনিকরা যাতে জাতিয়তাবাদের স্পর্শে সচেতন না হয়ে উঠতে পারে, সেদিকে কড়া নজর ছিল। আর সৃষ্টি হলো পুলিশ বাহিনী।

ইংরাজ শাসনের বিচিত্র ফসল ভারতীয় পুলিশ। পশু চরিত্রের ব্যাপক অভিপ্রকাশ এদের ভিতর। চরিত্রহীন, মদ্যপায়ী এবং উৎকোচগ্রাহী এই যন্ত্র মানুষের দল মুক্তিকামী কত যোদ্ধার যে সর্বনাশ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই! পুলিশ বাহিনীরই উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের মাটিতে তার অস্তিত্ব দীর্ঘদিন বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল!

সিপাহীযুদ্ধ থেকে গান্ধীজীর অভ্যুদয় পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা থেকে তেমন দানা বাঁধতে পারে নি। জনগণের সচেতনতা তখনো তেমন পরিপক্ক হয়ে উঠেনি। তবু ঐ সময়ই নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীল দর্পণ' নাটক রচনা ক'রে স্বদেশে ও বিদেশে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করলেন। 'নীলদর্পণ' প্রকাশের অপরাধে প্রকাশক লং সাহেবের একমাস কারাদণ্ড এবং একহাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়।

ঋষি বঙ্কিম ঠিক সে সময়েই লিখলেন 'বন্দেমাতরম্' গান,—

স্বদেশ প্রেমের সম্মোহিনী শক্তি বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে থাকে।

১৮৩৩ সালে ভারতবর্ষে এলেন ডাফরিণ। তাঁর সময়ই অক্টাভিয়ান হিউম্ দেশের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়দের নিয়ে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে লাভ করলেন তিনি।

হিউমের অনুপ্রেরণায় ১৮৩৩ সালে ক'লকাতায় একটি সভার অনুষ্ঠান হয়ে গেল। আনন্দমোহন বসু হলেন এর সভাপতি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অনেক প্রতিনিধি এখানে জমায়েত হয়েছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেই সভার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। সিভিল সার্ভিসে সাহেবদের পক্ষপাতিত্বে ক্ষুব্ধ সুরেন্দ্রনাথ তখন কায়মনোবাক্যে দেশের সেবায় নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ বাগ্মিতা নিয়ে তিনি ভারতীয় যুব সমাজে নতুন প্রাণ স্পন্দন তুলেছেন।

স্যার হেনরী কটন্ সুরেন্দ্রনাথের অসীম প্রভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, "সুরেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করলে মূলতান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখতেন, আবার তা দমন করবার শক্তি ছিল একমাত্র তাঁরই!"

ক'লকাতার সেই ঐতিহাসিক সভা থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। এরই দু'বছর বাদে ১৮৩৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। সাথে সাথে ভারতের ইতিহাস একটি নতুন বাঁকের মুখে এসে দাঁড়ায়।

কংগ্রেসের প্রারম্ভিক ভূমিকায় ইংরাজরা অস্বস্তি বোধ করে নি। বরং অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ সিভিলিয়ান কংগ্রেসের বৈঠকগুলিতে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। মাদ্রাজের শাসন কর্তা লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড তো তারিফ করলেন ভারতীয় কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতিকে। লর্ড ডাফরিণ মুচকি হাসি হাসলেন। তাঁর ধারণা হলো, মধ্যবিত্ত

শিক্ষিত ভারতীয়দের পারস্পরিক মেলামেশার একটি Common Platform মাত্র কংগ্রেস। সুতরাং ভয়ের কিছুই নেই। ভারতীয়রা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে না, দেখবেও না!

কিন্তু ভুল ভাঙ্গতে দেরী হলো না।

বিশাল মহীরুহের সম্ভাবনা নিয়ে কংগ্রেস ক্রমশই তার ডালপালা বিস্তার করতে থাকে। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতারা ইংরাজ-শাসনের বিষময় ফলকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরলেন। ইংরাজ সরকারও খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন কংগ্রেসের উপর। কোন সরকারী কর্মচারী কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হলে তার বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারত।

কিন্তু ইংরাজ জাতিই বোধহয় ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অসাম্যের বিরুদ্ধে এযুগের প্রথম যোদ্ধা। তাই ইংরাজ-জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন এক বিপ্লবী ইংরাজ সন্তান। স্যার হেনরী কটন্। তিনি ছিলেন আসামের শাসন কর্তা। আসামের চা-বাগানগুলিতে বাগান-মালিকদের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরলেন। তাঁর লেখনীর মুখে চিত্রিত হলো কুলি ও কামিনীদের উপর চা বাগানের সাহেব কর্তাদের জঘণ্য ব্যবহার! প্রায় প্রতিটি চা বাগানে এক নারকীয় পরিবেশ। দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ির পিছনে রয়েছে অনেক অশ্রুর ইতিহাস! সেই ইতিহাস আলোর মুখ দেখলো স্যার হেনরী কটনের রচনাতে।

চা বাগানের প্রভাবশীল সাহেবরাও কটনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে দেয়। তারা দরবার করে লর্ড কার্জনের কাছে। কার্জনও কটনের উপর কম বিরক্ত নন। নেটিভদের প্রতি ওঁর এই মমত্ব বোধ অসহ্য!

ফলে চাকুরী-জীবনে হেনরী কটনের সমস্ত উত্থান স্তব্ধ হয়ে গেলো। তাঁর ন্যায্য পাওনা বাংলার শাসন কর্তার পদ থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন।

চাকুরিতে ইস্তাফা দিলেন হেনরী। যোগ দিলেন ভারতীয়

কংগ্রেসে। ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়েও এই দলের জন্য তিনি স্বজাতিদের কাছ থেকেই সমর্থন আদায়ের আপ্রাণ প্রয়াস পান।

কংগ্রেসের বিংশতিতম অধিবেশনে হেনরী কটনকে সভাপতি নির্বাচিত করা হলো। বৃদ্ধ ইংরাজ বিপ্লবী আবার এলেন ভারতবর্ষে। ক্ষিপ্ত কার্জনের হুকুমে কোন ইংরাজ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে গেলো না, কোন বাংলো পাওয়া গেল না এই সংগ্রামী, যুক্তিবাদী মানুষটিকে স্থান দেবার জন্য। তা হোক! লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অন্তর নিঃসৃত অভিনন্দন বর্ষিত হলো স্যার হেনরী কটনের উপর!

ইংরাজ শাসনের বনিয়াদই হলো তাদের ভেদ নীতি,—প্রাচীন রোমকগণের সেই Divide et impera নীতি। ভাগ করো এবং শাসন করো। যখন যেখানে যে রকম সুবিধা তখন সেখানে সেরকম নীতিই অনুসরণ করা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র।

ভারতবর্ষের মতো দেশে ধর্মগত বিভেদ সৃষ্টি করাটা খুবই সহজ। ইংরাজরা সেই পথই ধরলো। রক্ষণশীল আক্র-পন্থী মুসলমানদের তারা ক্রমাগত হিন্দু-বিরোধী উস্কানিতে ফাঁপিয়ে তুলতে থাকে। স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের আবির্ভাব ঠিক সেই সময়েই। এই শিক্ষিত মুসলীম ভদ্রলোক ইংরাজদের হাতে রঙের তাসে পরিণত হলেন। প্রতিষ্ঠিত হলো আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়। সৈয়দ আহ্‌মদ তাঁর সাকরেদদের নিয়ে আসর জমালেন সেখানে। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ধোঁয়া আলিগড়ের গম্বুজ বেয়ে বেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আগামী যুগের চৌদ্দ দফা দাবী তখন যেন অলক্ষ্যে বিকট হাসি হাসতে থাকে। ইতিহাসের বিপরীতগামী পাকিস্তান তার প্রসূতি ঘর চিহ্নিত করলে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কেই।

সৈয়দের দৃষ্টিতে, ইংরাজরা সাক্ষাৎ পয়গম্বর। অতএব, ওদের দোয়া মিললেই মুসলীম জগৎ জেগে উঠবে! লর্ড কার্জন মেহেরবান্ হ'লে তমাম্ ভারতবর্ষে আবার মুসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে! সৈয়দের ভাষ্য অনুযায়ী জাতীয় কংগ্রেস হলো মুসলীম সমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু। কোন মুসলমানের উচিত হবে না, কোন কংগ্রেস

সেবীর সাথে হাতে হাত মিলানো! অথচ, সেই সময় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি হয়েছেন একজন সুশিক্ষিত জাতিয়তা-বাদী মুসলমান,—বিচারপতি বদরুদ্দিন তায়েবজী!

মুসলীম সমাজে সাম্প্রদায়িকতার বিষ রঁন্ধ্রে রঁন্ধ্রে বিস্তারিত হওয়ার প্রয়াসে সৈয়দ আহ্‌মদ বললেন, হিন্দু শাসন অপেক্ষা ইংরাজ প্রাধান্য শত গুণে শ্রেয়। ইংরাজরা এ দেশ ত্যাগ করে গেলে আমাদের সর্বনাশ উপস্থিত হবে। হিন্দুদের সাথে ভয়াবহ রক্ত ক্ষয়ী দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়বো আমরা। আমাদের উপর শাসন চালাবার জন্যই খোদাতাল্লা ইংরাজদের এ দেশে পাঠিয়েছেন! তাই আমাদের মুসলীম ভাইদের কর্তব্য হলো ইংরাজ শাসন সর্বতোভাবে মেনে চলা এবং কোনরূপ রাজনৈতিক অধিকার দাবী না করা।

এই হলেন স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ। ভারতীয় ইতিহাসে এক দুষ্ট গ্রহ। আর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় হলো সেই দুষ্ট গ্রহের কক্ষ।

কার্জন ধর্মীয় বিভেদকে প্রাদেশিক বিভক্তি করণে কাজে লাগাতে চাইলেন। দেখলেন, বাংলা দেশের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে না দিতে পারলে, ইংরাজ সাম্রাজ্য এ দেশের মাটিতে নিরাপদ নির্ভরতায় দৃঢ় মূল হতে পারে না। জাতিয়তাবাদের আলোকপ্রদীপ্ত বাংলা দেশ ইংরাজ শাসনের ভিত্তিমূল ধরে, নাড়া দিচ্ছে বার বার। সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, রাসবিহারী ঘোষ,—বাংলার এই সমস্ত সর্ব ভারতীয় নেতারা দেশ-ব্যাপি জাতিয়তাবাদের জোয়ার এনেছেন।

কার্জনের হঠকারিতার অন্ত নেই। আবোল তোবোল বকতেও তাঁর বোধ হয় জুড়ি নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি বললেন, সত্য কথন পাশ্চাত্য দেশবাসীর বৈশিষ্ট্য আর ভারতবাসীরা শুধু মিথ্যা ভাষণেই অভ্যস্ত। কার্জনের এই নির্লজ্জ ভাষণে বাংলা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ভগিনী নিবেদিতা 'অমৃত বাজার পত্রিক'ায় কার্জনের এই সদম্ভ উক্তির উপযুক্ত জবাব দিলেন। নিবেদিতা কার্জনের অতীত ইতিহাস টেনে প্রমাণ

করলেন, 'কোরিয়ান ফরেন অফিসের' এক পদস্থ অফিসারে কাছে কার্জন একদা নিজের বয়স ও কীর্তি সম্পর্কে অনেক মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে এসেছিলেন! নিবেদিতার বলিষ্ঠ নিবন্ধে কার্জনের উলঙ্গ-রূপ স্পষ্ট প্রতিভাত হলো।

মদগর্বী কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ঘোষণা করলেন বিপ্লবী বাংলার মৃত্যুর পরোয়ানা! বাংলা দেশকে দুটো টুকরোয় ভাগ ক'রে ফেললেন তিনি। আসাম সহ বাংলার পূর্বঅঞ্চল গুলি নিয়ে গঠিত হলো 'পূর্ববঙ্গ'। আর বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর সহ পশ্চিমী অঞ্চলগুলি নিয়ে ঘোষিত হলো নতুন প্রদেশ 'বঙ্গ'। কার্জন স্বপ্ন দেখলেন, এখন সাম্প্রদায়িকতার রক্তে ক্রমশই তলিয়ে যাবে দুই বংলার দুই রাজধানী,—ঢাকা ও কলিকাতা।

কার্জনের হুঙ্কার।

দেশ প্রেমিকদের কাছে এটা যুদ্ধাহ্বান। সেই আহ্বানে সাড়া দিল বাংলা দেশ; ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ।

বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হলো দেশ। দেশ প্রেমের যজ্ঞে উত্তপ্ত শোণিত টগবগ করে ফুটতে থাকে। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। আহত সিংহের মতো রুখে দাঁড়িয়েছে দেশ। তার প্রচণ্ড প্রত্যাঘাতে কার্জনী-মসনদ কেঁপে উঠছে থর থরিয়ে।

ভারতবর্ষ প্রবেশ করে বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষিত অগ্নিযুগে!

সপ্তকোটি বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞা, বঙ্গ ভঙ্গ রদ না করে ছাড়বে না। দিল্লীতে প্রতিদিন শত শত প্রতিবাদ ধ্বনিসম্বলিত স্মারকলিপি প্রেরিত হতে থাকে। পূর্ব বাংলার সত্তর হাজার অধিবাসী স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র গিয়ে পৌঁছালো সম্রাট পঞ্চম জর্জের কাছে।

মহামান্য গোখ্‌লে কার্জনকে হুঁশিয়ার ক'রে দিলেন, বাংলাকে শান্ত করুন! না হ'লে ঐ আগুনে জ্বলে উঠবে আপনাদের সমগ্র ভারত সম্রাজ্য!...কারণ, 'আজ বাংলা যা ভাবে, কাল গোটা ভারতবর্ষ তাই চিন্তা করবে।'

স্বদেশ প্রেমের তরঙ্গে উদ্দীপ্ত বাংলার মানুষ বিদেশী দ্রব্য বয়কট শুরু করে। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট ক'লকাতায় বিশাল জনসভায় স্বদেশী দ্রব্যকে সাদরে গ্রহণ ও বিদেশী পণ্য বর্জনের শপথ গৃহীত হলো। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের জন্য শোকদিবস পালিত হলো। বাংলার প্রতিটি শহরে হাজার হাজার নর নারী শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে।

সে দিন ছিল অরন্ধন। উপবাসী সাত কোটি সন্তানের কণ্ঠে একই প্রতিজ্ঞা: 'বঙ্গভঙ্গ রদ করতে হবে! করতেই হবে!'

ইংরাজ সরকার কোন দিনই নির্বাক দর্শক নন। তাঁদের দমনের চণ্ড রূপ সেই মুহূর্তে ভয়াবহ হ'য়ে উঠছে। পুলিশের বেপরোয়া লাঠি চার্জ হলো বরিশালের এক জনসভায়। দেশভক্ত নবাব আবদুল রসুলের উদাত্ত বক্তৃতা মাঝ পথেই স্তব্ধ করে দেয়। পুলিশী অত্যাচার, লাঠি আর বুটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বালক চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। তবু সাহেবরা কেড়ে নিতে পারেনি তার বজ্রমুষ্ঠিতে ধরা জাতীয় পতাকা। আর স্তব্ধ করে দিতে পারেনি তার সেই আকাশ প্রকম্পিত দেশ-বন্দনা, 'বন্দেমাতরম্…বন্দেমাতরম্…বন্দেমাতরম্!…'

গুপ্তচর বাহিনী জোঁকের মতো প্রতিটি তাজা প্রাণের পিছনে ঘুরে বেড়াতে থাকে। দেশের প্রায় সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বন্দী হলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথও নিগৃহিত হলেন। বহু টাকা জরিমানা দিতে হলো তাঁকে।

অত্যাচার যত বাড়ে, বিপ্লববাদ ততোই বিস্তারিত হয়। শহর ও নগর থেকে আরম্ভ করে দূর দূর গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত গুপ্ত সমিতি গুলি ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবীদের সশস্ত্র নেতৃত্ব দানে আবির্ভূত হলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। আলিপুর বোমার মামলায় অন্যতম আসামী হিসাবে ধৃত হলেন তিনি।

অরবিন্দের সাথে সাথে বাংলার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন অপর এক সাহসী বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

করতেন, এ দেশ থেকে ইংরাজ বিতাড়নের একমাত্র উপায় হলো সশস্ত্র বিপ্লব। অরবিন্দের সাহায্যে বরোদার সৈন্য বিভাগে তিনি যুদ্ধ বিদ্যার তালিম নেন। তারপর সশস্ত্র বিপ্লবের শপথ নিয়ে অরবিন্দের সঙ্গে ফিরে আসেন বাংলার বুকে। ক'লকাতা ও ক'লকাতার বাইরে অসংখ্য গুপ্ত সমিতিগুলি যতীন্দ্রনাথের উৎসাহে পরিবর্ধিত হতে থাকে। এই সমস্ত বিপ্লবী সংস্থা গুলির মধ্যে ঢাকার অনুশীলনী সমিতি, বরিশালের বান্ধব সমিতি, ক'লকাতার সরস্বতী সমিতি, ফরিদপুরের যুব সমিতি, বগুড়ার জনমঙ্গল সমিতি প্রভৃতি সমধিক খ্যাত।

ক'লকাতার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সামান্য সন্দেহের অজুহাতে বহু লোকের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে দিলেন। তাঁর ব্যবহারে ও অত্যাচারে বিপ্লবীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। নিজের জীবন বিপন্ন বোধ করে মজঃফরপুরে বদলি হয়ে গেলেন কিংস্‌ফোর্ড!

কিন্তু বিপ্লবীরা তাঁকে রেহাই দিতে রাজি নন। কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করতে এগিয়ে এলেন বাংলার দুই বিপ্লবী তরুণ,—ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী।

৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮।

রাত প্রায় আটটা। ক্ষুদিরাম কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ী ভুল করে মজঃফরপুরের ব্যারিষ্টার প্রিংলে কেনেডির গাড়ীর উপর বোমা ছুঁড়লেন। প্রচণ্ড শব্দে সেই গাড়ী বিদীর্ণ হয়ে যায়। নিহত হলেন ব্যারিস্টার সাহেবের স্ত্রী ও কন্যা।

ক্ষুদিরামের পাশে ছিলেন প্রফুল্ল চাকী। তাঁরা দু'জনে দু'দিকে পালিয়ে গেলেন। সমস্ত রাত পায়ে হেঁটে ক্ষুদিরাম শেষ পর্যন্ত ওয়াইনি স্টেশনে ধরা পড়ে গেলেন। আর প্রফুল্ল চাকীকে মোকামাঘাটের দারোগা নন্দলাল মুখোপাধ্যায় ধরে ফেললেন। কিন্তু ইংরাজ বিচারালয়ে উপস্থিত হবার অনেক আগেই কোমর থেকে পিস্তল টেনে আত্মহত্যা করলেন স্বাধীনতার অমর যোদ্ধা

প্রফুল্ল চাকী। প্রফুল্লকে ধরিয়ে দেবার অপরাধে অপরাধী নন্দলাল দারোগাকে বিপ্লবীরা ক্ষমা করেন নি। ১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর ক'লকাতার সার্পেণ্টাইন লেনে বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন নন্দলালবাবু।

১১ই আগষ্ট, ১৯০৮ সাল মজঃফরপুর জেলে বিপ্লবী কিশোর ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়ে গেল।

ক্ষুদিরামের প্রাণ দেশ সেবায় উৎসর্গিত হলো। সাথে সাথে শত শত ক্ষুদিরাম উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন বাংলার বিপ্লবী সংস্থাগুলিতে। মানিকতলার এক বাগান বাড়ীতে বিপ্লবীদের প্রধান আড্ডা স্থাপিত হলো। ১৯০৮ সালের ২রা মে হঠাৎ বৃটিশ পুলিশ সেই আড্ডাতে হানা দেয়। বন্দী করে নিয়ে যায় অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস, উল্লাসকর দত্ত, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিপ্লবীকে। ধরা পড়লেন অরবিন্দ ঘোষ ও ইন্দ্রনাথ নন্দী সহ মোট আটত্রিশ জন স্বন্ত্রাসবাদী। এঁদের পত্রিকা 'যুগান্তর' বিপ্লবীদের মুখপত্র রূপে আবির্ভূত হয়। এর অগ্নিগর্ভ ভাষার ঝিলিকে দেশবাসী সচকিত হয়ে ওঠে।

আলিপুর মামলায় বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী হলেন রাজসাক্ষী। শ্রীরামপুরের জমিদার বংশের ছেলে নরেন্দ্রনাথ প্রথমে বিপ্লবীদের দলে নাম লেখালেও নিজের দুর্বল চিত্তের জন্য পুলিশের কাছে সমস্ত স্বীকারোক্তি দিয়ে ফেলেন। বহু গোপন তথ্য বৃটিশ সরকারের গোচরে এলো।

নরেন্দ্র গোস্বামীর এই বিশ্বাস ঘাতকতায় বাংলার প্রতিটি বিপ্লবী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কানাই লাল দাস এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু নরেন্দ্র নাথকে হত্যার প্রতিজ্ঞা নেন। ১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ সত্যই তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। প্রচুর পুলিশ-প্রহরা সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ে।

বিশ্বাস ঘাতক নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করতে সক্ষম হয়ে আত্মতৃপ্তির হট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন কানাই লাল। আশ্চর্যের ব্যাপার ফাঁসীর হুকুম হবার পর কানাইলালের ওজন প্রায় আট সের বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আলিপুরের বোমার মামলায় বিপ্লবীদের স্বপক্ষে আবির্ভূত হলেন আইনজীবী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। মামলা চলে প্রায় এক বছর। চিত্তরঞ্জনের অসামান্য কৃতিত্বে অরবিন্দ মুক্তি লাভ করলেন। বাকি অধিকাংশের যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়।

মুক্তিলাভের পর অরবিন্দের মানসিক জগতে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তিনি চলে গেলেন ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীতে। সেখানে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। ডুব দিলেন আধ্যাত্মিক চিন্তার পরম গভীরতায়। বিপ্লবী অরবিন্দ পরিণত হলেন ঋষি অরবিন্দে।

এই সময়ই বিপ্লবী বাংলার অপর এক দামাল সন্তান যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চূড়ান্ত আঘাত হানতে এগিয়ে এসেছেন। সাধারণের কাছে তাঁর পরিচয় 'বাঘা যতীন' নামেই। যশোহর জেলার রিসখালির সন্তান তিনি। মানুষ হয়েছিলেন নদীয়া জেলার কয়াগ্রামে।

আলিপুর বোমার মামলায় দেশের অধিকাংশ বিপ্লবীনেতা ধরা পড়ায় বাঘা যতীনের উপর নেতৃত্বদানের ভার এসে পড়ে। যতীন্দ্রনাথ তিনটি উপায়ে দ্রুত নিজের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে ফেললেন।

প্রথমত, নদীয়া জেলায় তিনটি বড় বড় স্বদেশী ডাকাতের মারফৎ প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করলেন। সেই অর্থে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী ও বিপ্লব-সংস্থাগুলি।

দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত স্বদেশী অথবা, বিদেশী কর্মচারী বিপ্লবীদের নানা ভাবে ক্ষতি সাধনে সক্ষম, তাদের একে একে সরিয়ে ফেলতে মনস্থ করলেন যতীন্দ্রনাথ। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী খুন হলেন

আলিপুরের সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস এবং অত্যাচারী পুলিশ ইনেস্‌পেক্টর মৌলবী সামস্থল আলম।

সামস্থল হত্যার মামলায় যতীন্দ্রনাথকে সন্দেহ করা হয়। তাঁর এক বৎসর জেলও হয়ে যায়। জেলে থাকাকালীন ইংরাজ সরকার তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার চালান।

তৃতীয়ত, বৈদেশিক সাহায্য নিয়েও দেশে বিপ্লব করতে উদ্যগী হয়ে উঠলেন বাঘা যতীন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানেও বিপ্লবীরা তাঁদের সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের দলকে বলা হত 'গদর'। এর অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন জাতিতে পাঞ্জাবী।

গদর দলের দুঃসাহসী বিপ্লবীরা 'কোমাগাটা মারু' নামে একখানা জাপানী জাহাজে প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র, গোলা বারুদ নিয়ে এসে পৌঁছালেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করতে। কিন্তু বজবজের কাছে তাঁরা ধরা পড়ে যান। ভারতীয় পুলিশ তাঁদের নির্মম ভাবে হত্যা করে।

গদরদের ব্যর্থতায় যতীন্দ্রনাথ দমে গেলেন না। সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। সুযোগ এলো ১৯১৭ সালের মহাযুদ্ধে। জার্মানীর সাথে মিত্রপক্ষের সেই বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধে যেন আশার আলো দেখলেন যতীন্দ্রনাথ। বাটাভিয়ার ভিতর দিয়ে জার্মান অস্ত্র সংগ্রহে অগ্রসর হলেন তিনি ও তাঁর অনুগামীরা।

১৯১৫ সালের এপ্রিল মাস। তরুণ বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ভারতবর্ষ থেকে গোপনে এসে উপস্থিত হলেন বাটাভিয়ায়। দেখা করলেন জার্মান সমরবিশারদ থিয়োডোর্ হেল্‌ফারিকের সাথে। নরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হেল্‌ফারিক্ কথা দিলেন, শীঘ্রই 'মেভারিক' নামে একখানা জাহাজ প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে করাচী বন্দরের দিকে যাবে এবং নরেন্দ্রনাথের দল যেন সেই মার্কিন জাহাজখানাকে করাচীর পরিবর্তে গহন সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে এনে উপস্থিত করেন।

নরেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন। চূড়ান্ত সংগ্রামেরজন্য প্রস্তুত

হলেন বিপ্লবীর দল। বাংলায় ইংরাজ সৈন্যের সংখ্যা বেশী নয়। উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র পেলে বিপ্লবীরা তাদের অনায়াসে খতম করে ফেলতে পারবেন! কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন বাংলাকে ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এর জন্য প্রয়োজন, বাংলার সাথে সংযোগরক্ষাকারী সমস্তারল লাইনগুলি উড়িয়ে দেওয়া।

বিপ্লবীরা ঠিক করলেন: (ক) যতীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ রেললাইন উড়িয়ে দেবেন, (খ) ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ধ্বংস করবেন বেঙ্গল-নাগপুর রেল লাইন, (গ) বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী অতর্কিত আক্রমণে দখল করে নেবেন ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ, (ঘ) নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী দখল করে নেবেন নদী-বিধৌত পূর্ববাংলা।

আয়োজন সুকল্পিত ও নিখুঁত।

কিন্তু সকল প্রয়াসের উৎস 'মেভারিক্' জাহাজখানা আর এসে পৌঁছালো না। ইংরাজ সরকারের সন্দেহ হয়েছিল। তাদের নির্দেশ 'মেভারিক' জাহাজখানাকে ওলান্দাজরা জাভাতেই আটকে দেয়।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল।

বাঘা যতীন তাঁর অনুগামীদের নিয়ে উপস্থিত হলেন বালেশ্বরে। বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগ এ খবর আগেই পেয়েছিলেন। বহু শত পুলিশ দ্রুত এসে কোপতিপোদার জঙ্গলে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর দল-বলকে ঘিরে ফেললেন।

যতীন্দ্রনাথের সাথে ছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েক জন অসম সাহসিক বাংলার বিপ্লবী সন্তান—মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্র দাশগুপ্ত, জ্যোতিষ চন্দ্র পাল এবং চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী! বৃটিশ পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সাথে তুমুল লড়াই চালালেন তাঁরা। তাঁদের পিস্তলের অব্যর্থ লক্ষ্যে অনেক পুলিশের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ কোপতিপোদার জঙ্গলকে রক্তরাঙ্গা করে তোলে।

কিন্তু এমন অসম লড়াই বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না।

বিপ্লবীদের আত্মরক্ষার শক্তি ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসে।

একে একে ধরা দিলেন নীরেন, জ্যোতিষ ও মনোরঞ্জন। যতীন্দ্রনাথ মারাত্মক ভাবে আহত হলেন—পেটে ও উরুতে গুলি লেগেছে তাঁর। রক্তাপ্লুত যতীন্দ্রনাথকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে কয়েকদিনের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন বাংলার এই শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সন্তান।

বিচারে নীরেন্দ্র চন্দ্র দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের ফাঁসী হয়। জ্যোতিষকে পাঠানো হয় আন্দামানে। সেখানে উন্মাদ অবস্থায় মারা যান তিনি।

যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাংলার বিপ্লবী আগুন প্রায় নির্বাপিত হয়ে এল। কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলার আগুন ছড়িয়ে পড়েছে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও। আগুন জ্বললো পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও যুক্ত-প্রদেশে।

চিৎপাবন বংশের কৃতি সন্তান লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক তখন স্বদেশ প্রেমে মাতিয়ে তুলেছেন সমগ্র মহারাষ্ট্র প্রদেশকে। তাঁর সম্পাদিত 'মারাঠা' ও 'কেশরী' গণ-চিত্তে বিপ্লববাদের ঢেউ তুলেছে। তাঁর সম্মার্জনী লেখনীকে সহ্য করতে না পেরে বৃটিশ রাজ বেশ কয়েক বার তিলককে কারারুদ্ধ করেন। বস্তুত তিলকের মতো রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কেউ জন্মেছেন বলে বিশ্বাস হয় না। লণ্ডনে 'ইণ্টার ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ্ ওরিয়েণ্টালস্' সভাতে তিলক ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ বেদের উপর যে সার গর্ভ বক্তৃতা দেন, তা সমগ্র ইংল্যাণ্ডে বিপুল আলোড়ন আনে। বিখ্যাত দার্শনিক ম্যাক্স-মূলার তিলককে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

ভারতীয় নেতাদের মধ্যে তিলকই সর্ব প্রথম ঘোষণা করলেন, "স্বরাজ আমাদের জন্মগত দাবী, স্বরাজ আমাদের দিতেই হবে।"

১৮৯৭ সালে পুনার দুই বিপ্লবী ভ্রাতা দামোদর চাপেকার এবং বালকৃষ্ণ চাপেকার বোম্বাইয়ের ব্যাভিচারী ইংরাজ প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ড সাহেব এবং অত্যাচারী লেফ্‌ট্যাণ্ট আয়য়ার্স্ট সাহেবকে গুলি

করে হত্যা করেন। বিচারে এই চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রাণদণ্ড হয়। তিলকও নিষ্কৃতি পেলেন না,—আঠার মাসের জন্য কারাদণ্ড হয় তাঁর।

পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের নেতা হলেন সর্দার অজিত সিং। তিনি, তাঁর দুই ভাই সর্দার কিষণ সিং ও সর্দার শরণ সিং, লালা পিণ্ডি দাস, মেহে্তা আনন্দ কিশোর, ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ, সুফী আম্বাপ্রসাদ এবং আরো অনেকে মিলে 'ভারতমাতা' নামে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। পাঞ্জাবের অপর এক বিপ্লবী সন্তান হলেন লালা লাজপত রায়। লাজপতকে ও অজিত সিংকে পাঞ্জাব সরকার ৩নং ধারায় কারারুদ্ধ করেন এবং তাঁদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালান। এমন কি, লালা লাজপতের উপর নির্মম বেত্রাঘাতও করা হয়।

এই বীভৎস অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র পাঞ্জাব জুড়ে আন্দোলন গড়ে্ তুললেন মাত্র কুড়ি বৎসরের তরুণ নেতা লালা পিণ্ডি দাস। শত ভয় ও প্রলোভনেও তাঁকে ইংরাজ সরকার বশ করতে পারলেন না। বরং, দিন দিন বিপ্লববাদের আগুনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পাঞ্জাব। অজিত সিংয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সর্দার ভকত সিং পাঞ্জাব পুলিশের বড় কর্তা স্যাণ্ডর্স সাহেবকে হত্যা করেন। তারপর হাসতে হাসতে গলায় পরে নেন ফাঁসির বিজয় মাল্য।

যুক্ত প্রদেশের নেতা হলেন শান্তি নারায়ণ। তাঁর 'স্বরাজ' অগ্নি স্রাবী ভাষায় জনচিত্তে বিপুল আলোড়ন এনেছে সে সময়। কাশীতে বিপ্লবাদ ছড়াচ্ছেন প্রবাসী বাঙ্গালী শচীন্দ্র নাথ সান্যাল। বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ রাসবিহারী বসু ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শচীন্দ্রের অপর এক সহকর্মী বিষ্ণু গণেশ পিংলে লাহোর ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। ধরা পড়লে তাঁরও ফাঁসী হয়ে যায়। শচীন্দ্রনাথেরও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিপ্লববাদের অগ্নিমন্ত্র রচনা করতে বহু ভারতীয় ছড়িয়ে পড়েছিলেন বিশ্বের বহু দেশে। কানাডা থেকে আরম্ভ করে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত, সর্বত্র একসময় বিদ্রোহের আগুন

জ্বালিয়ে তুলেছিলেন ভারতীয় বিপ্লবীরাই। সেই সমস্ত তেজদৃপ্ত কাহিনীর অধিকাংশই আজ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ, আজ আমরা যদি তাঁদের স্মরণ রাখতে ব্যর্থ হই, তবে তার চাইতে বড় আত্মপ্রবঞ্চনা আর কী হতে পারে!

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে কানাডিয়ন সরকার প্রবাসী ভারতীয় শ্রমিকদের আত্মীয় স্বজনকে সেই দেশে প্রবেশ নিষেধ করে দিলেন। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন ভারতীয়রা। তাদের প্রতিষ্ঠিত 'খালসা দেওয়ান সোসাইটি' আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বৃটিশ কলম্বিয়ার রাজধানী ভ্যান্কুবারে একটি 'গুরুদ্বার'ও প্রতিষ্ঠিত হলো।

মালয় বাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী গুরুজিৎ সিং প্রায় তিন শত জন ভারতীয়কে 'কামাগাটা মরু' নামক এক জাহাজে চাপিয়ে কানাডায় প্রেরণ করেন। ভ্যাঙ্কুবার বন্দরে সেই জাহাজ কানাডিয়ান সৈন্য দের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। জাহাজ থেকে কোন ভারতীয়কে কানাডার মাটিতে পা রাখতে দেওয়া হলো না। এলো না কোন খাদ্য বা পানীয়। প্রবাসী পরিজনদের সাথে সাক্ষাতের কোন সুযোগ পেল না তারা। চোখের জল ফেলতে ফেলতে হতভাগ্য ভারতীয়রা আবার ফিরে চললো ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু যন্ত্রণার এখানেই ইতি নয়। ভারতবর্ষে পৌঁছালে সেই নিরস্ত্র ভারতীয়দের উপর বৃটিশ পুলিশ পশুর মতো নির্বিচারে গুলি চালায়। বজ্‌বজের স্যাঁতসেতে মাটিতে রক্তের স্রোত বইতে থাকে! গুরুজিৎ সিং আত্মগোপন করলেন। এর অনেক বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে তিনি ধরা দেন! বিচারে তাঁর জেল হয় পাঁচ বছর।

এই সময় প্রবাসী বিপ্লবী ভারতীয়দের মধ্যে প্রধান ছিলেন লালা হরদয়াল। কৃতি ছাত্র লালা হরদয়াল লাজপত রায়ের আদর্শে ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী স্যাক্রামেণ্টস্-এ একটি বিপ্লবী সমিতি গড়ে তুলেন। তারকনাথ দাস, খাঁ খোজী, পণ্ডিত জলৎরাম, কর্তার

সিং সরভা প্রভৃতি সুশিক্ষিত আমেরিকাবাসী ভারতীয়গণ এই সমিতির সদস্য ছিলেন। মার্কিন সরকার লালা হরদয়ালকে নির্বিঘ্নে বৈপ্লবিক কাজ কর্ম চালিয়ে যেতে দিলেন না। তিনি বন্দী হলেন। জামিনে মুক্তি পেয়ে লালা হরদয়াল পালিয়ে এলেন সুইজারল্যাণ্ডে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা ছিলেন রাসবিহারী বসু। ১৮০৬ সালে বর্ধমানের সুবলদহ গ্রামে তাঁর জন্ম।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশিক ভাষায় রাসবিহারীর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। রাসবিহারী কৃতি ছাত্র ছিলেন না,—বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন তকমা তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতির সামগ্রিক গতি-প্রকৃতি তাঁর নখদর্পণে প্রতিফলিত হতো। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী রাসবিহারী বহু ভাষায় অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন।

যৌবনের প্রারম্ভে রাসবিহারী প্রখ্যাত বিপ্লবী ও চিন্তানায়ক মতিলাল রায়ের সংস্পর্শে আসেন। মতিলালের উৎসাহেই বাংলায় বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত করতে এগিয়ে এলেন রাসবিহারী।

মাণিকতলার বাগান বাড়ী খানা তল্লাসীর সময় পুলিশ কর্তৃপক্ষ সর্ব প্রথম রাসবিহারীর কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠবার অবকাশ পান। রাসবিহারীর দু'খানি চিঠি ঐ সময় তাঁদের হস্তগত হয়।

রাসবিহারী প্রবাসী বিপ্লবী লালা হরদয়ালের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তাঁর ধারণা হলো, বিদেশে অবস্থান করে বৈপ্লবিক প্রস্তুতি চালানো অনেক সহজ ও নিরাপদ।...

রাসবিহারী তাঁর শিষ্য বসন্ত কুমার বিশ্বাসকে প্রেরণ করেন লর্ড-হার্ডিঞ্জকে হত্যা করতে। কিন্তু বসন্তর বোমা সঠিক ভাবে নিক্ষেপিত না হওয়ায় সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ কালে স্বদেশী ও প্রবাসী ভারতীয় যুবকদের নিয়ে ভারতবর্ষ ব্যাপি বিপ্লবের সূচনা করতে রাসবিহারী অমানুষিক

পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবীর ছদ্মবেশে কৃপাল সিং নামে একজন গোয়েন্দা সমস্ত গোপন তথ্য হস্তগত করেন এবং বৃটিশ সরকারকে রাসবিহারী পরিকল্পিত 'জাতীয় অভ্যুত্থান' [ দিন ধার্য হয়েছিল ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫ সাল ] সম্পর্কে যথা সময়ে সচেতন করে দেন।

ব্যর্থ রাসবিহারী ছদ্মবেশে পালিয়ে এলেন কাশীতে। ইতিমধ্যে অপর এক বিপ্লবী পিংলে বোমা সহ ধরা পড়ে গেলেন। আরম্ভ হলো ব্যাপক ধর পাকড়। বিষ্ণু গণেশন পিংলে, সর্দার যশোবন্ত সিং, সেবা সিং, বীর সিং, স্মুরণ সিং, কর্তার সিং, সরভা ইত্যাদি সাহসী বিপ্লবীদের ফাঁসী হয়ে গেল।

কিন্তু বিপ্লবী সূর্য সেন ও রাসবিহারীকে ধরতে ব্যর্থ হলেন বৃটিশ সরকার। রাসবিহারীর মাথার দাম উঠলো বার হাজার টাকা। দেশের প্রতিটি বিশ্বাসঘাতক সচেতন হ'য়ে উঠলো তাঁকে ধরিয়ে দিতে।

সকলের চোখে ধুলো দিয়ে রাসবিহারী :৯১৫ সালের ৫ই মে ভারত থেকে অনায়াসে পাড়ি জমালেন সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের উদ্দেশ্যে।

ভারতীয় বিপ্লবের ঢেউ বিপুল আবেগে সফেন উচ্ছলতায় আছড়ে পড়লো প্রাচ্যের দ্বার সিঙ্গাপুরে। ভারতীয় গদররা [ বিপ্লবী ] স্থানীয় ভারতীয় সৈন্যের কয়েকটি ইউনিটের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। তারপর অতর্কিত আক্রমণে দখল করে নেয় সিঙ্গাপুর দুর্গ,— দুর্গের শীর্ষে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড়তে থাকে। তিন সপ্তাহ ধরে এই দুর্গ নিজেদের অধিকারে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। পরে ফরাসী ও জাপানীদের সহায়তায় বৃটিশ সেনা সিঙ্গাপুর পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। কিন্তু প্রবাসী ভারতীয়দের সেই অসমসাহসিক প্রয়াসের এ পর্যন্ত উপযুক্ত মূল্যায়ন হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। সিঙ্গাপুর যুদ্ধে বিপ্লবী নেতা সর্দার ঈশ্বর সিং এবং মৌলবী আহম্মদ খাঁর নাম ক'জন ভারতীয় স্মরণ রেখেছেন ?

বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের উপর গোয়েন্দাগিরি করতেন স্যার কার্জন উইলি। তাঁর যন্ত্রণায় ছাত্ররা সমবেত হয়ে দেশের কথা আলোচনা পর্যন্ত করতে সাহসী হতো না। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে পাঞ্জাবী ছাত্র মদন লাল ধিংড়া, উইলকে গুলি ক'রে হত্যা করেন। ইংল্যাণ্ডে ফাঁসী হয়ে গেল তরুণ ধিংড়ার। অপর এক সাহসী তরুণ বিনায়ক সভারকারকে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে ভারতে ফিরে যেতে হুকুম দিলেন। ভারতগামী জাহাজ থেকে মাঝ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সভারকর। তারপর তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লড়াই চালিয়ে উপস্থিত হলেন ফ্রান্সের ভার্সাই বন্দরে। কিন্তু ফরাসী সরকার আন্তর্জাতিক আইনকে অসম্মান ক'রে বিপ্লবী সভারকারকে আবার ইংরাজদের হাতে তুলে দেন। ভারতে নিয়ে আসা হলো শৃঙ্খলাবদ্ধ সভারকারকে। বিচারে তাঁর হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বিপ্লবের ইতিহাসে আর একটি বিস্মৃতপ্রায় নাম মাদাম কামা। এই তেজস্বিণী নারী তাঁর ক্ষুরধার লেখনী মুখে ফ্রান্সে ভারতীয়দের দাবীকে সোচ্চার ক'রে তোলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁকে কারারুদ্ধ ক'রে রাখা হয়। একেবারে পরিণত বয়সে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন তিনি ১৯৩৬ সালে। বোম্বাই নগরীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

বার্লিনে ভারতীয় বিপ্লববাদের সংগঠকরূপে কাজ করে যান বাঙ্গালী বিপ্লবী ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত। তাঁর সহায়করূপে ছিলেন আমিন চাঁদ, পিয়ারে লাল, শিবদাস সিং ইত্যাদি বিপ্লবীরা। তাঁরা জার্মান সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য পেতেন।...

ভারতীয় বিপ্লবের লালন-ভূমি মেদিনীপুর। ক্ষুদিরাম, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, যোগজীবন ঘোষ, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—এঁরা সবাই মেদিনাপুরের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

অত্যাচারী ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটদের হত্যায় মেদিনীপুর এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। পরপর তিনজন ম্যাজিস্ট্রেটকে এই জেলার বিপ্লবীরা পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিলেন।

প্রথমে নিহত হলেন জবরদস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ পেডি। ক্ষমতার মদগর্বে তিনি ধরাকে সরাজ্ঞান করতেন। স্কুলের দুই কিশোর ছাত্র জ্যোতিঃ জীবন ঘোষ এবং বিমল দাসগুপ্ত মেদিনীপুর কলেজ প্রাঙ্গণে একটি প্রদর্শনীতে গুলি করে হত্যা করলো পেডিকে। বিমল ও জ্যোতিঃকে কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষ ধরতে পারেন নি। দু'জনেই আশ্চর্য উপায়ে আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়।

পেডির পর নিহত হলেন ডগ্লাস। অত্যাচারী জেলা-শাসক ডগ্লাস। হিজলীর জেলে স্বদেশী বন্দীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে গেছেন। সেই গুলিতে প্রাণ হারালেন দুই তরুণ স্বদেশ প্রেমিক,—তারকেশ্বর সেন ও সন্তোষ-কুমার মিত্র। বিপ্লবীরা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে সূর্যকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা নিলেন, ডগ্লাসের রক্ত চাই-ই!

১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল।

জেলা স্কুল বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করছেন ডগ্লাস। হঠাৎ দরজা ঠেলে সেখানে প্রবেশ করলেন দুই দীপ্ত তরুণ,—প্রভাংশু পাল এবং প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য। দু'জনরেই হাতে উদ্যত রিভালবার, চোখ দুটো প্রতিহিংসার আগুনে ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে জ্বলছে। আত্মরক্ষার কোন সুযোগ পেলেন না ডগ্লাস। উপর্যুপরি কয়েকটা বুলেট এসে গভীর ক্ষত এঁকে দিলো তাঁর কপালে, বুকে এবং তলপেটে।

প্রভাংশু পালালেন। কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন প্রদ্যোৎকুমার। বিচারে যথারীতি ফাঁসী হল।

ডগ্লাসের পর বার্জ। শয়তানের ছায়া বার্জ। ম্যাজিষ্ট্রেট্ হয়ে বুটের সদম্ভ পেষণে মেদিনীপুর বাসীকে তিনি যেন প্রতিমুহূর্তে গুঁড়িয়ে দিতে চান! ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর বার্জ কয়েকজন গোরাকে নিয়ে মাঠে নেমেছেন ফুটবল খেলতে। সাহেবদের খেলা সবুজমাঠের চারদিক দর্শকাকীর্ণ। হঠাৎ দুই তরুণ ছুটে এলেন বার্জকে লক্ষ্য করে। তাঁদের গুলিতে মাটিতে ছিটকে পড়লেন বার্জ। রক্তের বান ডাকলো সবুজ ময়দানে।

হত্যাকারী কারা?

মৃগেন দত্ত ও অনাথ পাঁজা।

কিন্তু ওঁদের জীবন্ত অবস্থায় ধরা গেল না। বার্জকে হত্যা করেই নিজেদের কপাল লক্ষ্য ক'রে পিস্তল চালালেন। অসমাপ্ত জীবনের অন্তিম প্রান্তে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তাঁরা।

বিপ্লবী মেদিনীপুরের ইতিহাসে বীরাঙ্গনা নারী মাতঙ্গিনী হাজরার নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত আছে। 'আগষ্ট বিপ্লবে, ত্রিসপ্ততি বর্ষ বয়স্কা এই বৃদ্ধা পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান।

বিপ্লবের ইতিহাসে মেদিনীপুরের সমকক্ষ চট্টগ্রাম। এখানে বিপ্লবী সূর্য হলেন মাষ্টারদা,—সূর্যসেন! তাঁর বিরল ও স্মরণীয় নেতৃত্বে লোকনাথ বল, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, হরিগোপাল বল, নির্মল সেন ইত্যাদি বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন এবং কয়েক-দিনের জন্য চট্টগ্রাম নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হন। অবশ্য, বৃটিশের বিশাল সামরিক অভিযানের মুখে তাঁরা শেষে আত্মসমর্পণে বাধ্য হন! সূর্য সেন কিছুদিন ফেরার থাকবার পর ধরা পড়ে যান। বিচারে তাঁর যথারীতি ফাঁসি হয়।

বাংলার আই. জি. লোম্যান্ ছিলেন বিপ্লবীদের এক নম্বর শত্রু। বিনয় বসুর গুলিতে ঢাকা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে প্রাণ হারালেন তিনি। বন্ধু দীনেশ গুপ্তকে নিয়ে ঢাকা থেকে পালিয়ে এলেন বিনয়। এখানে তাঁদের শিকার হলেন কারা বিভাগের ইনস্‌পেক্টর জেনারেল সিম্‌সন্ সাহেব। ধরা পড়বার সম্ভাবনায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন বিনয় বসু। আর জীবনের জয়গান ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেলেন দীনেশ গুপ্ত।

এমনি কত শত বিপ্লবীর তাজা রক্তে এ দেশের মাটি ভিজেছে। কিন্তু আজ মনের জ্বালায় এ কথাই বলতে হয়, ঐ সমস্ত মহাপ্রাণদের ঈপ্সিত স্বাধীনতা আমরা পাই নি! সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলঙ্কিত, দেশের অঙ্গচ্ছেদন মেনে নিয়ে ঝুটা আজাদীর গর্ব করা, সমাজতন্ত্রের নামাবলি গায়ে চাপিয়ে অসাম্যের প্রাকার তুলে দেওয়া,—এই দেশের

জন্যই কি দিনেশ, বাদল, প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনী, সূর্য সেন…জীবন উৎসর্গ করেছিলেন? তাঁদের আত্মত্যাগের এই কি পরিণতি?

ভারতবর্ষ এখন গান্ধী জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে ব্যাপক ভাবে প্রস্তুত। গান্ধীজীকে বিপ্লবী রূপে চিহ্নিত করতে পারছি না। ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তাঁর অনেক ভুল ও ত্রুটি আমরা আজ এতকাল পরে ধরতে পারছি। তবু এ কথা অস্বীকার করা অনুচিত যে, গান্ধীজীই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রকৃত অর্থে গণজাগরণ ঘটিয়ে ছিলেন। আর তিনিও এমন পঙ্কময় স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেন নি। গান্ধীজী রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসকে ভেঙ্গে দিতে বলেছিলেন, আহ্বান জানিয়ে ছিলেন ত্যাগের মন্ত্রে ভারতীয় শাসকবর্গকে দীক্ষিত হতে, আর চেয়েছিলেন অনেকটা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচেই এদেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে গড়ে তুলতে! আজ গান্ধী জন্ম-শতবার্ষিকীতে আমাদের কেন্দ্রীয় বাগাড়ম্বর নেতারা যেন নিজেদের বিবেকের কাছেই এর কৈফিয়ৎ দেন! সেই আত্ম-সমালোচনাতেই গান্ধীজীর প্রতি সঠিক সম্মান জানানো হবে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদদের কাছে আজকের ভারত কি জবাব দেবে? ডায়ারের পশুত্বের বিরুদ্ধে সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপি যে বিপুল আলোড়ন উঠেছিল, আজকের ভারত কি তা বিস্মৃত হয়েছে? সেদিন হিমালয়ের বরফে ফাটল ধরেছিল, কণ্যাকুমারিকা ভাসিয়ে নিতে চেয়েছিল দিল্লীর মসনদকে! আজকের ভারতে যে ভয়াবহ অসাম্য ও শোষণ তার বিরুদ্ধে বিপ্লবী ভারতবাসী কেন সমবেত হতে পারছে না?

জালিয়ানওয়ালাবাগের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর উদ্ধত ডায়ারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আপনি গুলিবিদ্ধ আহতদের হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন নি কেন?"

প্রশ্ন কর্তা লর্ড হাণ্টারের দিকে তাকিয়ে ডায়ার উচ্চারণ করলেন, "কারণ, ওদের আমি মানুষ বলে মনে করি না। এক মানুষের আকৃতি ছাড়া ওদের মধ্যে মনুষ্যত্বের কোন লক্ষণই নেই!"

আজ শিয়ালদহ স্টেশনে হাজার হাজার অভুক্ত, অর্ধনগ্ন, আদর্শ হীন, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত নর-নারীর দিকে তাকিয়ে দিল্লীর মসনদকে যদি প্রশ্ন করা হয়, "এদের এই দশা কেন? তোমাদের সাধের মসনদ লাভে এরা কি প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছিল?"

এ প্রশ্নের কী উত্তর হবে? সম্ভবত ডায়ারের প্রেতাত্মা এসে উত্তর দিয়ে যাবে, "ওদের আমরা মানুষ বলে গণ্য করি না। ক্ষমতা আমরা চেয়েছি এবং এই সমস্ত পশুদের বলি দিয়ে আমরা তা পেয়েছি। এর বেশী কিছু বলতে আমরা রাজি নই!"

হায়, রবীন্দ্রনাথ! আজ জীবিত থাকলে আপনি কোন উপাধি ত্যাগ করতেন?

নজরুল! আপনার চিন্তাশক্তি ফিরে এলে, আপনি কি এখনো অগ্নিস্রাবী রচনায় অক্লান্ত থাকতেন না?

ভারতবর্ষের পথে পথে, শহর থেকে দূর দূর গ্রামে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। দারিদ্র্যের নগ্ন রূপ দেখে শিহরিত হয়ে উঠি। নাগপুরের জঙ্গল মহলের গভীরতম স্থান ভিমাল গণ্ডীতে দেখেছি, ক্ষুধার জ্বালায় টিকতে না পেরে তিনটি সন্তান নিয়ে এক মাকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে। দেখেছি বর্ধমানের চিড়াকলের কামিনীরা, যারা একদা পূর্ব বঙ্গে লজ্জাবতী বধূ ছিল, পেটের জ্বালায় 'বাবু'দের কাছে নিজেদের পড়তি যৌবন উজাড় করে দিতে! দেখছি বেকার যুবকদের ভয়াবহ মানসিক বিকার! দেখছি যৌনবাদ প্রচারের দেশব্যাপি এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র,—সাহিত্যে, চিত্রে, সিনেমায়, সঙ্গীতে ব্যাপক অনুপ্রবেশ! সব চোখে পড়ে, সবই।

জমিদারীতন্ত্রের অবসান ঘটেছে কাগজে কলমে। আসলে গ্রামগুলিতে আজও সেই সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডল জাঁকিয়ে বসে আছে। স্বার্থে ঘা পড়লেই এখনো বন্দুক হাঁকিয়ে ছুটে আসে তারা, পাইকিরি হারে নরহত্যার পরও চাঁদির জুতোয় জগত জয়ের হুমকি দেখায়। তাই মিলিয়ে নিচ্ছি!

ছবিগুলি সব মিলে যাচ্ছে পর পর। বুরবঁন রাজত্বের ফ্রান্স,

জারের রাশিয়া এবং মার্শাল চিয়াং কাইশেকের কুয়োং মিটাং-শাসিত চীন। এদের পাশাপাশি অঙ্গহীন ভারত। তফাৎ কতটুকু? হয়তো অনেক দিক থেকে অনেকখানি। কিন্তু জনগণের অবস্থা? সেখানেও প্রভেদ মাত্র উনিশ-বিশ!

নেপোলিয়ন বলেছিলেন, বিপ্লব হতে পারে অর্থনৈতিক কারণে। মার্কসও তাই প্রমাণ করে গেছেন। তাই যদি হয়, তবে ভারতবর্ষের মুক্তি কি বিপ্লবের পথ চেয়ে বসে নেই? হয়তো ঠিক সেই পর্যায়ে দেশ এখনো পৌঁছাতে পারে নি, গণ-সচেতনতা অতখানি ব্যাপ্তি পায় নি। কিন্তু পথ ঐ একটিই! এ শোষণতন্ত্রের অবসান আমরা চাই-ই। আমরা চাই সমাজতন্ত্র। এবং প্রকৃত অর্থে সমাজতন্ত্র!

সমস্যায় কণ্টকাকীর্ণ এ দেশে প্রতিটি প্রগতিশীল প্রতিশ্রুতি পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। রাজস্থানের বন্ধ্যা মৃত্তিকাকে সবুজ শ্যামল করে তুলতে কোন বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের স্বপ্ন সেখানকার কৃষিজীবী মানুষরা বড় একটা দেখে না, বরং তারা শিশু হত্যায় ভূমি রঞ্জিত করে লক্ষ্মীর বরপুত্র হবার আশা রাখে। তারপর আছে দুর্বিসহ অসাম্য ও অশিক্ষা। যেখানে এত অসাম্য ও অশিক্ষা, সেখানে জনগণের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা দ্রুত সংবদ্ধ হবার প্রত্যাশা করাটাও বাতুলতা মাত্র।

দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের দিকে তাকিয়ে অনেক সময় তাই গভীর বেদনায় সঙ্কুচিত হয়ে যাই। প্যারিসের টাওয়ার অব্ পিসা, আমেরিকার স্ট্যাচু অব্ লিবার্টি, ক্রেমেলিনের সুবিস্তার, নয়া-চীনের গণ-অভ্যুত্থান,—এ সব ছবি যখন স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তখনই রাস্তায় নেমে আসি। পরস্পরের কাছাকাছি হবার বাসনায় আকুল হয়ে উঠি। অথচ, কী নিঃসীম নিঃসঙ্গতা আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। আমরা যেন একটি প্রকাণ্ড লবণাক্ত সমুদ্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি দ্বীপ, পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়ে আছি, অথচ মিলতে পারছি না। বিচ্ছিন্নতাই এ যুগের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি,—সর্বত্র ঐ বিচ্ছিন্নতা সর্বগ্রাসী শূন্যতা বিস্তার করে

চলেছে। কলকাতার চলমান জন-সমুদ্র কখনো হয়তো বারেকের জন্য তাকায় সুউচ্চ সেক্রেটারীয়েট বিল্ডিংয়ের দিকে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তারা অনুধাবন করতে পারে, তাদের দু'জনের মাঝে কী বিরাট শূন্যতা হাহাকার করে মরছে প্রতিনিয়ত। আনন্দহীন শ্রমিক নিজের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে দিয়ে উৎপাদনে রত অথচ, সে তার কর্মফল থেকে বিচ্ছিন্ন; সেই উৎপাদন ফসল থেকে সে দূরে বহু দূরে।

বৈপ্লবিক চিন্তা ধারায় নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে নেবার প্রথম প্রয়াসে এই বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে আমাদের শুরু করতে হবে এক আপোষহীন সংগ্রাম। মানুষ যখন দূরত্বে অবস্থান করে, তখন বায়বীয় 'ইজমের' ফুলঝুরি ছড়িয়ে কী লাভ? গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে কোটি কোটি মানুষ পরস্পরকে জানবে, সংঘবদ্ধ হবে, নিজেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যকে চিনতে পারবে,—আগামী যুগের সেই বাস্তবকে আজ আমাদের যৌথ চিন্তাধারায় ধরতে পারি!

এটাই তো প্রথম পথ।

এতেই তো আমাদের সার্থকতা। অন্যথায় আমরা যেন সব কলের পুতুল,—বাতাসের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি, কি যেন সব কাটাকুটি করে চলেছি। অথচ, কোন ফলশ্রুতি নেই।

শয়ন, ভোজন, মৈথুন,—কার বোঝা মাথায় চাপিয়ে ক্রীতদাসের দল আমরা নিজেদের মৃত্যুর নোটিশ লিখে চলেছি।

———